আধুনিক ভারত

শ্রীপ্রভাতাংশু মাইতি

শ্রীধর প্রকাশনী

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নব-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত।
[Vide W. B. H. S. Council's Syllabus Volume I. Published in March, 1976]

আধুনিক ভারত

(১৭৬৫—১৯৫০)

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক **প্রভাতাংশু মাইতি**, এম. এ.
ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা এবং
'Studies in Ancient India', 'A History of Europe',
'ইওরোপের ইতিহাস পরিক্রমা', 'ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা'
'ভারতের ইতিহাস' (নবম ও দশম) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীধর প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
২০৩/৪ বি. বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীনীহারেন্দু কুমার পান
শ্রীধর প্রকাশনীর পক্ষে
২০৩/৪ ডি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন, ১৯৭৮
তৃতীয় সংস্করণ ঃ মে, ১৯৭৯

মূল্য ঃ বার টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমলেন্দু কুমার পান, এম. এ.
রামকৃষ্ণ মুদ্রণালয়
২০৯ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ইতিহাসের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী "আধুনিক ভারত" লিখিত হইল। ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ শাসনের ইতিহাস, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতে ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতের পুরাতন কুটীরশিল্প, অর্থনীতির ভাঙন প্রভৃতি বিষয় বিশেষ যত্ন সহকারে আলোচনা করা হইয়াছে। ইংরাজ আমলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অপর দিকে আলিগড় আন্দোলন ও একশ্রেণীর ভারতীয় মুসলিম নেতাগণের বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টির কথাও আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং ইহা ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজের ভেদনীতির ইতিহাসের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইংরাজের ক্ষমতা হস্তান্তর, ভারত ব্যবচ্ছেদ, স্বাধীন ভারতের সংবিধান যত্ন সহকারে আলোচিত হইয়াছে।

ভারতের ইতিহাসের পাঠ্যসূচী রচনার সময় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রথাসিদ্ধ পাঠ্যসূচী বর্জন করিয়া প্রগতিশীল পাঠ্যসূচী রচনা করিয়াছেন। তবে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সুকুমার মতি ছাত্রছাত্রীগণের উপযোগী করিয়া রচনা করা দুরূহ কাজ। এই কাজে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা বিদগ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বিবেচনা করিবেন। এই পুস্তক রচনায় চলিত ভাষার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণের সুবিধার জন্য পার্শ্বটীকা দেওয়া হইয়াছে। আকর গ্রন্থগুলি হইতে উদ্ধৃতিও পার্শ্বটীকা মেধাবী ছাত্রগণের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের শেষে Objective প্রশ্ন ও রচনাত্মক প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। যদি এই পুস্তকটি ছাত্রছাত্রীগণ পড়িয়া ভারতের ইতিহাস জানিতে আগ্রহী হয় তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। বিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। যদি পুস্তকটির উন্নতিকল্পে তাঁহারা কোন পরামর্শ দেন তবে কৃতজ্ঞ থাকিব। পুস্তকটি দ্রুত ছাপা ও প্রুফ সংশোধনের জন্য আমার ছাত্র শ্রীঅমলেন্দু পান এম. এ.-কে ধন্যবাদ জানাই। যদি কিছু ত্রুটি থাকে সে দোষ আমারই। ইতি—

পি. ৯০৫, লেক টাউন
কলিকাতা-৭০০০৫৫
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"আধুনিক ভারত"-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সর্বশেষ সংশোধিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত হইল। সংশোধিত পাঠ্যসূচীতে কোম্পানীর আমলে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন, কোম্পানীর আমলে একচেটিয়া বাণিজ্য বনাম অবাধ বাণিজ্য এবং স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শীর্ষক বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বের সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণ রচনার সময় আকর গ্রন্থগুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের মতামত বঙ্গানুবাদ সহ যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনার সময় কেবলমাত্র বিবরণের উপর জোর না দিয়া বিশ্লেষণের উপরও সমান দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ভাষা যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মননশীলতা বৃদ্ধিই এই পুস্তক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীগণের কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের উপযোগী পুস্তক রচনার ন্যায্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই।

পুস্তকটির শেষে আদর্শ প্রশ্নাবলী, শিক্ষা সংসদের নির্দেশিত প্রশ্নাবলীর মান অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৮ খ্রীঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলীও দেওয়া হইয়াছে। আগ্রহী ছাত্র এই পুস্তক মনোযোগ দিয়া পড়িলে প্রতি প্রশ্নের উন্নত মানের উত্তর রচনায় সক্ষম হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

"আধুনিক ভারতের" দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহার পর বেশ কিছুদিন পুস্তকটি ছাপা হয় নাই। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সংশোধিত পাঠ্যসূচীর অপেক্ষায় থাকিবার ফলে পুস্তকটির ছাপা কিছুদিন বন্ধ থাকে। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীগণের যে ক্ষতি হইয়াছে সেজন্য লেখক দুঃখিত। বিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নিকট অনুরোধ দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় তৃতীয় সংস্করণটি পড়িবার জন্য তাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীগণকে পরামর্শ দিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকটির গুণগত মানের জন্য তাঁহারা যে মতামত দিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ জানাই। আশা করা যায় যে দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণটিও আদৃত হইবে। পুস্তকটির ছাপায় যদি কোন ভুল থাকে সে দোষ লেখকের। পরিশেষে আমার ছাত্র শ্রীঅমলেন্দু পান এম. এ.-কে পুস্তকটি দ্রুত ছাপার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ইতি—

পি. ৯০৫ লেকটাউন
কলিকাতা ৭০০০৫৫
২৯শে মে, ১৯৭৯

গ্রন্থকার

REVISED SYLLABI IN HISTORY IN MODERN INDIA (1765—1950)

Paper I (Full Marks—100)

CHAPTER I

Bengal 1765—1772—General introduction—break up of the Mughal empire—Plassey to Buxar—Diwani and Dual system—Famine of 1770.

CHAPTER II

Administrative Reforms (law, ustice, police included)—From Warren Hastings to Dalhousie : District administration as pivot—Civil Service—impact of Fort William College and Haileybury on training—Employment of Indians upto Bentinck.

CHAPTER III

Progressive Trends—Urbanization and growth of middle class—spread of western education through English medium—challenge of Christianity and new-learning—Recovery of the Past—Religious and Social Reforms—Brahmo movement—Beginning of a new literature—Beginning of the Press—Development of transport and communication—Beginning of political consciousness and political associations.

CHAPTER IV

Growth of an Indian Empire—Rise and fall of Mysore—Revival and disintegration of Maratha Empire—Rise and fall of Sikh Power—Conquest of Sind—Annexations of Dalhousie—From Subsidiary alliance to Paramountcy—effects on Indian States.

CHAPTER V

Reaction to British Policy—Early risings—Muslim reaction—Wahabi and Faraiji Movements—Revolt of 1857.

CHAPTER VI

Evolution of a Framework of British rule at Home and in India—Constitutional changes from 1858 to 1919—Local Self Government—Struggle for Indianisation of public Services—Economic policy—railways, irrigation and development of

modern industry ; taxes, tariffs, and currency policy : tenancy laws and famine measures—Nationalist protest against "un-British rule."

CHAPTER VII

Foreign and Frontier policy—N. W. F. and Afghanistan—Burma—Tibet.

CHAPTER VIII

Cultural and Religious revival—University education, Female education, Vernacular education, Technical education—Sir Syed Ahmed Khan and Aligarh movement—Literature of Protest and Patriotism—Bankim to Rabindranath—Birth of oriental art—Development of press and public opinion—Veruacular Press Act and after—Religious movements—beginning of militant nationalism.

CHAPTER IX

British policy of Divide and Rule—Partition of Bengal—Swadeshi movement—Terrorism—Birth of Muslim League—Separate electorate,

CHAPTER X

Towards Freedom—Non-violent, Non-co-operation, Khilafat, Civil Disobedience movements—Terrorism ; Peasants' and Workers' movements—Government of India Act 1935—Growth of communalism to Pakistan Resolution—India and the Second World War : Cripps Mission—Quit India Movement—Subhas Chandra Bose and I. N. A.—Cabinet Mission, Independence and Partition.

CHAPTER XI

Consolidation of Independence—Framing of a Constitution—Integration of Indian States.

———

সূচীপত্র

9798

আধুনিক ভারত

সূচনা

(Introduction)

ইতিহাসের ধারা প্রবাহমান। আজ যাহা বর্তমান, কাল তাহা হয় অতীত। আজ যাহা অনাগত ভবিষ্যৎ, কাল তাহা হয় বর্তমান। সুতরাং ইতিহাসকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবুও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবধারার ভিত্তিতে ইতিহাসকে ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজবিদগণ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মন্বন্তর কথাটির অর্থ কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষ বা আকাল নহে। মনু বা সামাজিক বিধানকর্তা যে বিধান প্রবর্তন করেন তাহার অন্তর বা অবসানকে মন্বন্তর বলা হইত।

ইওরোপীয় ইতিহাসকারগণ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করিয়া থাকেন। মুঘল শাসনের পতন ও ভারতে ইংরাজ শক্তির উত্থান এই সন্ধিকালকেই সাধারণতঃ আধুনিক যুগের আরম্ভ বলিয়া ধরা হয়। অষ্টাদশ শতকে এই পরিবর্তন ঘটে। এজন্য অষ্টাদশ শতকে ভারত ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় একথা বলা হয়।

একথা স্বীকার্য যে এই কাল বিভাগ সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। আধুনিক যুগ বলিতে যদি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসন বলা হয় তবে মুঘল শাসনকাল আধুনিকতার দাবী করিতে পারে। আবার আধুনিক যুগ বলিতে যদি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় ভাবের বিকাশ ধরা হয় তবে মুঘল আমলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাস, মীরা, কবীরের রচনা ও ভক্তি সংগীত এই যুগকে স্বকীয়তা দিয়াছিল। বাংলা ভাষা বৈষ্ণব ও অন্যান্য পদাবলী সাহিত্যে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। মারাঠী ভাষা নামদেব ও তুকারামের রচনায় নিজস্ব রূপ পাইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগুও পিছাইয়া ছিল না।

তথাপি ইংরাজ শক্তির উত্থানকে ভারতের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইহার কারণ হইল এই যে আধুনিক যুগ বলিতে আমরা যে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা বুঝিয়া থাকি তাহা ইংরাজ আমলেই বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসন সর্বভারতীয় ঐক্যকে দৃঢ়তর করে। যদিও মুঘল যুগে কেন্দ্রীয় শাসনের মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্য গঠিত হয়; কিন্তু প্রাদেশিক শক্তিগুলির বিচ্ছিন্নতাবাদ রাজপুত, জাঠ, মারাঠা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের বিদ্রোহ এই ঐক্যবোধকে দুর্বল করিয়া দেয়। তাছাড়া মুঘল যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগঠিত ছিল না। রাজধানী দিল্লী হইতে আদেশনামা প্রদেশে পৌঁছাইতে যথেষ্ট সময় লাগিত। ইংরাজ আমলে রাস্তাঘাট ও রেলপথের প্রসারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত ও যোগসূত্র অনেক দৃঢ় হয়। পাঞ্জাব ও

---

১ সংসদ বাংলা অভিধান।

মাদ্রাজের ব্যবধান ক্ষীণ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহারা একই ধরণের শিক্ষালাভ করিয়া একই মানসিকতা ও চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মতামত বিনিময় সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের প্রসারের ফলে যোগাযোগ আরও বাড়িয়া যায়। ভারতীয় ভাষার সাহিত্যগুলি আরও বিকাশ লাভ করে। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা জাগে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। চতুর্থতঃ, আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল শিল্পের যান্ত্রিকীকরণ। ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতীয় কুটীর শিল্প ধ্বংস হয় এবং ইংলণ্ডের কলকারখানায় উৎপন্ন পণ্যে ভারতের বাজার ছাইয়া যায়। সাম্রাজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ ভারতে পুরাপুরি কায়েম হয়। ভারতের স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়ে। ইহার পাশাপাশি ভারতেও যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশ হয়। পঞ্চমতঃ, মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের স্থলে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য উদারতন্ত্র ভারতীয় মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। ক্রমে ভারতবর্ষ তাহার অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছাড়িয়া ধর্ম নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী সমাজের আদর্শ গ্রহণ করে।

উপরোক্ত পরিবর্তন অল্প দিনে আসে নাই। ধীরে ধীরে ভারত এই পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। এই কারণে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগকেই আধুনিক যুগের সূচনা বলিয়া ধরা হয়।

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলায় ইংরাজ শক্তির উত্থান (১৭৬৫—১৭৭২ খ্রীঃ)

(Bengal from 1765—1772)

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (Downfall of the Mughal Empire)ঃ মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ১৭০৭ খ্রীঃ মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে মুঘল সাম্রাজ্যের পরিধি ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ মন্তব্য করিয়াছেন যে, "মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এত আকস্মিকভাবে ঘটে যে আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রের নিকট ইহা বিস্ময়জনক মনে হইবে যে এই সাম্রাজ্য আগে না ভাঙিয়া পড়িয়া এতদিন কিভাবে টিকিয়াছিল ?"

ঔরঙ্গজেবের বংশধরগণের অযোগ্যতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বিশেষ দায়ী ছিল। ঔরঙ্গজেব ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটগণের (Greater Mughals) মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার তৈমুর বংশের অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিগণের হাতে পড়ে। ঔরঙ্গজেবের তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃযুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত বাহাদুর শাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক বয়স হইবার জন্য তিনি কর্ম ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। তিনি নিজে কিছু না দেখিয়া সভাসদগণের কথায় কাজ করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'শাহ-ই-বেখবর' বা অমনোযোগী সম্রাট বলিত। ইহার পর জাহান্দার শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি লাল কুমারী নামক এক নর্তকীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রাজকার্যে অবহেলা করেন। তাঁহার আমলে দরবারে বিলাস-ব্যসনের ধুম পড়িয়া যায়। তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখশিয়ার সিংহাসনে বসিলেও সৈয়দ ভ্রাতা নামক দুই ভ্রাতাই সকল ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অপশাসন চালায়। সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়, ফররুখশিয়ারকে অন্ধ করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে। ফররুখশিয়ার রাজকার্য সম্পর্কে এমনই অজ্ঞ ছিলেন যে তিনি ১৭১৭ খ্রীঃ এক ফর্মাণ দ্বারা ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার দেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ফর্মাণের বলে বাংলার বাণিজ্যকে একচেটিয়া করিয়া ফেলে। সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় ক্রমে রফি-উদ-দরজাত ও রফি-উদদৌলা নামে মুঘল বংশের দুই বালককে হাতের পুতুল করিয়া সিংহাসনে বসায় এবং হত্যা করে। নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহারা শেষ পর্যন্ত মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসায়। মহম্মদ শাহ নিজাম-উল-মুলকের সাহায্যে সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়কে নিহত করেন। কিন্তু মহম্মদ শাহ বাদশাহের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া দেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে "রঙ্গিলা" বা রঙ্গপ্রিয় বলিত। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগে পারস্যের অধিপতি নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুঠ করেন। মহম্মদ শাহের পর আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের পরিধি কমিয়া দিল্লীর চতুর্দিকের স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। গাজী

পরবর্তী মুঘল সম্রাট-গণের অযোগ্যতা

উদ্দীন নামক মন্ত্রী, সম্রাট আহমদ শাহকে অন্ধ করিয়া সিংহাসনচ্যুত করেন। ইহার পর যথাক্রমে দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলম মুঘল সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলে ইংরাজ শক্তি পলাশীর যুদ্ধে জিতিয়া বাংলায় অধিকার স্থাপন করে। ১৭৬৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী দেন।

মুঘল অভিজাতগণের ক্ষমতার লোভ, দলাদলি এবং বিলাসিতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘনাইয়া আনে। আবদুর রহিম, মহাবৎ খাঁ, সাদুল্লা খাঁ প্রভৃতি ওমরাহগণের ন্যায় প্রতিভাধর ওমরাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের যুগে দেখা যায় নাই। রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর কাজের দায়িত্ব ওমরাহগণকেই বহন করিতে হইত। ওমরাহগণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজকার্যে অমনোযোগী হইয়া বিলাস-ব্যসন লইয়া মত্ত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের ক্ষাত্র শক্তি লোপ পায়। অভিজাতগণ ক্রমে তুরানী, ইরানী ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি উপদলে বিভক্ত হইয়া ক্ষমতা অধিকারের দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠে। সৈয়দ ভ্রাতাগণের ন্যায় অভিজাতগণ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য না দিয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্রাটকে হাতের পুতুলে পরিণত করেন। মুঘল অভিজাতগণের এই অধঃপতন সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বিশেষ দায়ী ছিল। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার মাসির-উল-উমরা নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে পরবর্তী মুঘল অভিজাতগণ এমনই অপদার্থ ছিলেন যে মাত্র কয়েক পংক্তির মধ্যেই তাঁহাদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা যায়।

মুঘল অভিজাতগণের অপদার্থতা

এছাড়া মুঘল রাজবংশের উত্তরাধিকারের আইন ছিল খুবই গোলযোগপূর্ণ। মৃত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না হইয়া সকল পুত্রই সমান দাবীদার হইতেন। ফলে সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া অবিরত ভ্রাতৃযুদ্ধ চলিত। মুঘল বংশের নিয়ম ছিল "তখ্ত বা তখতা" অর্থাৎ হয় সিংহাসন নয় কফিন। সিংহাসন লইয়া বিভিন্ন ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে, এই সুযোগে অভিজাতগণ বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষ লইয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিত। ইংলণ্ডে গোলাপের যুদ্ধের ন্যায় মুঘল সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বদাই লাগিয়া থাকিত।

উত্তরাধিকারের বিরোধ

মুঘল সামরিক ব্যবস্থাও খুবই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিক আর্ভিনের (Irvine) মতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ ইহার সামরিক সংগঠনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। সম্রাটের অধীনে স্থায়ী বেতনভোগী সেনাদল না থাকায় মনসবদারগণের উপর সৈন্য সরবরাহের জন্য নির্ভর করিতে হইত। মনসবদারগণ সেনাদলকে উপযুক্তভাবে গঠন করিত না। তাহারা নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া নিয়মিতভাবে না রাখিয়া সরকারকে ফাঁকি দিত। এছাড়া সেনাদল মনসবদারগণেরই বেশী অনুগত ছিল। সম্রাটকে তাহারা বিশেষ চিনিত না। মুঘল বাহিনী ছিল বিশাল ও গতিবেগহীন। ক্ষিপ্র গতি মারাঠা বাহিনীর সহিত আঁটিয়া উঠা ইহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মধ্য এশিয়া হইতে আগত তুর্কী সেনাদল ছিল

সামরিক সংগঠনের দুর্বলতা

মুঘল বাহিনীর প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু পাঞ্জাবে শিখ শক্তির উত্থানের ফলে মধ্যএশিয়া হইতে তুর্কী সেনা আমদানীর পথ রুদ্ধ হয়। ফলে মুঘল বাহিনী নূতন যোদ্ধার অভাবে শিকড় কাটা গাছের ন্যায় শুকাইয়া যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের মোট রাজস্ব ছিল ৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। শাহজাহানের আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং স্থাপত্য প্রীতি রাজকোষের অর্থকে শূন্য করিয়া দেয়। শাহজাহান ঘাটতি পূরণের জন্য দরিদ্র কৃষকগণকে করভারে জর্জরিত করেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের ন্যায় আপাতঃ আড়ম্বরের আড়ালে তিনি ধ্বংসের বীজ বপন করেন। ঔরঙ্গজেব দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইয়া রাজকোষ একেবারেই শূন্য করিয়া ফেলেন। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজস্বের পরিমাণ কমিতে থাকে। ফলে সেনাদলের বেতন ও কর্মচারীগণের ব্যয় মিটান মুঘল সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। জায়গীর প্রথার প্রচলন থাকায় সুযোগ বুঝিয়া জায়গীরদারগণ বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের আমলে মুঘল সম্রাটগণ এমনই অর্থকষ্টে পড়েন যে মাঝে মাঝে খাদ্যাভাবে রাজকীয় রন্ধনাগারে রন্ধন বন্ধ হইয়া যাইত।[১] এইভাবে শূন্য রাজকোষ লইয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

অর্থ নৈতিক কারণ

মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করিয়া দেয়। সর্বোপরি মুঘল সম্রাটগণ নৌবাহিনী গঠনে অবহেলা দেখাইবার ফলে বৈদেশিক আক্রমণকারীগণের হাত হইতে উপকূল অঞ্চল রক্ষা ও বহির্বাণিজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ইওরোপীয় বণিকগণ তাহাদের প্রবল নৌ শক্তি লইয়া ভারতের উপকূল অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে। মুঘল সম্রাটগণের পক্ষে ইহার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ বণিকেরা কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া নেয়।

সাম্রাজ্যের বিশালতা, নৌবলের অভাব

বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। যতদিন প্রধান মুঘল সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেন ততদিন বহিঃশক্তি ভারতে ঢুকিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু ঔবঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া যায়। নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রীঃ ভারত অভিযান করিয়া দিল্লী নগরী লুঠপাট করিয়া বহুলোক হত্যা করেন। তিনি ভারত হইতে ১৫ কোটি টাকার কোহিনুর মণি, ময়ূর সিংহাসন ও বহু ধনরত্ন লুঠ করিয়া লইয়া যান। ইহার পর আহমদ শাহ আবদালী আফগানিস্থান হইতে আসিয়া পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চল অধিকার করেন। তাঁহারই অনুচর নাজিব-উদ-দৌলা কিছুদিনের জন্য দিল্লীতে আধিপত্য স্থাপন করে। কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ইংরাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিক জাতিগুলি ক্রমে ক্রমে ভারতের উপকূল অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করে।

বৈদেশিক আক্রমণ

১. Sir J. N. Sirkar—Fall of the Mughal Empire.

মুঘল সম্রাট আকবর যে ধর্মসহিষ্ণুতা ও সমদর্শী নীতির উপর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তাহা ঔরঙ্গজেব বর্জন করিয়া মহাভুল করেন। ভারতে বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয় আকবরের চোখ এড়ায় নাই। তিনি সুল-ই-কুল বা সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও জাতীয়তা নীতি নেন। আকবরের এই সমদর্শী নীতির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানায়। হিন্দু রাজপুত বীরগণ বুকের রক্ত ঢালিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পতাকা ভারতের দিকে দিকে স্থাপন করে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব আকবরের সমদর্শী নীতি ত্যাগ করিয়া গোঁড়ামির পরিচয় দেন। তিনি ভারতে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্টার ব্রত নেন। ফলে তিনি অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুগণের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, মন্দির নির্মাণ বন্ধ করার আদেশ দিলে মহা বিপত্তি দেখা দেয়। ষ্ট্যানলি লেনপুলের (Stanley Lanepoole) মতে "ঔরঙ্গজেব ধর্মের জন্য রাজ্যকে বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।" ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া করের বিরুদ্ধে মারাঠা নায়ক শিবাজী এক ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্র দেন। ইহাতে বলা হয় যে "হিন্দুস্থানের সম্রাট ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রের উপর লোভাতুর নজর দিয়া......তৈমুর বংশের সম্মান নষ্ট করিতেছেন.........".[১] ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির ফলে শিখ, জাঠ, বুন্দেলা, রাজপুত ও মারাঠাগণ একে একে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হইয়া ঔরঙ্গজেব প্রাণত্যাগ করেন।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

কোন কোন ঐতিহাসিক ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিক কারণেই কিছুটা গোঁড়ামির পরিচয় দেন। সিংহাসন লাভের জন্য তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দারা শিকোর উদার, সমদর্শী নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রচার করেন। ইহার দ্বারা এক শ্রেণীর মুসলিম আমীর ওমরাহের তিনি সমর্থন পান এবং সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হন।[২] ঔরঙ্গজেব হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন ইহা মনে করার কোন কারণ নাই। দলিল-পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি পুরাতন হিন্দু মন্দির ধ্বংস না করার নির্দেশ দেন এবং বহু হিন্দুকে জমি দান করেন। যাহা হউক, সাধারণভাবে বলা যায় যে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি মুঘল সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে ইহাতে সন্দেহ নাই।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন (Decline and disintegration of the Mughal Empire) ঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রীঃ) মুঘল সম্রাটগণের দুর্বলতা ও শাসন ব্যবস্থায় বিশৃংখলার সুযোগে একে একে প্রাদেশিক শক্তিগুলি নামেমাত্র মুঘল বাদশাহের অধীনে থাকিয়া কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে তাঁহার ভূতপূর্ব উজীর চিন কিলিচ খান দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বা নিজাম-উল-মুলক নিযুক্ত হন। নিজাম-উল-মুলকের চাপে বাধ্য হইয়া দিল্লীর বাদশাহ নিজাম-উল-মুলককে দক্ষিণের সুবাদার ও

দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যস্থাপন

১. Quoted by Tod—Annals and Antiquities of Rajasthan.

২. Khuswant Sing—An Article in Illustrated Weekly of India, February, 1976.

"আসফ ঝা" উপাধি দিতে বাধ্য হন। ইহার ফলে নিজাম প্রায় স্বাধীন নৃপতির ন্যায় দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে থাকেন।

স্বাধীন বাংলা নবাবী প্রতিষ্ঠা

বাংলায়ও একটি স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠা হয়। ঔরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই ১৭০৫ খ্রীঃ তাঁহার বিশ্বাসভাজন কর্মচারী মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলি ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দেওয়ান ও সুবাদারের পদ একই সঙ্গে গ্রহণ করিয়া বাংলার নবাব হিসাবে পরিচিত হন। তিনি আইনতঃ মুঘল বাদশাহের অধীন হইলেও কার্যতঃ স্বাধীনভাবে চলিতে থাকেন। মুর্শিদকুলির শাসনকালে কলিকাতার ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুঘল বাদশাহ ফররুখশিয়ারের নিকট জন সুরম্যানের (Jon Surman) নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। জন সুরম্যান বাদশাহকে বহু উপঢৌকন দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১৭১৭ খ্রীঃ একটি ফর্মাণ লাভ করেন। এই ফর্মাণের বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় দস্তক বা বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পায়। মুর্শিদকুলির জামাতা সুজাউদ্দিন খান ১৭২৭ খ্রীঃ নবাবের গদীতে বসেন। ইহার আমলে বাংলা সুবার সহিত বিহার প্রদেশ যুক্ত হয়। সুজাউদ্দিন প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। তিনি ইংরাজ বণিকগণের দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেন এবং কোম্পানীর লবণ আটক করিয়া বহু টাকা আদায় করেন।[১] সুজাউদ্দিনের পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে বসেন। সরফরাজ ছিলেন অযোগ্য শাসক। ১৭৪০ খ্রীঃ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে নিহত করিয়া তাঁহারই কর্মচারী আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হন। আলিবর্দী খান ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীঃ এই ১৭ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলায় আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকালে বাংলায় "বর্গীর হাঙ্গামা" বা মারাঠা আক্রমণ আরম্ভ হয়। মারাঠা সর্দার রঘুজী ভোঁসলের আদেশে মারাঠা বর্গীগণ বাংলায় ঢুকিয়া ব্যাপক লুঠপাট ও হত্যাকাণ্ড চালায়। আলিবর্দী শত চেষ্টা করিয়াও মারাঠা আক্রমণ বন্ধ করিতে বিফল হন। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খ্রীঃ তিনি এক সন্ধি দ্বারা মারাঠাগণকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দেন এবং মারাঠা পেশবাকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকার করেন। মারাঠা আক্রমণের ফলে পশ্চিম বাংলা ছারখার হইয়া যায়। বহু লোক পূর্ব বাংলা এবং কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয় নেয়। এছাড়া আলিবর্দীর আমলে বিহারের আফগানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মারাঠাগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। আলিবর্দী এই আফগাণ বিদ্রোহ দ্রুত দমন করেন। বাংলায় ইংরাজ বণিকগণের দ্বারা বাংলার আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি হইতে পারে ইহা আলিবর্দী জানিতেন। তিনি এজন্য সতর্ক ছিলেন। ইংরাজ কোম্পানীও আলিবর্দীকে খুব পছন্দ করিত না। রবার্ট অর্মের রচনা হইতে জানা যায় যে "কোম্পানী গোপনে আলিবর্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সিংহাসনে হাতের লোক বসাইবার কথা ভাবিতেছিল।"[২] আলিবর্দীর রাজত্বের শেষের

১. S. Bhattacharya—Rise of the East India Company in Bengal.

২. R. Orme—History of Indoostan.

দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করে। আলিবর্দী ইংরাজগণের সামরিক শক্তিকে সমীহ করিতেন। তিনি বলেন যে "ইহারা হইল মৌমাছির মত, বিরক্ত করিলে হুল ফুটাইবে।" ফলে ইংরাজগণের সহিত গোলমালপূর্ণ সম্পর্ক তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দৌলার জন্য রাখিয়া যান। ডাঃ ব্রিজিন গুপ্তের মতে "আলিবর্দীর রাজত্বকালেই বাংলার নবাবীর পতনের সূচনা দেখা যায়।"

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দিলে রাজপুত, শিখ, জাঠ ও মারাঠাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। (১) রাজপুতগণ যোধপুরের অধিপতি অজিত সিংহ এবং অম্বরের অধিপতি জয়সিংহের নেতৃত্বে মুঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৭১৪ খ্রীঃ মুঘল বাদশাহ রাজপুতগণের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন করিয়া কার্যতঃ রাজপুত রাজাগণের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। (২) শিখগণও বান্দার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুঘল সেনা গুরুদাসপুর গড় অবরোধ করিয়া বহু চেষ্টায় বান্দাকে বন্দী করে। মুঘল সম্রাটের আদেশে বান্দা নিহত হন। কিন্তু শিখগণ দলখালসা বা শিখ-ধর্মীয় সামরিক বাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণের পর পাঞ্জাবে শিখগণ তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর পাঞ্জাব স্বাধীন শিখরাজ্যে পরিণত হয়। (৩) ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরপ্রদেশের মথুরা অঞ্চলের জাঠগণ চূড়ামণ ও রাজারামের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। পরে বদন সিংহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী সুরজমলের নেতৃত্বে জাঠগণ ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করে। ভরতপুর দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে।

রাজপুত, শিখ, জাঠ বিদ্রোহ

মারাঠাগণের উত্থান: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (The rise of the Marathas : Third battle of Panipath) : মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিলে মারাঠাগণ দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়া উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে। শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৬৮০ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র শম্ভুজী ও তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়া যান। রাজারামের পর তাঁহার নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজীর পক্ষে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ মুঘলের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ইহার পর শাহু ছত্রপতি হইয়া সিংহাসনে বসেন। শাহু, বালাজী বিশ্বনাথকে পেশবা বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। ক্রমে শাহুকে নামেমাত্র 'ছত্রপতি' রাখিয়া পেশবা বালাজী বিশ্বনাথ সকল ক্ষমতা অধিকার করিয়া পেশবাতন্ত্র বা পেশবার শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

মারাঠা বিদ্রোহ : পেশবার সাম্রাজ্য স্থাপন

বালাজী বিশ্বনাথ বুঝিতে পারেন যে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখী হইয়াছে। এই সুযোগে মারাঠা শক্তিকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি মুঘল সেনাপতি সৈয়দ হুসেন আলীর সহিত ১৭১৪ খ্রীঃ এক সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি দুর্বল মুঘল সম্রাট অনুমোদন করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির

বালাজী বিশ্বনাথ

ফলে শিবাজীর রাজ্যের উপর মুঘল সম্রাট তাঁহার দাবী ছাড়িয়া দেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের আরও কিছু স্থান শাহুকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুঘল সম্রাটের দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা হইতে শাহু চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার পান। এই ব্যবস্থার ফলে দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকার কার্যতঃ বিলুপ্ত হয়। বালাজী বিশ্বনাথের পর প্রথম বাজীরাও (১৭২০ খ্রীঃ) পেশবা হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর ভারত লইয়া মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প নেন। তিনি ছত্রপতি শাহুকে বুঝান যে, "মুঘল শক্তির শিকড় শুকাইয়া আসিয়াছে। এখন এই শুষ্কপ্রায় বৃক্ষে আঘাত দিলেই ইহার মৃত্যু ঘটিবে।" তিনি দক্ষিণ হইতে আসিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তিকে বিস্তার করার নীতি গ্রহণ করেন।

প্রথম বাজীরাও

উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাগণের সমর্থন লাভের আশায় তিনি 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী''র আদর্শ গ্রহণ করেন। হিন্দু-পাদ-পাদশাহী বলিতে হিন্দু রাজগণের স্বার্থে মারাঠাগণের নেতৃত্বে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠন বুঝায়। মারাঠা সেনাদল মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া দিল্লীর উপকন্ঠে হাজির হয়। মুঘল বাদশাহ মারাঠাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণ হইতে সেনাপতি নিজাম-উল-মুলকে আহবান করেন। কিন্তু ভূপালের যুদ্ধে বাজীরাও নিজামকে পরাজিত করিয়া মালব হইতে চম্বল পর্যন্ত স্থান অধিকার করেন। এদিকে বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশাল তাঁহার রাজ্যের একাংশ পেশবা প্রথম বাজীরাওকে দান করেন। পেশবা বোম্বাইয়ের নিকটস্থ সলসেট ও বেসিন নামক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও অধিকার করেন। এইভাবে ধ্বংসপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের উপর পেশবা প্রথম বাজীরাও এক মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। পেশবা প্রথম বাজীরাও ছিলেন খুবই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাঁহার সাম্রাজ্য নীতির ফলে মারাঠা শক্তি প্রবল হইয়া উঠে।

প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশবার গদীতে বসেন। পেশবা বালাজী বাজীরাও (১৭৪০ খ্রীঃ) তাঁহার পিতার পদাংক অনুসরণ করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নিজামকে উদ্‌গিরের

বালাজী বাজীরাও

যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির প্রাধান্য স্থাপন করেন। তবে তিনি হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু রাজাগণের নিকট কর আদায় করিলে উত্তর ভারতের হিন্দুগণের মধ্যে মারাঠাদের জনপ্রিয়তা কমিয়া যায়। বালাজী বাজীরাওয়ের সেনাদল দিল্লী হইতে নাজিব-উদ-দৌলাকে তাড়াইয়া দিল্লী প্রবেশ করে। ইহার ফলে মুঘল বাদশাহ কার্যতঃ মারাঠাগণের হাতের পুতুলে পরিণত হন। ইতিমধ্যে আফগানিস্থানের অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী পাঞ্জাব অধিকার করিলে দিল্লীর উপর আফগান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মারাঠাগণকে দিল্লী রক্ষার জন্য আবদালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। মারাঠা সেনাপতি রঘুনাথ রাও এজন্য তীব্র আক্রমণ চালাইয়া আবদালীর নিকট হইতে পাঞ্জাব দখল করেন। ইহার ফলে 'কটক অর্থাৎ উড়িষ্যা হইতে আটক বা পাঞ্জাব' পর্যন্ত পেশবার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। মুঘল সম্রাট নামেমাত্র সিংহাসনে থাকেন। তাঁহার বকলমে মারাঠাগণই প্রকৃত ক্ষমতা অধিকার করে।

মারাঠাগণের এই সাম্রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আহমদ শাহ আবদালী কামান সজ্জিত সেনাদল সহ দিল্লীর দিকে আগাইলে এক বিশাল মারাঠা বাহিনীকে সদাশিব রাওয়ের সেনাপতিত্বে তাঁহাকে রুখিবার জন্য পাঠান হয়। পানিপথ প্রান্তরে এই দুই বাহিনী সম্মুখীন হয়। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) এই বিশাল মারাঠা বাহিনী আবদালীর আক্রমণে "কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়।" বহু মারাঠা সেনাপতি ও সৈন্য নিহত হয়। পেশবা বালাজী বাজীরাও ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই পরাজয়ের ফলে সর্বভারতীয় মারাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ

পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির চুড়ান্ত পতন হয় একথা মনে করার কারণ নাই। পরবর্তী পেশবা মাধবরাও মারাঠাদের লুপ্ত ক্ষমতার অনেকাংশ পুনরুদ্ধার করেন। তবে এই যুদ্ধের ফলে কিছুদিনের জন্য মারাঠা শক্তির পতন ঘটে। এদিকে আবদালী যুদ্ধে জিতিলেও দিল্লীর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে ব্যর্থ হন। ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তি যখন এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে সেই সুযোগে ইংরাজগণ বাংলায় ও মাদ্রাজে তাহাদের ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করে। বাংলায় বক্সারের যুদ্ধে জিতিয়া এবং মাদ্রাজে কর্ণাটের যুদ্ধে জিতিয়া ইংরাজেরা বিশেষ প্রতিপত্তি পায়। পানিপথের ক্ষত শুকাইলে, মারাঠাগণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে আগাইয়া আসে। কিন্তু ইংরাজ শক্তি সহজে তাহাদের প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়। "পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের ফলে বাংলায় ইংরাজ শক্তির যে বীজ রোপিত হয়, পানিপথে মারাঠাগণের পরাজয়ের ফলে তাহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।"[১]

পানিপথের যুদ্ধের ফল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পলাশী হইতে বক্সার : বাংলায় ইংরাজ শক্তির উত্থান

(From Plassey to Buxar : Rise of the English in Bengal)

পলাশীর যুদ্ধ : নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক (The Battle of Plassey : Relations of Sirajuddaulah with the East India Company) : নবাব আলিবর্দী খান ১৭৫৬ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন (নবাব মুর্শিদকুলি খান হইতে নবাব আলিবর্দী খানের আমল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস প্রথম পরিচ্ছেদে পৃঃ ৭ দেখ)। আলিবর্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার মসনদে বসেন। আলিবর্দীর বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম এবং মধ্যমা কন্যার পুত্র পূর্ণিয়ার দেওয়ান শওকত জঙ্গ, সিরাজের সিংহাসন লাভের বিরোধিতা করেন। ঘসেটি বেগমকে

সিরাজের উত্তরাধিকারের বিরোধ; কলিকাতায় ইংরাজগণের কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান

১. "If Plassey had sown the seeds of British supremacy in India, Panipat afforded time for their maturing and striking roots."

সিরাজের বিরোধিতা করিতে ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ বিশেষ উৎসাহ দেন। সিরাজ সিংহাসনে বসিবার পর তাঁহার মাতৃস্বসা ও প্রতিদ্বন্দ্বী ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল প্রাসাদ হইতে আনিয়া নবাব অন্তঃপুরে নজরবন্দী করেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। সিরাজের দৃঢ় হস্তক্ষেপে ঘসেটি বেগমের চক্রান্ত বিফল হয়। ঘসেটি বেগমের পরামর্শদাতা ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে সিরাজ রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসিয়া সরকারের হিসাব-পত্র বুঝাইয়া দিতে আদেশ দেন। রাজবল্লভ নবাবের শাস্তির ভয়ে ভীত হইয়া পড়েন। তাঁহার নির্দেশে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস পরিবারের লোকজন ও প্রচুর ধনরত্ন লইয়া ঢাকা হইতে কলিকাতায় নৌকায় করিয়া পলায়ন করেন। কলিকাতার ইংরাজ গভর্ণর ড্রেক তাঁহাদের আশ্রয় দেন। নবাব কৃষ্ণদাসকে ফিরাইয়া দিতে বার বার আদেশ দিলেও কলিকাতা কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা দাবী করেন যে নবাবের প্রজাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার অধিকার তাঁহাদের আছে। ইহাতে সিরাজ ক্রুদ্ধ হন।



সিরাজ-উদ্-দৌলা

এস. সি. হিলের মত

সিরাজ সিংহাসনে বসিবার পর কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার প্রতি আনুগত্য জানাইতে ও নজরানা দিতে টালবাহানা করে। এমন কি ইংরাজেরা গোপনে সিরাজের বিপক্ষে ঘসেটি বেগমকে সমর্থন করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ঐতিহাসিক হিলের মতে ইংরাজদের বিশ্বাস ছিল যে সিরাজের রাজত্ব টিকিবে না। এই কারণে তাহারা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেয় এবং সিরাজকে নজরানা দিতে বিলম্ব করে।[১] যাহাই হউক ইংরাজ কোম্পানীর এই আচরণের ফলে নবাবের ধারণা জন্মে যে কোম্পানী তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায়। ফলে সিরাজের সহিত ইংরাজ কোম্পানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

কলিকাতায় বেআইনী দুর্গ নির্মাণ

সিরাজের রাজত্বের গোড়ার দিক হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নবাবের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পুনর্নির্মাণ আরম্ভ করে। এই কাজ ছিল ঘোর বেআইনী। নবাব কোম্পানীকে দুর্গ নির্মাণ বন্ধের আদেশ দিলে, প্রথমে কোম্পানী দুর্গ নির্মাণের কথা অস্বীকার করে। পরে তাহারা এই অজুহাত দেখায় যে ফরাসী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কোম্পানীর দুর্গ নির্মাণ করা হইতেছে। নবাবের সন্দেহ হয় যে কোম্পানী এই দুর্গের আশ্রয় লইয়া দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটের ন্যায় বাংলায় ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করিবে। সুতরাং নবাব কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ বন্ধের জন্য বারবার কোম্পানীকে কড়া আদেশ দেন। কিন্তু কোম্পানী তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। কলিকাতা কর্তৃপক্ষের সহিত সরজমিন আলোচনার জন্য নবাব তাঁহার বিশেষ দূত নারায়ণ

১. S. C. Hill—Bengal in 1756—57. Vol. I.

দাসকে কলিকাতায় পাঠাইলে গভর্ণর ড্রেক সেই দূতকে গুপ্তচর বলিয়া অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়া তাড়াইয়া দেন। ইহাতে নবাবের মর্যাদা নষ্ট হয়। তাঁহার প্রতি কোম্পানীর অবজ্ঞা প্রকাশ পায়।

এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীগণ দস্তকের মারাত্মক অপব্যবহার করায় নবাবের সহিত বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। দস্তক ছিল বাংলায় কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্যের জন্য সম্রাট ফররুখশিয়ারের (১৭১৭ খ্রীঃ) দেওয়া পাশ। ইহা কেবলমাত্র কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবসায়ের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য দস্তক ব্যবহার করিতে থাকে। এমন কি তাহারা অর্থের বিনিময়ে দেশী ব্যবসায়ীগণকেও দস্তক বিক্রয় করে। দেশীয় ব্যবসায়ীগণ দস্তক পাইয়া কোম্পানীর পতাকা উড়াইয়া নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দিয়া ব্যবসায় করিতে থাকে। দস্তকের অপব্যবহার লইয়া নবাব সুজা-উদ্দিনের আমল হইতে কোম্পানীর সহিত বিরোধ চলিতেছিল। সিরাজের আমলে কোম্পানী ইহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিলে নবাব ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু কোম্পানী সিরাজের প্রতিবাদ পত্রে কান দিতে রাজী হয় নাই।

দস্তকের অপব্যবহার

নবাব দেখিলেন যে ইংরাজদের দমন না করিলে তাঁহার পক্ষে কর্তৃত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। ইংরাজেরা তাঁহাকে অমান্য করিয়া দুর্গ নির্মাণ, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান, দস্তকের অপব্যবহার করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করে। ইহার প্রতিকারের জন্য তিনি ১৭৫৬ খ্রীঃ ইংরাজের কাশিমবাজার কুঠী অধিকার করিয়া কলিকাতা অভিমুখে সেনাদল লইয়া আগান। কলিকাতার শাসনকর্তা ড্রেক নবাবের সহিত মীমাংসা না করিয়া তাঁহার সেনাদলকে বাধা দিলে নবাব প্রবল যুদ্ধের পর কলিকাতা ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ (১৭৫৬ খ্রীঃ ২০শে জুন) অধিকার করেন। ড্রেক ও অধিকাংশ ইংরাজ কলিকাতা হইতে নদীপথে পলাইয়া জাহাজে করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে ফলতায় আশ্রয় নেন। নবাব যুদ্ধে জিতিবার পর কলিকাতার নাম পাল্টাইয়া মাতামহ আলিবর্দীর নাম অনুসারে 'আলিনগর' রাখেন। নবাব কলিকাতা জয়ের পর শওকত জঙ্গকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে নিহত করেন।

নবাবের কলিকাতা অধিকার

ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিয়া নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ১৪৬ জন ইংরাজকে বন্দী করেন। উহাদের মধ্যে হলওয়েল নামক ইংরাজও ছিলেন। হলওয়েলের মতে এই ১৪৬ জন বন্দীকে ১৮ × ১৪—১০ ইঞ্চি একটি কক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। এই কক্ষে একটিমাত্র জানালা ছিল। ফলে বন্দীগণের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা যায়। এই ঘটনাকে কুখ্যাত "অন্ধকূপ হত্যা" (Black Hole Tragedy) বলা হয়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ লেখকগণ অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন।[১] হলওয়েলের বর্ণিত কাহিনীতে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। হলওয়েল অন্ধকূপ হত্যায় নিহত ব্যক্তিগণের যে নামের তালিকা দিয়াছেন তাহাতে অন্ধকূপের ঘটনার আগে মৃত লোকের নামও দেখা যায়। তাছাড়া

অন্ধকূপ হত্যা

১. ভারতী পত্রিকা।

এই ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জন লোক ধরিতে পারে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। সম্প্রতি নোয়েল বার্কার নামক জনৈক ইংরাজ লেখক অন্ধকূপ হত্যাকে বাস্তব ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] তবে ইহা সত্য যে এই ঘটনার জন্য নবাবের কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল না। তাঁহার অজ্ঞাতে ইহা ঘটে।

পলাশীর যুদ্ধের আসল কারণ

ঐতিহাসিক এস. সি. হিলের মতে কলিকাতা আক্রমণ ও ইংরাজের সহিত সংঘর্ষের জন্য নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাই দায়ী ছিলেন। নবাবের "অহমিকা ও লোভ" (vanity and avarice) ইহার জন্য দায়ী ছিল। এস. সি. হিল মনে করেন যে নবাব কোম্পানীর নিকট হইতে অর্থ পাইবার লোভেই কলিকাতা অভিযান করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্রিজিন গুপ্ত এইমত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোম্পানীর ঐশ্বর্য (opulence) এবং ক্ষমতা কোম্পানীর কর্মকর্তাগণকে এমনই মত্ত করিয়া দেয় যে তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদী অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। নবাবের ন্যায়সঙ্গত কয়েকটি দাবী যথা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ, দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ ও কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে তাহারা অস্বীকার করেন। নবাব কোম্পানীর নিকট কোন অর্থ দাবী করেন নাই। সুতরাং তাঁহার 'লোভের' পরিচয় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, নবাব সিংহাসনে বসিয়াই ইংরাজদের উচ্ছেদের সংকল্প নেন ইহাও মনে করার কারণ নাই।[২] আসলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণের আচরণ তাঁহার মনে সন্দেহ ও বিরাগ সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক ব্রিজিন গুপ্তের মতে সমসাময়িক ঘটনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ইংরাজের সহিত নবাবের সংঘাতকে অনিবার্য করিয়া তুলে।

ক্লাইভের কলিকাতা পুনরধিকার ও আলিনগরের সন্ধি

কলিকাতার পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছাইলে মাদ্রাজের দৃঢ়চিত্ত গভর্ণর সণ্ডার্স (Saunders) কর্ণেল ক্লাইভ ও এ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে সৈন্য লইয়া কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিয়া নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বাংলায় পাঠান।[৩] নবাবের সেনাপতি মানিক চাঁদ কলিকাতা রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ না করিয়া পিছাইয়া গেলে ক্লাইভ সহজে কলিকাতা অধিকার করেন। তিনি নবাবের বন্দর হুগলী লুঠ করেন। ইহার পর ক্লাইভ কলিকাতা আক্রমণের জন্য নবাবকে দায়ী করিয়া ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া নবাবকে চরমপত্র দেন। ইংরাজগণের ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে নবাব পুনরায় সসৈন্যে কলিকাতার সন্নিকটে



রবার্ট ক্লাইভ

১. Noel Barker—The Black Hole in Calcutta.

২. Long's Selections of unpublished Records of the Govt. Vol I. P. 33.

৩. B. Gupta—Sirajudaulah.

বরাহনগরে উপস্থিত হন। ক্লাইভ রাত্রিকালে নবাবের শিবিরে হঠাৎ আক্রমণ চালাইয়া নবাবকে নিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ইহার ফলে নবাব ভীত হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে নবাব সংবাদ পান যে আহমদ শাহ আবদালী উত্তর ভারত হইতে বাংলায় আক্রমণ চালাইতে পারেন। ইহাতে বিচলিত হইয়া নবাব ইংরাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া আলিনগরের সন্ধি (১৭৫৭ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির বলে ইংরাজ কোম্পানী কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ, টাকশাল বসাইবার অধিকার ও আরও অনেক সুবিধা পায়। কলিকাতা জয়ের দ্বারা নবাব যাহা লাভ করেন আলিনগরের সন্ধি দ্বারা তিনি তাহা হারাইয়া ফেলেন এবং তাঁহার পতনের পথ প্রস্তুত হয়।

চন্দননগর আক্রমণ:—

ক্লাইভ জানিতেন যে ইওরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহার জের ধরিয়া ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ বাধিবে। যদি ফরাসীগণ নবাবের পক্ষে যোগ দেয় তবে ইংরাজের বিস্তর অসুবিধা হইবে। আলিনগরের সন্ধি দ্বারা তিনি নবাবকে কলিকাতা হইতে সরাইয়া দিয়া চন্দননগরের ফরাসীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। ইহার পর তিনি ফরাসী শক্তি ধ্বংসের সংকল্প নেন। নবাব মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলে ক্লাইভ চন্দননগরের ফরাসী কুঠী অধিকার করেন। ফরাসী গভর্ণর ল ও তাঁহার সঙ্গীগণ নবাবের দরবারে আশ্রয় নেন। আলিনগরের সন্ধি ছিল ক্লাইভের কূটবুদ্ধির জয়সূচক সন্ধি। ইহা দ্বারা তিনি নবাবকে নিরস্ত করিয়া, তাঁহাকে ফরাসী সাহায্য হইতে বঞ্চিত করেন। ইহার পর ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণের জন্য চেষ্টা চালান।

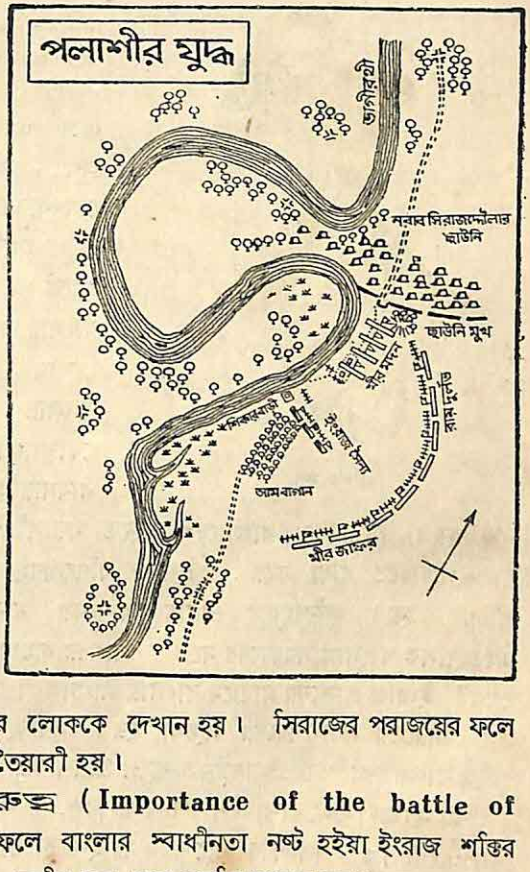
মীরজাফরের সহিত গোপন চক্রান্ত

কূটবুদ্ধি ক্লাইভ লক্ষ্য করেন যে নবাবের দরবারের জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি হিন্দু ও মীরজাফর, ইয়ার লতিফ প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণের অধিকাংশই সিরাজের প্রতি বিরক্ত। তিনি ইঁহাদের সহিত গোপনে যোগ দিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেন। নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের সহিত একটি গোপন চুক্তি (১৭৫৭ খ্রীঃ) দ্বারা ক্লাইভ স্থির করেন যে ইংরাজ সেনা সিরাজকে তাড়াইয়া মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাইবে। তাহার বিনিময়ে ক্লাইভ ও কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ পারিতোষিক ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্যিক সুবিধা পাইবে। মীরজাফর ফরাসীগণকে বাংলাদেশ ছাড়িতে বাধ্য করিবেন। এই সন্ধির পর ক্লাইভ, সিরাজকে আক্রমণের সংকল্প নেন।

পলাশীর যুদ্ধ

ক্লাইভ যুদ্ধের জন্য অজুহাত দেখান যে নবাব আলিনগরের সন্ধির শর্ত ভাঙিয়াছেন। তিনি নবাবকে একটি চরমপত্র দিয়া তাঁহাকে কলিকাতা আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বলেন। এছাড়া তিনি নবাব দরবারের আশ্রিত ফরাসীগণকে ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিতে দাবী জানান। নবাবের উত্তর পাইবার আগেই ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া গঙ্গাতীরে পলাশী গ্রামে উপনীত হন। ক্লাইভকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সেনাদল লইয়া পলাশীতে উপস্থিত হন। ১৭৫৭ খ্রীঃ ২৩শে জুন ইংরাজ ও নবাবের সেনাদলের মধ্যে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ হয়। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের প্রভাবে নবাবের অধিকাংশ

সেনা যুদ্ধের সময় নিশ্চেষ্ট থাকে। নবাবের অনুগত সেনাপতি মীরমদন বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। নবাবের অন্যতম অনুগত সেনাপতি মোহনলাল ইংরাজ সেনাগণের উপর তীব্র আক্রমণ চালান। কিন্তু নবাব বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের পরামর্শে মোহনলালকে যুদ্ধ থামাইতে আদেশ দেন। ইহার ফলে মোহনলালের বাহিনী মনোবল হারাইয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া নবাবের সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। নবাব সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছদ্মবেশে বিহারের দিকে পলাইতে গিয়া বন্দী হন। মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। সিরাজের মৃতদেহকে হাতীর পিঠে করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদের লোককে দেখান হয়। সিরাজের পরাজয়ের ফলে বাংলায় ইংরাজ শক্তির প্রতিষ্ঠার পথ তৈয়ারী হয়।



পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব (Importance of the battle of Plassey): পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া ইংরাজ শক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কবি নবীন চন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক লেখক মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের দ্বারা বাংলাদেশে ইংরাজ শক্তির প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ হাতে-কলমে বাংলার শাসন না লইয়া নবাব মীরজাফরের বকলমে সকল ক্ষমতা অধিকার করে। নবাবের সামরিক শক্তির দুর্বলতা লইয়া ইংরাজেরা প্রকৃত ক্ষমতা পায়। কিন্তু এই যুদ্ধের দ্বারা ইংরাজের চূড়ান্ত জয়লাভ হয় মনে করিবার কারণ নাই। কারণ মীরজাফরের পরবর্তী নবাব মীরকাশিম বাংলাদেশ হইতে ইংরাজ শক্তিকে হঠাইবার চেষ্টা করেন। যদি বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় না হইত তবে বাংলায় সহজে ইংরাজ শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পতন এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভকেই বাংলায় ইংরাজের চূড়ান্ত জয়ের স্বাক্ষর বলা যায়।

ইংরাজের পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা

পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বলচিত্ত নবাব মীরজাফর ইংরাজের হাতের পুতুল হইয়া বাংলার সিংহাসনে বসিলে ইংরাজ "সিংহাসনের পশ্চাতে শক্তি"তে (Power behind the throne) পরিণত হয়। মীরজাফর একে একে কোম্পানীর হাতে শাসন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাগুলি ছাড়িয়া দেন। কোম্পানীর কর্মচারীগণ বাংলাদেশ হইতে প্রভূত অর্থ লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে পাঠাইতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীগণের দ্বারা বাংলার এই অর্থনৈতিক শোষণকে "পলাশীর লুণ্ঠন" (Plassey Plunder) বলা হয়। বাংলার বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। দেশী ব্যবসায়ীগণের স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার নষ্ট হয়। ইংরাজগণ বাংলাদেশ হইতে ফরাসী ও অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগুলিকে হাত গুটাইতে বাধ্য করে। ইংরাজ বণিকগণই কার্যতঃ বাংলার ভাগ্য বিধাতায় পরিণত হয়। কবিগুরুর ভাষায় "বণিকের মানদণ্ড" "রাজদণ্ডে" পরিণত হয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে "পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার নব জাগরণের সূচনা হয়।" ইংরাজ শাসনের মাধ্যমে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রবেশ করিলে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের সূচনা হয়। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের যুগ হইতে বাংলা তথা ভারত আধুনিক যুগে প্রবেশ করে।

পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফল



মীরজাফর

মীরজাফরের শাসনকাল, ১৭৫৭—৬০ খ্রীঃ (The reign of Mirzafar)ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইয়া মুর্শিদাবাদের রাজকোষ হইতে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেন। ক্লাইভ স্বয়ং ১২ লক্ষ পাউণ্ড ও ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ করেন। তবুও ইংরাজেরা মীরজাফরকে আরও টাকার জন্য চাপ দিলে তিনি বিরক্ত হইয়া ওলন্দাজগণের সাহায্য চান। ইংরাজ নৌবাহিনী বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজ নৌবহরকে হঠাইয়া দেয়। কলিকাতার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে। মীরজাফরের পর কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের চেষ্টায় মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম সিংহাসনে (১৭৬০ খ্রীঃ) বসেন।

মীরকাশিমের শাসনকাল ও বক্সারের যুদ্ধ, ১৭৬০—৬৪ খ্রীঃ (Mirkashim and the battle of Buxar)ঃ মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম সিংহাসনে বসিবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এক গোপন চুক্তি করেন। এই চুক্তির দ্বারা মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের

রাজস্ব ও নগদ দশ লক্ষ টাকা দিতে এবং কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যগণকে নগদ অর্থ উপঢৌকন দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। সিংহাসনে বসিবার পর মীরকাশিম এই শর্তগুলি পূরণ করেন। মীরকাশিম ভাবিয়াছিলেন যে বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিশ্রুতিমত অর্থ মিটাইয়া দিলেই কোম্পানীর হাত হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। মীরকাশিমের ভুল ভাঙিতে দেরী হইল না। তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ তাঁহাকে নামেমাত্র নবাব রাখিয়া বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হাত করিতে চায়। মীরকাশিম ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের লোক। তিনি কোম্পানীর হাত হইতে বাংলার নবাবীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে দৃঢ় সংকল্প নেন।

মীরকাশিমের দৃঢ় নীতি

পাটনার নায়েব রাম নারায়ণ নবাবকে উপেক্ষা করিয়া কোম্পানীর দালাল হিসাবে কাজ করিতেছিল। মীরকাশিম তাঁহাকে নবাবের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। মীরকাশিম বুঝিতে পারেন যে মুর্শিদাবাদে ইংরাজের প্রভাব এমনই বাড়িয়াছে যে এই স্থানে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। মুর্শিদাবাদ ছিল কলিকাতার নিকটবর্তী। ইংরাজেরা এজন্য সহজে মুর্শিদাবাদে প্রভুত্ব বিস্তার করে। মীরকাশিম এজন্য তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরের দুর্গে স্থানান্তর করেন। নিজ শক্তি বাড়াইবার জন্য তিনি ইওরোপীয় সেনাপতি সমরু ও মার্কারের সাহায্যে নবাবী সেনাদলকে তালিম দেন। তিনি দৃঢ় হাতে শাসন করিয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও করেন। এছাড়া তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে নবাবী ফর্মাণ লাভ করেন।

মীরকাশিমের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা

কোম্পানী বাজপাখীর ন্যায় তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মীরকাশিমের শক্তি বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতেছিল। কোম্পানী জানিত যে নবাবের স্বার্থ ও কোম্পানীর স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং কোম্পানীর সহিত মীরকাশিমের সংঘর্ষ বাধিতে বেশী দেরী হইল না। মীরকাশিম লক্ষ্য করেন যে কোম্পানীর কর্মচারীগণ দস্তক বা বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকারের ঘোর অপব্যবহার করিতেছে। প্রথমতঃ, কোম্পানীর কর্মচারীগণ তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য দস্তক ব্যবহার করিয়া নবাব সরকারে রাজস্ব ফাঁকি দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় ব্যবসায়ীগণকে দস্তক বিক্রয় করিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীগণকেও নবাব সরকারে রাজস্ব ফাঁকি দিয়া, কোম্পানীর কর্মচারীগণ অসাধু উপায়ে অর্থ আদায় করিতেছে। তৃতীয়তঃ, যে সকল দেশীয় ব্যবসায়ী নবাব সরকারে শুল্ক দিয়া ব্যবসায় করিত তাহাদের মালের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ফলে তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। চতুর্থতঃ, নবাব সরকারের রাজস্বের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। এই সকল বিষয় উপলব্ধি করিয়া নবাব মীরকাশিম কোম্পানীর সহিত দস্তক লইয়া মীমাংসার চেষ্টা চালান। নবাবের যুক্তি উপলব্ধি করিয়া কলিকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমের সহিত একটি মীমাংসা চুক্তি রচনা করেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের স্বার্থপর, উদ্ধত ইংরাজ কর্মকর্তাগণ এই চুক্তি নাকচ করেন।

মীরকাশিমের সহিত কোম্পানীর বিরোধ

কলিকাতার কর্তৃপক্ষের এই জেদের ফলে আপোষের পথে দস্তক সমস্যার সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। মীরকাশিম উপায়ান্তর না দেখিয়া দেশীয় বণিকগণের বাণিজ্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেন। দেশী, বিদেশী সকল ব্যবসায়ী বিনা শুল্কে ব্যবসায়ের অধিকার পায়। ফলে দস্তকের বলে যে একচেটিয়া বিশেষ সুবিধা ইংরাজগণ ভোগ করিত তাহা বিনষ্ট হয়। ইহাতে কলিকাতা কাউন্সিল ক্রুদ্ধ হইয়া মীরকাশিমকে পদচ্যুত করিতে সংকল্প নেয়।



মীরকাশিম

এদিকে পাটনার ইংরাজ কুঠিয়াল এলিস সাহেব নবাবের উপর উদ্ধত ও অপমানজনক ব্যবহার করিয়া পাটনা শহর বলপূর্বক দখল করেন। নবাব এজন্য এলিসকে উচিত শাস্তি দেন। কলিকাতা কাউন্সিল এজন্য নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মীরকাশিমের সহিত কোম্পানীর বিরোধের কারণ ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু ডাঃ কালীকিঙ্কর দত্তের মতে এই বিরোধের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক।

মেজর এলিসের আচরণ

কোম্পানীর সেনাপতি মেজর এ্যাডামস সসৈন্যে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মীরকাশিমের সেনাদলের সামরিক দক্ষতা ছিল না। ইহার আগে গুর্খা রাজা পৃথ্বীনারায়ণের সহিত যুদ্ধে এই সেনাদলের দুর্বলতা বুঝা গিয়াছিল। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে নবাবী সেনা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়। কাটোয়া, গিরিয়া, সুতী ও উদয়নালার যুদ্ধে হারিয়া মীরকাশিম বাংলা ছাড়িয়া অযোধ্যায় পলাইয়া যান। অযোধ্যায় আসিবার পর মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের সহিত জোটবদ্ধ হন। মীরকাশিম ও মিত্রশক্তির সেনাদল ১৭৬৪ খ্রীঃ বক্সারের প্রান্তরে ইংরাজের সহিত শক্তি পরীক্ষায় নামে। বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি হেক্টর মনরো মীরকাশিম ও মিত্রশক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেন। পলাতক অবস্থায় মীরকাশিমের মৃত্যু ঘটে। বাংলায় ইংরাজ শাসন পাকাপাকি ভাবে কায়েম হয়।

বক্সারের যুদ্ধ

মীরকাশিম ষড়যন্ত্রের দ্বারা সিংহাসন লাভ করিলেও, তিনি ইংরাজ কোম্পানীর হাত হইতে বাংলার নবাবীকে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা করেন তাহাতে তাঁহার দোষ স্খালন হইয়াছে। তাছাড়া মীরজাফর ষড়যন্ত্রের দ্বারা সিংহাসন পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে মীরকাশিম যদি ষড়যন্ত্র করেন এজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। মীরকাশিমের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার নবাবী সিংহাসনের স্বাধীনতা রক্ষা করা। মীরজাফরের ন্যায় ক্লীবের মত তিনি ইংরাজের নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। মীরকাশিমের শাসনদক্ষতা মীরজাফর অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তিনি সমরু

মার্কার, গর্গিন খাঁ প্রভৃতি বিদেশীয় সেনাপতির সাহায্যে সামরিক ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজাইবার চেষ্টা করেন। রামনারায়ণ নামে উদ্ধত কর্মচারীকেও তিনি দৃঢ় হাতে দমন করেন। গোলাম হোসেন নামক সমসাময়িক ঐতিহাসিক এজন্য তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণও তাঁহার প্রশংসা করেন। মীরকাশিম প্রকৃতপক্ষে ভাগ্য-বিড়ম্বিত ব্যক্তি ছিলেন। যোগ্যতায় তিনি প্রায় আলিবর্দীর সমতুল্য হইলেও তিনি এমন এক সঙ্কট সময়ে আসেন যে তাঁহার পক্ষে ঘটনার মোড় ফিরান সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মীরকাশিম প্রজাগণের উপর অত্যধিক করভার চাপান।[১] তাঁহার সামরিক দক্ষতা বিশেষ ছিল না। তাঁহার সেনা সংগঠন ছিল দুর্বল। সুতরাং পরাজয়ের হতাশায় তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ঐতিহাসিক ডডওয়েল (Dodwell) মনে করেন যে মীরকাশিমের সহিত কোম্পানীর বিরোধ কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাচক্রে ঘটিত হয়।[২] কিন্তু ডাঃ কালীকিংকর দত্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে মীরকাশিমের নীতি কোম্পানীর অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধী ছিল। এজন্য কোম্পানী নবাব মীরকাশিমকে যে কোন প্রকারে হঠাইতে মনস্থ করে।

মীরকাশিমের কৃতিত্ব

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব (Importance of the battle of Buxar)ঃ পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় ইংরাজ শক্তির যে বীজ রোপিত হয় বক্সারের যুদ্ধে জয়ের ফলে তাহা বৃক্ষে পরিণত হয়। পলাশীর যুদ্ধে নবাবী সেনার সহিত কোম্পানীর সেনার প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা হয় নাই। ডাঃ স্মিথের মতে "পলাশীর যুদ্ধ ছিল কয়েকটা কামানের লড়াই মাত্র, আর বক্সারের যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত বিজয়"।[৩] বক্সারের যুদ্ধের রায় অভ্রান্তভাবে ইংরাজের অনুকূলে যায়। পলাশীর যুদ্ধ ছিল আসলে একটি খণ্ডযুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের পরেও অনেকের ধারণা ছিল যে নবাবী সেনা চেষ্টা করিলে কোম্পানীর সেনাকে হঠাইয়া দিতে পারিবে। বক্সারের যুদ্ধে ইহা সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন ভারতীয় সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধ-কৌশল ইংরাজ সামরিক সংগঠন অপেক্ষা অনেক দুর্বল ছিল। বক্সারের যুদ্ধে জিতিবার পর বাংলার শাসন ক্ষমতা সব দিক হইতে পাকাপাকি-ভাবে ইংরাজের হস্তগত হয়। বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। কোম্পানী ইহার পর রাজনৈতিক শক্তির আড়ালে বাংলার অর্থনৈতিক শোষণ বিনা বাধায় চালাইতে সক্ষম হয়। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে আসায় কোম্পানী ইহাকে মুনাফা লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্যের জন্য স্বদেশ হইতে মূলধন না আনিয়া মাছের তেলে মাছ ভাজার ন্যায় বাংলার রাজস্ব দ্বারা

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনা

১. Vide N. K. Sinha—Economic History of Bengal Vol. II.

২. "It was a war of circumstances rather than of intentions." Dodwell—Cambridge History of India.

৩. "Plassey was a cannonade but Buxar a decisive battle." Smith—Oxford History.

বাংলার মাল কিনিয়া সেই মাল ইওরোপে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। পলাশীর যুদ্ধে কেবলমাত্র বাংলার নবাবের পরাজয় হয়। বক্সারের যুদ্ধের ফলে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব ও বাদশাহ শাহ আলম একযোগে পরাজিত হন। ইহা ইংরাজের পক্ষে কম ক্ষমতার পরিচায়ক ছিল না। এই যুদ্ধের পর কোম্পানী অযোধ্যার নবাবের উপরে যে সন্ধি চাপাইয়া দেয় তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে অযোধ্যাও কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এইভাবে বক্সারের যুদ্ধ উত্তর ভারতে কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রধান সোপান রচনা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈতশাসন

(The Grant of Diwani and the Dual System)

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ (The Granting of the Diwani) : বক্সারের যুদ্ধের সময় কলিকাতা কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ বৃদ্ধ মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার মসনদে নবাব হিসাবে নির্বাচিত করে। মীরজাফর সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন দেওয়ান নন্দকুমারের সহায়তায় শাসনকার্য চালাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণ নন্দকুমারের উপর আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। ১৭৬৫ খ্রীঃ বৃদ্ধ মীরজাফরের মৃত্যু হইলে কোম্পানীর কর্তাগণ কাল-বিলম্ব না করিয়া মীরজাফরের পুত্র নজম্-উদ্-দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। বালক নজম্-উদ্-দৌলার সহিত কোম্পানী এক সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির সুযোগ লইয়া কলিকাতায় কোম্পানীর কর্তাগণ নন্দকুমারকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে এবং নায়েব দেওয়ানের পদে কোম্পানীর অনুগত ও বিশ্বাসভাজন মহম্মদ রেজা খানকে বসায়।[১] বিহারের দেওয়ানের পদে সিতাব রায় নিযুক্ত হয়।

নন্দকুমারের পতন
রেজা খাঁর উত্থান

"মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলে তিনি বাংলার শাসন ব্যবস্থায় কোম্পানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বিস্তারের প্রধান যন্ত্রে পরিণত হন।"[২] বালক নবাব নজম-উদ-দৌলা কলিকাতার গভর্ণর ও কর্মাধ্যক্ষগণকে ১৫ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিতে বাধ্য হন। কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে মুঘল বাদশাহের নিকট নবাবের সনদ চাহিবার ক্ষমতা লোপ করা হয়। আগে বাদশাহের সনদের বলে নবাব

---

১. Mill—History of India. Vol. III.

২. "Reza Khan became useful to the Company as chief instrument of their political and administrative contral of the country." A. M. Khan—The Transition in Bengal.

কোম্পানীর অধীনতা মুক্ত ছিলেন। এখন হইতে তিনি কোম্পানীর অধীন হইয়া পড়েন। নবাব মুঘল বাদশাহের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলেন। এমন কি নবাবকে তাঁহার কার্যের জন্য কোন কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে কোম্পানীর পরামর্শ লইতে বাধ্য করা হয়। নবাব নামে মাত্র গদিতে থাকেন। আসল ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। কোম্পানী "সিংহাসনের পশ্চাতে শক্তিতে" (Power behind the throne) পরিণত হয়। নবাবের নাম লইয়া কোম্পানীর দালাল রেজা খাঁ সকল কাজকর্ম পরিচালনা করেন। এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাইয়া দুর্নীতির চূড়ান্ত আরম্ভ করে। কোম্পানীর যে কোন কর্মচারী

কোম্পানীর কর্মচারী গণের দুর্নীতি



কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

দেশীয় লোককে নিপীড়ন করিয়া অর্থ আদায় আরম্ভ করে। নবাবের কর্মচারীগণ ইহার প্রতিকারে ব্যর্থ হয়।[১]

কোম্পানীর দুর্নীতির খবর বিলাতে পেঁছায়। বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ বাংলায় কোম্পানীর শাসনে দুর্নীতির প্রতিকার ও বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানীর শাসনকে সংগঠন করিবার জন্য লর্ড ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ক্লাইভ কলিকাতায় আসিয়া দেখেন যে বক্সারের যুদ্ধের ফলে কোম্পানী বাংলায় যে সকল ক্ষমতা লাভ করিয়াছে তাহার আইনগত ভিত্তি নাই। কারণ তখনও পর্যন্ত বাংলার শাসক নিয়োগের ক্ষমতা আইনতঃ মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের হাতেই ছিল। বাদশাহের অবস্থা যতই দুর্বল হউক না কেন লোকের চোখে তিনিই ছিলেন

ক্লাইভের দ্বিতীয়বার গভর্ণর পদ গ্রহণ : এলাহাবাদের সন্ধি

১. N K. Sinha—Economic History of Bengal. Vol. II.

আইনতঃ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কোম্পানী বাদশাহের বিনা অনুমতিতে বাংলায় বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করায় তাহার আইনগত ভিত্তি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বক্সারের যুদ্ধের পর বাদশাহ শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানী কোন সন্ধি স্থাপন করে নাই। তাঁহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করার দরকার ছিল। তৃতীয়তঃ, বাংলার নবাব নজম-উদ-দৌলার সহিত কোম্পানী যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল তাহা ক্লাইভের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নবাবকে নামেমাত্র মসনদে রাখিয়া বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্বের অধিকার কোম্পানীর হাতে নেওয়া। এই সকল কথা ভাবিয়া ক্লাইভ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সহিত এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধি (১৭৬৫ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে, (১) শাহ আলম অযোধ্যার কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ পাইবেন। (২) সুবা বাংলা অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানী পাইবে। (৩) এই দেওয়ানী লাভের বিনিময়ে কোম্পানী বাদশাহকে বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা নজরানা দিবে। (৪) বাংলার নবাব নজম-উদ-দৌলাকে তাঁহার ব্যয় নির্বাহের জন্য কোম্পানী ৫৩ লক্ষ টাকা দিবে। এই অর্থের বিনিময়ে বাংলার নবাব বাংলার রাজস্বের উপর তাঁহার দাবী ছাড়িয়া দিবেন। এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধির বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে।

এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি (১৭৬৪ খ্রীঃ) দ্বারা কোম্পানী অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার সহিত শান্তি স্থাপন করে। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে—(১) নবাব সুজা-উদ-দৌলা কোম্পানীকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ ছাড়িয়া দিবেন। (২) চুনার জেলা ও চুনার দুর্গ কোম্পানীর অধিকারে থাকিবে। (৩) নবাব কাশীর জমিদারীটি কোম্পানীর আশ্রিত বলবন্ত সিংহ ও তাহার বংশধরগণকে দিবেন। (৪) নবাব সুজা-উদ-দৌলা কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা বক্সারের যুদ্ধের দরুন ক্ষতিপূরণ দিবেন। (৫) সুজা-উদ-দৌলা কোম্পানীর সহিত আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা স্থাপন করিবেন। (৬) কোম্পানী অযোধ্যায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবে।

সুজা-উদ-দৌলার সহিত সন্ধি

এলাহাবাদের সন্ধি ও কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানী লাভ ক্লাইভের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। প্রথমতঃ, এই সন্ধির বলে কোম্পানী নবাবকে নামেমাত্র বাংলার সিংহাসনে রাখিয়া আসল ক্ষমতা করায়ত্ব করে। নবাব থাকেন ছায়া আর কোম্পানী হয় কায়া (Shadow and substance)। নবাব রাজস্বের অধিকার হারাইয়া বিষহীন ঢোঁড়া সাপে পরিণত হন। দ্বিতীয়তঃ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাংলায় কোম্পানী যে সকল ক্ষমতা ধীরে ধীরে লাভ করিয়াছিল তাহা বল প্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুঘল সম্রাটের অনুমোদন না থাকায় এই ক্ষমতার আইনগত ভিত্তি ছিল না। বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভের পর বাংলায় কোম্পানীর ক্ষমতা আইনগত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহার পর বাংলার নবাবের পক্ষে বাদশাহের ফর্মাণ পাইয়া মীরকাশিমের ন্যায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার ক্ষমতা তিরোহিত হয়। নন্দকুমারের ন্যায় নবাবের পুরাতন কর্মচারীগণকে বরখাস্ত করিয়া কোম্পানীর অনুগত কর্মচারী যথা রেজা

দেওয়ানী লাভের গুরুত্ব

খান, সিতাব রায় প্রভৃতিকে রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োগ করা হয়। নন্দকুমার প্রভৃতি পুরাতন কর্মচারীগণ নবাবের স্বাধীনতা বাঁচাইবার চেষ্টা করায় বরখাস্ত ও দণ্ডিত হন।[১] সুতরাং কোম্পানী দেওয়ানী লাভের ফলে বাইরে নবাবের পদ বজায় রাখা হইলেও তাঁহার আসল ক্ষমতা একেবারে লোপ করা হয়। নবাবের প্রধান কর্মচারীগণ কোম্পানীর দ্বারাই মনোনীত হইয়া কোম্পানীর ইঙ্গিতেই কাজ করিতে থাকে। চতুর্থতঃ, কোম্পানী নবাবকে পদচ্যুত করিয়া সরাসরি বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করিলে ফরাসী ও অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিগুলির মনে ঈর্ষা দেখা দিত। এক্ষেত্রে অন্য ইওরোপীয় শক্তিগুলি ইংরাজের অধিকার অস্বীকার করিতে পারিত। নবাবকে সিংহাসনে রাখায় ইংরাজ কোম্পানী বলিতে থাকে যে তাহারা নবাবের অধীনে কাজ করিতেছে মাত্র। এইভাবে ক্লাইভ একটি "আইনগত ধোঁকা" (Legal fiction) তৈয়ারী করেন। নবাবকে সিংহাসনে রাখার ফলে ভারতের অন্যান্য দেশীয় শাসকগণের মনে ইংরাজের সম্পর্কে আশঙ্কার নিরসন হয়।

দ্বৈতশাসন (Dual Government) ঃ ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলায় কুখ্যাত দ্বৈতশাসন (Dual Government) প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলার নবাবের দুইপ্রকার ক্ষমতা ছিল, যথা—(১)—দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ও দেওয়ানী মামলার বিচারের দায়িত্ব ; (২) নিজামত ও ফৌজদারী মামলার বিচার, আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব। দেওয়ানীর মাধ্যমে কোম্পানী বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লইলেও আইন-শৃংখলা, বিচার প্রভৃতি অন্যান্য দায়িত্ব নবাবের হাতে রাখিয়া দেয়। ইহার ফলে বাংলায় দ্বৈত শাসন দেখা দেয়। কোম্পানী ক্ষমতা পাইলেও দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, অপর দিকে নবাবের দায়িত্ব থাকিলেও ক্ষমতা ছিল না। কোম্পানী দায়িত্বহীন ক্ষমতার অধিকারী (Power without responsibility) হয়। বাস্তবক্ষেত্রে নবাব বা কোম্পানী কেহই নিজামতী ও দেওয়ানী শাসনের দায়িত্ব বহন করিতেন না। নবাব বা কোম্পানীর নামে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণই এই দায়িত্ব নেন। নজম-উদ-দৌলার সহিত কোম্পানীর সন্ধির বলে নবাবের বদলে নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও সিতাব রায় এই দায়িত্ব বহন করেন। কোম্পানী রাজস্ব পাইয়া সন্তুষ্ট থাকে।

দ্বৈত শাসন

দ্বৈত শাসনের আর একটি ব্যবস্থা হইল এই যে, ক্লাইভ কোম্পানীকে রাজস্বের অধিকারী করিলেও আপাততঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানীর কোন শাসনযন্ত্র না থাকায় তিনি নবাবের শাসনযন্ত্রকে রাজস্ব আদায়ের কাজে লাগান। মহম্মদ রেজা খানকে বাংলার এবং সিতাব রায়কে বিহারের নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এই সকল কর্মচারীগণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নবাবের ছিল না। ইহারা যতদিন কোম্পানীকে রাজস্ব যোগায় ততদিন কোম্পানীও ইহাদের অত্যাচার ও শোষণের দিকে নজর দেয় নাই। ফলে এই সকল দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্বার্থপর কর্মচারীগণের শোষণে ও অত্যাচারে বাংলার সাধারণ লোকের দুর্দশার সীমা থাকে নাই। কোম্পানীর অসাধু কর্মচারীগণও ইহাদের সহিত শোষণের কাজে

দ্বৈতশাসনের কুফল

১. Mill—History of India. Vol. III.

অংশীদার হয়। গভর্ণর ভের্লেষ্ট এই দুর্নীতির প্রতিকারের জন্য সুপারভাইজার (Supervisor) নামে এক শ্রেণীর ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করেন। কিন্তু সুপারভাইজারগণও দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ঐতিহাসিক ডাঃ এন. কে. সিংহ বাংলার এই ভাঙা মঙ্গলচণ্ডীর যুগের এক মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকিয়াছেন। মীরকাশিমের টাকার দরকার পড়ায় তিনি পুরাতন ভূমি রাজস্বের হার পাল্টাইয়া অল্প সময়ে যতখানি সম্ভব বেশী আদায়ের নিয়ম করেন। ইহার ফলে প্রজাগণের কষ্টের অবধি ছিল না। কোম্পানী দেওয়ানী পাইবার পর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার মূল নীতির পরিবর্তন দেখা দেয়। মীরকাশিমের করের হার পাল্টাইয়া কোম্পানী ভূমি করের হার আরও বাড়াইয়া দেয়। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগণের নাম ছিল আমিল। ইহারা গ্রামে অখণ্ড প্রতাপ লাভ করে। দেওয়ানী চালু হইলে প্রতি জেলা হইতে বহুগুণ বেশী রাজস্ব আদায় করা হয়। পূর্ণিয়ার আমিল সুচেত রাম আলিবর্দীর আমলে ৪ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় দিতেন। দেওয়ানীর আমলে তিনি পূর্ণিয়া হইতে ২৫ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় দিয়াও নিগৃহীত হন। দিনাজপুর জেলা হইতে আলিবর্দীর আমলে ১২ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, দেওয়ানীর আমলে এই স্থান হইতে ১৭ লাখ টাকা আদায় হয়। কর্মচারীগণ বুঝিতে পারে যে রাজস্ব বেশী আদায় না করিলে চাকুরী থাকিবে না। ফলে প্রজা শোষণ করিয়া রাজস্ব আদায়ের ধুম পড়িয়া যায়। এদিকে কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণও বেনামীতে কোম্পানীর নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইয়া প্রজাশোষণ আরম্ভ করে। ইংরাজ প্রতিনিধি মাইকেল বেচার কলিকাতার কর্মকর্তাগণকে এই ধ্বংসকারী ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলেও তাহাতে কোন ফল হয় নাই।[১] ইহার ফলে ১৭৭০ খ্রীঃ বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে। এইভাবে দেওয়ানী ও দ্বৈত শাসন বাংলার জীবনে অভিশাপ ডাকিয়া আনে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৭৭০ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

(The Famine of 1770)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ও ফলাফল (The circumstances leading to the Great Bengal Famine of 1770 and its results) : ভারতের অর্থনীতি হইল কৃষিপ্রধান। কৃষির উন্নতির সহিত জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কৃষির অবস্থা খারাপ হইলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ কম হইলে খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়ে। বেশী দামে খাদ্য কিনিবার ক্ষমতা না থাকায় খাদ্যাভাবে লোক মারা পড়ে। ভারতের কৃষি, প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত বেশী অথবা কম হইলে ফসলের

মুঘল আমলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ না হইবার কারণ

১, Dr. N. K. Sinha—Economic History of Bengal.

হানি ঘটে। মুঘল যুগে সরকারী ভূমি রাজস্বের হার নীচু হওয়ায় লোকের কষ্ট কম ছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে মুঘল সরকারের খয়রাতি দপ্তরের তৎপরতায় লোকের দুর্ভোগ অনেক কম হইত। সুতরাং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে তেমন বড় কোন দুর্ভিক্ষ ও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায় না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভ করিবার পর গ্রামাঞ্চলের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পুরাতন নিম্নহারের মুঘল ভূমিরাজস্ব লোপ পায়। জমি হইতে যতদূর সম্ভব মুনাফা পাইবার জন্য কোম্পানী অধীর হইয়া পড়ে। রাজস্ব বিভাগের পুরাতন দায়িত্বশীল কর্মচারীগণকে বরখাস্ত করিয়া চটপটে ও করিতকর্মা লোকেদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় কৃষকের স্বার্থ না দেখিয়া যত বেশী সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। পূর্ণিয়া জেলা হইতে আলিবর্দীর আমলে ৪ লাখ টাকা আদায় হইত। এক্ষণে পূর্ণিয়া হইতে কর্মচারী সুচেতরাম ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব কোম্পানীকে আদায় দেয়। তবুও সুচেতরাম অযোগ্য হিসাবে কোম্পানীর আদেশে বরখাস্ত হয়। পূর্ণিয়ার উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে অন্যান্য জেলায়ও কিরূপ কঠোর-ভাবে বাড়তি রাজস্ব আদায় করা হয়। যত বেশী পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় তাহার উপর কর্মচারীগণের চাকুরীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এদিকে দ্বৈত শাসনের ফলে কোম্পানীর কর্ম-চারীগণের অত্যাচার ও অনাচারের কোন প্রতিবিধান হয় নাই। নবাব ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসিয়া থাকিতে বাধ্য হন। বাংলার প্রজাগণের উপর নির্মম শোষণ চলিতে থাকে। কোন কোন বিবেকবান ইংরাজ কর্মচারী এই ভয়ানক রাজস্ব নীতির পরিণাম সম্পর্কে কলিকাতার কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিলেও তাঁহারা ইহাতে কান দেন নাই। ফলে রায়ত অতিরিক্ত করভারে ধুঁকিতে থাকে। কেহ কেহ ভিক্ষুকে পরিণত হয়। ছোট জমিদারগণ কপর্দকশূন্য হয়। কোম্পানীর কর্মচারীগণ কে কত বেশী টাকা রাজস্ব আদায় করিতে পারে তাহার প্রতিযোগিতায় নামিয়া রায়ত শোষণের কল চালায়। মহম্মদ রেজা খান বাড়তি করের উপর কোম্পানীর নজরানা নামে আরও একটি কর চাপাইয়া কোম্পানীকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করেন।[১]

কোম্পানীর আমলে শোষণমূলক রাজস্ব নীতি

হাঁসকে খাইতে না দিয়া সোনার ডিম্ব প্রসব করিবার জন্য চাপ দিলে যেমন তাহার মৃত্যু ঘটে, সেইরূপ বাংলার চাষীর ধ্বংস আরম্ভ হয়। গভর্ণর ভেরেলেষ্ট অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে বুঝিয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বিলাতে জানান যে "ব্যবসায়ে যত খুশী লাভ করা যায়, কিন্তু জমির উপর হইতে যত খুশী রাজস্ব আদায় করা যায় না। জনসাধারণের রক্ষার দিকে নজর না রাখিয়া যত খুশী টাকা আদায় করিলে ইংরাজের জাতীয় চরিত্র কলঙ্কিত হইবে।" কিন্তু ভেলেষ্টের সতর্কবাণীতে কোন কাজ হয় নাই। অতিরিক্ত করের চাপে যখন বাংলার চাষীর নাভিশ্বাস উঠে সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্রীঃ অনা-বৃষ্টির জন্য কোন কোন জেলায় ফসল হানি ঘটে। ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়।

শোষণমূলক রাজস্ব নীতির কুফল

১. A. M. Khan—The Transition in Bengal.

কলিকাতার কর্তাগণ সেদিকে নজর না দিয়া মাদ্রাজের ইংরাজ সেনার জন্য কয়েক জাহাজ ভর্তি চাল ও ধান বাংলা হইতে মাদ্রাজে পাঠাইয়া দিলে খাদ্য সংকট তীব্র হয়। ১৭৬৯ খ্রীঃ গভর্ণর কার্টিয়ারের আমলে ব্যাপক অনাবৃষ্টির ফলে মাঠগুলি খাঁ খাঁ করিতে থাকে। ফলে বাংলায় মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়ে। এই দুর্ভিক্ষ পরের বৎসর ১৭৭০ খ্রীঃ প্রবল আকারে দেখা দেয়। বাংলা ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া লোকে ইহার নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দিয়াছে। বাংলা মন্বন্তর কথাটির একটি অর্থ হইল আকাল বা বিরাট দুর্ভিক্ষ।

অনাবৃষ্টি

দুর্ভিক্ষজনিত খাদ্যাভাব ও মহামারীতে যখন হাজারে হাজারে লোক মরিতে থাকে, সেই সময় কোম্পানী "মরার উপর খাঁড়ার ঘা" দেয়। দুর্ভিক্ষের জন্য ভূমি রাজস্ব মকুব না করিয়া কোম্পানী উহা কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করে। তদুপরি "নজর" নামে এক বাড়তি করও আদায় করা হয়। রেজা খাঁ ও ইওরোপীয় রাজস্ব পরিদর্শকগণ কে কত বেশী রাজস্ব আদায় দেখাইতে পারে তাহার প্রতিযোগিতা চালায়। লোকের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সরকারের এই নির্মম উপেক্ষা ইহার আগে কখনও দেখা যায় নাই। হাজারে হাজারে লোক না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিলে কোম্পানীর কর্তাগণ দয়াপরবশ হইয়া মুর্শিদাবাদে খয়রাতি সাহায্যের জন্য মোট ৯০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই সাহায্য ছিল মরুভূমিতে এক ফোঁটা জলের বিন্দুর মত। ইহার দ্বারা লোকের কোন উপকার হয় নাই। এদিকে কোম্পানীর সেনাদলের খাবার বাজার হইতে চড়াদামে কোম্পানী কিনিয়া লইবার ফলে বাজারে আরও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। দরিদ্র রায়তকে তাহার খোরাকীর ধান সেনাদলের জন্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়।

দুর্ভিক্ষ কালীন অবস্থায় কোম্পানীর রাজস্ব আদায়

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠ উপন্যাসের মুখবন্ধে এই মন্বন্তরের এক মর্মস্পর্শী চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রে লোকে খাদ্যাভাবে গাছের পাতা, অখাদ্য, কুখাদ্য খাইয়া হাজারে হাজারে অনশনে ও মহামারীতে প্রাণ দেয়। বাংলার গ্রামগুলি জন শূন্য হইয়া পড়ে। বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস এই মন্বন্তরের অনেক পরে আসিয়াও দেখেন যে বাংলার ⅓ অংশ ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। স্বচ্ছল স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দময় গ্রামজীবনের স্বপ্ন বাংলা হইতে মুছিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক ও তন্তুবায়, মাঝি, কর্মকার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের দুর্ভিক্ষে মৃত্যু ঘটায় কিছুকালের জন্য কৃষিকার্য ও অন্যান্য কাজের লোকের অভাব দেখা দেয়। ইংলণ্ডে Black Death বা মহামারীর পর যেমন চাষের কাজের লোকের অভাব ঘটে, বাংলায় অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, লোকে অন্নাভাবে নীতিজ্ঞান হারাইয়া নানা দুর্নীতিমূলক কাজে জড়াইয়া পড়ে। উত্তর বাংলা ও পূর্ব বিহারে এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। ফলে সামাজিক দুর্নীতি ও অবক্ষয় এই সকল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ঘটে। চতুর্থতঃ, দেশে আইনশৃংখলা ও নিরাপত্তা লোপ পায়। কোম্পানী নিজামতের দায়িত্ব না লওয়ায় নবাবের পক্ষে উহা রক্ষা করা

মন্বন্তরের ফলে ধ্বংস ও মৃত্যু

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলাফল

সম্ভব হয় নাই। ফলে উত্তর ভারত হইতে দলে দলে সন্ন্যাসী ও ফকিরের ছদ্মবেশে ডাকাত ও লুঠেরার দল গ্রাম বাংলাকে লুঠপাট করিয়া শ্মশানে পরিণত করে। গ্রাম সন্নিহিত ঘন জঙ্গলে এই ডাকাত দল আত্মগোপন করিয়া তাহাদের লুণ্ঠন চালায়। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, মালদহ প্রভৃতি জেলায় এই সকল সমাজ বিরোধী লোকের উৎপাত প্রবল আকার ধরে। তেরাই ও পাহাড় অঞ্চল হইতে পাহাড়িয়াগণও সমতলে লুণ্ঠন চালায়। পুরাতন নবাবী শাসন ব্যবস্থা একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। পঞ্চমতঃ, দুর্ভিক্ষের গ্রাসে বহু পুরাতন জমিদার বংশ লোপ পায় বা দারিদ্রের করাল গ্রাসে পড়ে। জমিদারগণের ⅔ অংশ দুর্ভিক্ষে মারা পড়ে। কলিকাতায় ব্যবসায় চালাইয়া নগদ টাকা লাভ করিয়া এক নূতন শ্রেণীর লোক কোম্পানীর নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া নূতন জমিদার হইয়া বসে। ইহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় বাস করিয়া নায়েব, গোমস্তা দ্বারা জমিদারীর কাজ চালাইতে থাকে। প্রজা ও মাটির সহিত এই সকল নূতন জমিদারের নাড়ির যোগ ছিল না।[১] পুরাতন জমি বন্দোবস্ত বাতিল হওয়ায় নূতন গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্তের চলন করেন। কিন্তু ইহার ফলে কোম্পানীর রাজস্বে ঘাটতি পড়ে। বিলাতের পরিচালক সভা বুঝিতে পারেন যে আর দ্বৈত শাসন চলিবে না। এজন্য তাঁহারা কলিকাতার কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেন যে, "কোম্পানী নিজে নিজেই জমির বন্দোবস্ত, রাজস্ব আদায়, রাজস্ব হার প্রভৃতি দেওয়ানীর দায়িত্ব গ্রহণ করুক। দ্বৈত শাসনের অবসান হউক।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়ারেন হেস্টিংস হইতে ডালহৌসী : শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার

(Administrative, Judicial and other reforms from Warren Hastings to Dalhousie)

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন সংস্কার (Reforms of Warren Hastings) : ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীঃ গভর্ণর নিযুক্ত হন। কোম্পানীর দ্বৈত শাসনের ফলে বাংলায় যে দুঃখ-দুর্দশা ও শাসন বিভাগে যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল ওয়ারেন হেস্টিংস তাহাতে সর্বপ্রথম শৃংখলা স্থাপনের চেষ্টা করেন। হেস্টিংস বুঝিতে পারেন যে দৃঢ় এবং শৃংখলাপূর্ণ শাসন প্রবর্তন না করিলে কোম্পানীর শিশু শক্তি ভাঙিয়া পড়িবে। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার শাসক হিসাবে ক্লাইভ ও ওয়ারেন

১. N. K. Sinha—Economic History of Bengal Vol. II.

হেস্টিংসের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে "ক্লাইভ বিজেতা হিসাবে বড় হইলেও, বিজিত দেশে ন্যায়বিচারমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। রাষ্ট্র গঠনের কাজের জন্য ক্লাইভ অপেক্ষা তাঁহার পদের উত্তরাধিকারী অনেক গভীরতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।"[১] স্যার আলফ্রেড লায়ালের মতে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের অগ্রদূত ছিলেন।



ওয়ারেন হেস্টিংস

দ্বৈত শাসনের কুফল লক্ষ্য করিয়া হেস্টিংস বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা লোপ করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি কোম্পানীর হাতে নেন। দ্বৈত শাসনের আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত নায়েব দেওয়ান রেজা খান ও সিতাব রায় পদচ্যুত হন। হেস্টিংস সরকারী কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। মুর্শিদাবাদ ছিল নবাবের রাজধানী। কলিকাতায় কোম্পানীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। ইহার ফলে কলিকাতাই কার্যতঃ সরকারী শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে শাসন ব্যবস্থার সহিত রাজস্ব ব্যবস্থা জড়িত ছিল। রাজস্ব বিভাগের পরিচালনার জন্য তিনি নিম্নলিখিত কর্মচারী ও সমিতি নিয়োগ করেন। জেলায় জেলায় জমির বন্দোবস্ত করিবার জন্য হেস্টিংস একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রাম্যমান কমিটি (Committee on Circuit) নিযুক্ত করেন। এই কমিটি জেলায় জেলায় ঘুরিয়া নীলামের দ্বারা উচ্চ নীলামদারকে জমির বন্দোবস্ত দিত। গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের ৪ জন সভ্য এই ভ্রাম্যমান সমিতির সভ্য ছিলেন।

রাজস্ব বিভাগীয় শাসন সংস্কার

রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতি জেলায় কালেক্টর নামে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। হেস্টিংস প্রথমে পাঁচসালা বন্দোবস্ত বা ৫ বৎসরের জন্য নীলামদারকে জমি বন্দোবস্ত দেন। পরে তিনি একসালা বন্দোবস্ত বা প্রতি বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেন। ইহার ফলে প্রতি বৎসর নীলাম করিয়া জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। হেস্টিংস পরে ভ্রাম্যমান সমিতি উঠাইয়া দিয়া রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ডের হাতে রাজস্ব পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গভর্ণর ও কাউন্সিলের সভ্যগণ এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন। রায় রায়ান ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। রাজস্ব বোর্ড রাজস্বের হিসাব পত্র পরীক্ষা করিত ও জমি বন্দোবস্তের কাজ লক্ষ্য করিত। সরকারী কোষাগার ও হিসাব পরিচালনার জন্য হেস্টিংস এ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল নামক কর্মচারী নিয়োগ করেন। রাজস্ব বিভাগের কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য হেস্টিংস "আমিনী কমিশন" নিয়োগ করেন। জেলা কালেক্টরগণ দুর্নীতিগ্রস্থ হইয়া পড়িলে হেস্টিংস এই পদ লোপ করেন। আমিনী

১. "Clive lacked the art of giving to conquest a foundation of justice...for statesmanship. We must look to his profounder successor." P. Spear—Oxford History.

কমিশনের রিপোর্ট পাইবার পর তিনি পুনরায় কালেক্টরগণকে জেলার কর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন।

বাণিজ্য বিভাগের শাসন সংস্কার

কোম্পানীর বাণিজ্য বিভাগের উন্নতির জন্য হেস্টিংস দস্তকের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। দেশীয় ও ইওরোপীয় সকল ব্যবসায়ীকে তিনি মালের উপর শতকরা ২½ শুল্ক আদায় দিতে নির্দেশ দেন। জমিদারগণকে আলাদাভাবে বাড়তি শুল্ক আদায় না করিতে আদেশ দেওয়া হয়। হেস্টিংস শুল্ক আদায়ের জন্য ৫টি চৌকী স্থাপন করেন। এই চৌকীগুলি ছিল যথা, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, হুগলী, পাটনা। কোম্পানীর গোমস্তাগণ যাহাতে তাঁতী ও অন্যান্য মালের উৎপাদকের উপর অত্যাচার না করে সেজন্য হেস্টিংস নির্দেশ দেন। তিনি কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের জন্য জর্জ বোগলেকে ভূটান ও তিব্বতে পাঠান। হেস্টিংস মুদ্রা সংস্কার করিয়া মুদ্রার ওজন ও মান স্থির করেন।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংস লক্ষ্য করেন যে দ্বৈত শাসনের ফলে দেশের বিচার ব্যবস্থা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। নবাবের হাতে নিজামতী বা ফৌজদারী মামলার এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব থাকিলেও তাঁহার হাতে ক্ষমতা ছিল না। অপরদিকে কোম্পানীর হাতে ক্ষমতা থাকিলেও দায়িত্ব ছিল না। ফলে বিচার ব্যবস্থায় অনাচার প্রবেশ করে। বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন না করিলে দেশে সুশাসন স্থাপন ও দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব ছিল না। এজন্য তিনি বাংলাকে ৩৫টি জেলায় ভাগ করেন। প্রতি জেলাকে শাসন ও বিচার ব্যবস্থার নিম্নতম ও প্রধান ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। জেলা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা হেস্টিংসই প্রথম চালু করেন। ইহা এখনও চলিতেছে। প্রতি জেলায় মফস্বল দেওয়ানী আদালত নামে একটি দেওয়ানী আদালত ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা হয়।[১] মফস্বল দেওয়ানী আদালতে জেলা কালেক্টরগণ হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলিম মৌলভীর সাহায্যে হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে দেওয়ানী মামলার বিচার করিতেন। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করা যাইত। জেলা ফৌজদারী আদালতে কাজী ও মুফতীগণ মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচার করিতেন। জেলা কালেক্টরগণ উপযুক্ত তদন্ত ও সাক্ষী সাবুদ লইয়া ফৌজদারী বিচার করা হইল কিনা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। জেলা ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিতে হইলে সদর নিজামত আদালতের অনুমতি লইতে হইত। জেলা ফৌজদারী আদালত হইতে সদর নিজামত আদালতে আপীল করা যাইত। সদর নিজামত আদালতে নবাবের প্রতিনিধি ও প্রধান কাজী বিচার কার্য চালাইতেন। গভর্ণর ও কাউন্সিল সদর নিজামত আদালতের কাজকর্মের উপর নজর রাখিতেন। হেস্টিংস নিয়ম করেন যে আদালতের সকল কাজকর্ম ও আদেশ নথিতে লিপিবদ্ধ থাকিবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলার রায় দিতে হইবে। ইহার ফলে সুবিচার করা সম্ভব হইত। মীমাংসার দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তির উপর হেস্টিংস জোর দেন।

---

১. Keith—Constitutional History of India.

হেস্টিংসের আমলে গ্রামাঞ্চলে কোম্পানীর থানা ও পুলিশ ছিল না। এজন্য আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য হেস্টিংস প্রধানতঃ জমিদারগণের উপর নির্ভর করেন। জমিদারগণ আইন ভঙ্গকারী ও সমাজ বিরোধীগণকে গ্রেপ্তার করিতেন। হেস্টিংস কিছু সংখ্যক ফৌজদার ও থানাদার নামক পুলিশ নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্থ হইয়া পড়ায় এবং এই সকল কর্মচারীর বেতন দেওয়ার মত অর্থ কোম্পানীর না থাকায় এই পদগুলি লোপ করা হয়। হেস্টিংস ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।

পুলিশ ও অন্যান্য সংস্কার

এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানীর আমলে সর্বপ্রথম শৃংখলাপূর্ণ শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। হেস্টিংস স্বদেশে ও বিদেশে জীবিতকালে বহু নিন্দিত হইলেও নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার শাসন সংগঠনের কাজকে প্রশংসা করা যায়। যতটা সংস্কার করা দরকার ছিল তাহা না করিলেও তিনি অনেকখানি কাজ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজস্ব সংস্কার সফল না হইলেও নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা তিনি ঠিক পথের সন্ধান করেন। তাঁহারই প্রচলিত ছক ধরিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস শাসন সংগঠন করেন। হেস্টিংস তাঁহার শাসন সংস্কারের কাজ বিনা বাধায় করিতে পারেন নাই। কাউন্সিলের বহু সভ্য তাঁহার ঘোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে দমেন নাই। হেস্টিংস একহাতে মারাঠা ও মহীশূরের সহিত যুদ্ধ চালান এবং অপর হাতে শাসন সংস্কারের যে বীজ বপন করেন উত্তরকালে তাহা কোম্পানীর সুশাসনের দ্বারা পূর্ণ সাফল্য লাভ করে। হেস্টিংস সংস্কৃত, ফারসী ভাষা ও প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য দেখান। কোম্পানীকে নিছক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাষ্ট্রযন্ত্রে পরিণত করার কাজ তিনিই আরম্ভ করেন।

কৃতিত্ব

কর্ণওয়ালিসের শাসন সংস্কার (Reforms of Lord Cornwallis) ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৫ খ্রীঃ গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় সামরিক বিভাগের কাজে কাটাইলেও কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার সংগঠনে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখান। তিনি যে শাসন ব্যবস্থা গঠন করেন তাহা "কর্ণওয়ালিস প্রথা" (Cornwallis System) নামে খ্যাতিলাভ করে এবং কোম্পানীর আমলে মোটামুটিভাবে তাহার ভিত্তিতেই শাসন চলে। কর্ণওয়ালিস তাঁহার শাসনকার্য সংগঠনের জন্য কয়েকজন উপযুক্ত সহকারীর সহযোগিতা পান। বাণিজ্য বিভাগে চার্লস গ্রাণ্ট, রাজস্ব বিভাগে স্যার জন শোর, জেমস গ্রাণ্ট ও জোনাথান ডানকান এবং বিচার বিভাগে প্রাচ্য বিদ্যার মহা পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোনস কর্ণওয়ালিসের সহযোগীর কাজ করেন।


লর্ড কর্ণওয়ালিস

কর্ণওয়ালিস তাঁহার দপ্তরকে তিনভাগে ভাগ করেন, যথা বাণিজ্য, রাজস্ব ও শাসন এবং বিচার বিভাগ। প্রথমেই তিনি বাণিজ্য বিভাগের সংস্কার করেন। বাণিজ্য বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১১ জন হইতে কমাইয়া ৫ জন করা হয়। অসাধু কনট্রাক্টরগণ ও কোম্পানীর যে সকল কর্মচারী কনট্রাক্ট লইয়া দুর্নীতি করিত তাহাদের দণ্ডিত করা হয়। কোম্পানীর বিলাতে রপ্তানীর মাল যোগানের জন্য কনট্রাক্ট প্রথার স্থলে এজেন্সী প্রথা চালু করা হয়। তাঁতী ও অন্যান্য মালের উৎপাদকের উপর শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ করা হয়। চার্লস গ্রান্টের তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে।

বাণিজ্য বিভাগের শাসন ব্যবস্থা

শাসন বিভাগের উন্নতির জন্য কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯-১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত নানারকম পরীক্ষা চালান। তিনি প্রথমে জেলার ইংরাজ কালেক্টরগণকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচার ও আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব দেন। কালেক্টর হিসাবে তাহারা রাজস্ব বোর্ডের নিকট কাজের জন্য দায়ী থাকিত এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাহারা গভর্ণর জেনারেল ও সদর দেওয়ানী আদালতের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই। ইহাতে কালেক্টরগণের উপর কাজের চাপ বাড়ে ও দুর্নীতি দেখা দেয়। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের বলে তিনি পাকাপাকিভাবে শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে আলাদা করেন। জেলার কালেক্টরগণের বিচার করিবার ক্ষমতা তিনি লোপ করেন। জেলা কালেক্টরগণকে জেলার রাজস্ব নিয়মিতভাবে আদায়ের ভার দেওয়া হয়। 'সূর্যাস্ত আইন' প্রয়োগ করিয়া বাংলা বৎসরের শেষ দিনে জমিদারগণকে কর আদায় দিতে বাধ্য করা হয়। কলিকাতার রাজস্ব বোর্ড কালেক্টরগণের রাজস্ব বিষয়ক কাজের তদারকি করিবার ভার পায়।

শাসন বিভাগের সংস্কার

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস সুবা বাংলাকে ৩৫টি জেলায় ভাগ করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস এই জেলাগুলিকে পুনর্বিন্যাস করিয়া ২৩টি জেলায় পরিণত করেন। জেলাগুলিকে শাসনকার্যের ভিত্তি হিসাবে পরিণত করা হয়। তিনি কলিকাতায় আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন। জেলাগুলিতে আইন-শৃংখলা, শান্তি রক্ষার জন্য কয়েকটি থানা স্থাপন করা হয়। দারোগা ও পুলিশেরা প্রতি থানার শান্তি রক্ষা করিত। চৌকিদারগণ গ্রামে শান্তি রক্ষার কাজে নিযুক্ত হয়। জমিদারগণকে আইন-শৃংখলা রক্ষার ও ফৌজদারী সম্পর্কিত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টরগণ দারোগাগণের কাজের তদারকি করিবার ভার পান। সরকারী কর্মচারীগণের কার্যপদ্ধতি ও দায়িত্ব তিনি কোড কর্ণওয়ালিস নামক আইনাবলীর দ্বারা স্থির করেন।

জেলা সংগঠন

কর্ণওয়ালিস শাসন ও বিচার বিভাগে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতীয়গণের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা উঁচু ছিল না। ফলে তাঁহার আমলে কোম্পানীর উচ্চপদগুলিতে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য বাড়ে এবং এই ব্যবস্থা বেণ্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে।

ইওরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ

কর্ণওয়ালিস আইনের শাসন (Rule of Law) প্রবর্তনে ঘোর আগ্রহী ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীঃ তিনি একটি রেগুলেশন দ্বারা এই নিয়ম করেন যে—(১) সরকারী কর্মচারীগণের বে-আইনী কাজের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে। (২) সরকার ও কোন প্রজার মধ্যে সম্পত্তি ঘটিত গোলযোগ দেখা দিলে আদালতের সাহায্যে তাহা নিষ্পত্তি করা যাইবে।

কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) তিনি জেলার বিচার বিভাগের দায়িত্ব কালেক্টরগণের হাত হইতে লইয়া জেলা জজ নামক কর্মচারীগণের হাতে দেন। প্রতি জেলায় জেলা জজের নেতৃত্বে আদালত স্থাপিত হয়। এইভাবে তিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করেন। পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা প্রভৃতি বড় শহরগুলিতে নগর আদালত বা সিটি কোর্ট নামে বিশেষ আদালত স্থাপিত হয়। জেলা জজ ও সিটি জজের পদে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী নিযুক্ত হয়। (২) জেলা আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার পায়। (৩) জেলা আদালতের অধীনে মুনসেফী বা সদর আমিনের আদালত স্থাপিত হয়। এই নিম্ন আদালতে ভারতীয় কমিশনারগণ ছোটখাটো মামলার বিচার করিবার ভার পায়। (৪) কলিকাতা, পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে ৪টি প্রাদেশিক দেওয়ানী আপীল আদালত স্থাপিত হয়। এই আদালতে ৩ জন ইওরোপীয় জজ, কাজী ও ভারতীয় কর্মচারীগণের সাহায্যে জেলা আদালতের রায়ের উপর আপীলের বিচার করিতেন। (৫) প্রাদেশিক আদালতের উপর সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। (৬) ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে জেলা আদালতের রায়ের উপর আপীলের বিচার করিবার জন্য ৪টি ভ্রাম্যমান আপীল আদালত স্থাপিত হয়। ফৌজদারী মামলার আপীল আদালতের রায়ের উপর পুনরায় আপীল করিলে তাহা সদর নিজামত আদালতে বিচার হইত। (৭) সদর নিজামত আদালত ছিল ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত। ইহা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। (৮) কোড কর্ণওয়ালিস নামক বিধির দ্বারা কর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগে শৃংখলা স্থাপন করেন। (৯) তিনি কাজীর দ্বারা দেশীয় আইনের ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন। (১০) তিনি দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করেন। (কর্ণওয়ালিসের রাজস্ব নীতি পৃঃ ৩২ দেখ)।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার

এইভাবে লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার বিখ্যাত শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার স্থাপন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল ব্রিটিশ-ভারতীয় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায়রূপে গণিত হয়। তিনি কোম্পানীর সংকীর্ণ বণিক নীতি বদলাইয়া তাহার স্থলে প্রজাহিতৈষণা নীতি প্রবর্তন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে ইংরাজ শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিলেও লর্ড কর্ণওয়ালিস সেই কার্যকে সুসম্পন্ন করেন। কর্ণওয়ালিসের সংস্কার নীতির প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে তিনি উচ্চপদে ভারতীয়গণের নিয়োগ বন্ধ করেন। ভারতীয় কর্মচারীগণের সততার প্রতি তিনি অমূলক সন্দেহ পোষণ করিতেন। ইহার ফলে শাসন ও শাসিতের ব্যবধান বাড়ে। তিনি ভুলিয়া যান যে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণও দুর্নীতির ঊর্ধে ছিল না। কর্ণওয়ালিসের নীতির

কৃতিত্ব

ফলে উচ্চ বেতন, পদ ও ক্ষমতা পাইয়া শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণের ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যায়। তাহারা ভারতীয়গণকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। কর্ণওয়ালিসের পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে তাহাদের পক্ষে দেশে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন সম্ভব হয় নাই। ফলে চুরি ডাকাতি অবাধে চলিতে থাকে।[১] যাহাই হউক কর্ণওয়ালিস যে কোম্পানীর শাসনকে অনেকটা ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজস্ব নীতি: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

(The Revenue Settlements of Lord Cornwallis: Permanent Settlement): কোম্পানী নিজ হাতে দেওয়ানী লইবার পর ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে পাঁচসালা ও পরে একসালা বন্দোবস্ত করেন। নীলামে জমি ডাকিয়া সর্বোচ্চ নীলামদারকে পাঁচবৎসর ও পরে একবৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। নীলামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে ঘন ঘন জমিদারের বদল হয়। জমিদার বদল হইবার ফলে জমির উন্নতির জন্য চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। জমির কোন নির্দিষ্ট খাজনা না থাকায় জমিদারগণ ইচ্ছামত অতিরিক্ত কর প্রজার নিকট আদায় করিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রজা জমিদারদের দাবী মিটাইতে না পারিয়া জমি ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। কর আদায় বাকী পড়িলে জমিদারগণও কোম্পানীকে দেয় অর্থ দিতে অপারগ হয়। ফলে কোম্পানীর রাজস্বের ঘাটতি পড়ে। এইভাবে জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজস্ব ব্যবস্থায় গোলাযোগ সৃষ্টি করে।

কর্ণওয়ালিসের সমস্যা

বিলাতের পরিচালক সভা লর্ড কর্ণওয়ালিসকে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য নির্দেশ দেন। কর্ণওয়ালিস জমিদারগণের সহিত আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য (১৭৮৯ খ্রীঃ) দশসালা বন্দোবস্ত করেন। যে সকল জমিদার নীলামে জমি ধরিয়াছিল তাহাদের আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য জমিদারী রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। জমিদারগণ কোম্পানীকে পূর্ববর্তী তিন বৎসরের রাজস্বের গড় অনুসারে রাজস্ব আদায় দিবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থার ফলে ভূমি ব্যবস্থায় কিছুটা স্থিতি আসে।

কর্ণওয়ালিসের দশ সালা বন্দোবস্ত

ইহার পর জমির কিভাবে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা যায় তাহা ঠিক করিবার জন্য কর্ণওয়ালিস রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগণের সহিত আলোচনা চালান। (১) রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী স্যার জন শোর এই মত প্রকাশ করেন যে মুঘল আমলে জমিদারগণকে জমির মালিকানা দেওয়ার নিয়ম ছিল। সুতরাং এই প্রথা অনুযায়ী জমিদারগণকেই জমির মালিকানা দিয়া জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত।[২] স্যার জন শোর আরও বলেন যে জমি জরীপ ও জমির বিবরণ প্রভৃতির কাগজ-পত্র কোম্পানীর হাতে না থাকায় আপাততঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুলতুবি রাখিয়া জমিদারগণের সহিত দীর্ঘ-মেয়াদী

শোর-গ্রান্ট-কর্ণওয়ালিস বিতর্ক

---

১. Imperial Gazeteer Vol. IV.

২. An Advanced History of India—Three Doctors. P. 796.

বন্দোবস্ত করা উচিত। পরে জমির তালিকা করিয়া কাগজ-পত্র প্রস্তুত হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। (২) দলিল ও দপ্তর বিভাগের প্রধান জেমস গ্রাণ্ট, স্যার জন শোরের মতের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে মুঘল যুগে জমিদারগণকে জমির মালিকানা দেওয়া হইত না। জমির মালিকানা মুঘল সরকারের হাতেই ছিল। জমির খাজনা আদায়ের দায়িত্বই একমাত্র জমিদারগণকে এই সময়ে দেওয়া হইত। সুতরাং গ্রাণ্ট জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস এই উভয় মতের মধ্যে স্যার জন শোরের মতকেই গ্রহনীয় মনে করেন। কর্ণওয়ালিস নিজে ইংলণ্ডের বড় জমিদার ছিলেন। সুতরাং ভারতেও অনুরূপ বন্দোবস্ত প্রচলন করার আগ্রহ তিনি দেখান। স্যার জন শোরের দ্বিতীয় সুপারিশ যথা, আপাততঃ দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করেন। কর্ণওয়ালিস এই যুক্তি দেখান যে কোম্পানীর হাতে জমির পরিমাণ ও বিবরণ সম্পর্কে যে সকল তথ্য আসিয়াছে তাহা যথেষ্ট। ইহার ভিত্তিতেই কাল-বিলম্ব না করিয়া জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। বিলাতের বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতি ডাণ্ডাস ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট, কর্ণ-ওয়ালিসের অভিমতকেই সমর্থন জানান। (১) ইহার ফলে কর্ণ-ওয়ালিস জমিদারগণের সহিত যে দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করেন। ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। (২) জমিদারগণকে বংশানুক্রমিকভাবে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয়। (৩) ১৭৯৩ খ্রীঃ জমিদারগণ যে হারে ভূমি রাজস্ব আদায় করিত তাহার $\frac{9}{10}$ ভাগ কোম্পানী রাজস্ব হিসাবে আদায় দিতে জমিদারগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। (৪) সূর্যাস্ত আইন অর্থাৎ বাংলা বৎসরের শেষ দিনের মধ্যে কোন জমিদার রাজস্ব জমা না দিলে তাহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার নিয়ম চালু করা হয়। (৫) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রধানতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উদ্ভব হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপনে কর্ণওয়ালিসের সিদ্ধান্ত : বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লর্ড কর্ণওয়ালিস উদ্ভাবন করেন কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক দেখা যায়। অনেক লেখক লর্ড কর্ণওয়ালিসকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভাবক বলিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ খ্রীঃ একটি স্মারকলিপির দ্বারা সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব দেন বলিয়া জানা যায়। বিলাতে ফিরিয়া যাইবার পরও ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূলে ইংলণ্ডের উচ্চ মহলে প্রভাব সৃষ্টি করেন। তবে ফিলিপ ফ্রান্সিসের প্রস্তাবের সহিত কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। তবুও তিনিই সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থার কথা বলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংসও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা ভাবেন বলিয়া জানা যায়।[১] পিটের ভারত শাসন আইনে একটি স্থায়ী ও উপযুক্ত রাজস্ব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গঠনে ফিলিপ ফ্রান্সিসের কৃতিত্ব

১. Cambridge History of India. Vol. V.

ব্যবস্থা গঠনের কথাও বলা হয়। বিলাতের পরিচালক সভাও এই ধরণের বন্দোবস্তের কথা অনেকদিন হইতে ভাবিতেছিলেন। এই কারণে ডাঃ এন. কে. সিংহ মন্তব্য করিয়াছেন যে "কর্ণওয়ালিসকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একমাত্র উদ্ভাবক মনে করা যায় না"।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা যায়। মার্শম্যান ইহাকে "একটি সাহসিকতাময় ও বিজ্ঞ ব্যবস্থা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[২] পঞ্চম প্রতিবেদন বা ফিফথ রিপোর্টেও (Fifth Report) ইহাকে সাফল্যজনক ব্যবস্থা বলা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে বলা হয় যে ইহার ফলে কোম্পানী প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায় পাইতে থাকে। দেওয়ানী লইবার পর কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ে যে বিশৃংখলা ও দুর্নীতির পাঁক জমে এই ব্যবস্থায় তাহা সরাইয়া ফেলা সম্ভব হয়। জমিদারগণ জমিতে স্থায়ী অধিকার পাইয়া সরকারকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় দেয় ও জমির উন্নতির দিকে নজর দেয়। একসালা বন্দোবস্তের ফলে প্রতি বৎসর জমির নীলাম হইত। ইহার ফলে জমি কাহার হাতে থাকিবে তাহার ঠিক ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হইলে জমিদারগণ ঘন ঘন খাজনার হার পরিবর্তন ও জমির হাত বদল হইতে রক্ষা পায়। রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থিতি দেখা দেয়। কোম্পানীর অনুগত জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি বহু নিন্দিত ব্যবস্থা হিসাবে গণিত হয়। হোমস ইহাকে "একটি দুঃখজনক ভুল" বলিয়া অভিহিত করেন।[৩] থর্ণটন মন্তব্য করেন যে "অসাধারণ অজ্ঞতাবশতঃ কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।"[৪] সরকার কর্তৃক জমি জরিপ ও জমির বিবরণ যোগাড় না করিয়া জমিদারগণকে চিরস্থায়ী স্বত্ব দিয়া কর্ণওয়ালিস মহাভুল করেন। জমিদারগণের হাতে কি পরিমাণ জমি থাকিবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দানের সময় তাহা স্থির করা হয় নাই। হাণ্টারের মতে ইহার ফলে ভবিষ্যতে বহু গোলমাল ও মামলা-মোকর্দমা বাধে।[৫] কোন কোন জমিদার প্রভূত পরিমাণ জমি লাভ করিয়া জমির উন্নতি ও প্রজার মঙ্গলের দিকে নজর দিতে ভুলিয়া যায়। বাকী লোকেরা জমির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় ঠিক হয় যে সরকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমিদারগণের নিকট হইতে আদায় করিবেন। সরকার ইচ্ছা করিলেও এই রাজস্বের হার বাড়াইতে পারিতেন না। এদিকে জমিদারগণ কৃষক বা রায়তের নিকট হইতে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিবে তাহা স্থির করা হয় নাই। ফলে জমিদারগণ প্রজার নিকট

---

১. "He (Cornwaliis) may be regarded as the author of the Permanent Settlement in a limited sense." N. K. Sinha—Economic History of Bengal. Vol. II.

২. "It was a bold, brave and wise measure"—Marshman.

৩. "Permanent settlement was a sad blunder"—Holmes.

৪. "The Permanent settlement was concluded under the influence of an extra ordinary degree of ignorance".

৫. Hunter—Annals of Rural Bengal.

বহুগুণ বেশী রাজস্ব আদায় করিতে থাকে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদাররা সরকারকে পুরাতন হারে রাজস্ব আদায় দেয়। জমিদারগণ বাড়তি টাকা আদায় করিলেও, সরকার এই বাড়তি রাজস্বের কোন ভাগ পাইত না। ফলে জমিদারগণের আয় বাড়িতে থাকে, কিন্তু সরকারের হাত বাঁধা থাকে; এদিকে রায়ত বা কৃষকগণ শোষিত হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বড় জমিদারগণ ছোট জমিদার ও জোতদারগণকে চিরস্থায়ী স্বত্বে জমি বন্দোবস্ত দেয়। ফলে রায়ত ও সরকারের মধ্যে বহু মধ্যস্বত্ব ভোগীর সৃষ্টি হয়। এই সকল মধ্যস্বত্ব ভোগী জোতদারগণ কিছু কাজ না করিয়া জমির আয়ে বসিয়া খাইতে থাকে এবং কৃষকের উপর রাজস্বের চাপ বাড়াইয়া দেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর প্রধান ত্রুটি ছিল জমিদারগণকে জমির স্থায়ী মালিকানা দান করা। মুঘল আমলে জমিদারগণের হাতে জমির মালিকানা ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিকানা পাইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাহারা ইচ্ছামত চাষী বা রায়তের খাজনা বাড়াইয়া দেয়। চিরস্থায়ী প্রথায় জমিদারগণকে জমির মালিকানা দিলেও রায়ত বা চাষীকে জমিতে কোন স্বত্ব দেওয়া হয় নাই। ফলে জমিদারগণ ইচ্ছামত রায়তকে জমি হইতে উচ্ছেদ করে। দরিদ্র রায়তকে জমিদারদের গোমস্তা, নায়েবগণের জুলুম হইতে রক্ষার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় রায়তগণের দুর্দশার একশেষ হয়। কর্ণওয়ালিস ভাবিয়াছিলেন যে জমিদারগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া রায়তগণকে পাট্টা বা স্বত্বের দলিল দিবে। কার্যক্ষেত্রে তাঁহার আশা ব্যর্থ হয়। পরে সরকারকে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করাইয়া রায়তগণকে উচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়।

রায়তের দুরবস্থা

কর্ণওয়ালিস আশা করেন যে জমিদারগণ জমিতে স্থায়ী স্বত্ব পাইয়া জমির আয়ের অংশ কৃষি ও প্রজার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবে। কিন্তু অধিকাংশ জমিদার তাঁহাদের এই অর্থ বিলাসব্যসনে ব্যয় করেন। বহু জমিদার গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বা শহরে বাস আরম্ভ করেন। ফলে গ্রামের মঙ্গলের দিক হইতে তাহাদের নজর সরিয়া যায়। এদিকে জমিদারীর নায়েবগণ মামলা-মোকদ্দমা দ্বারা প্রজাগণকে নাজেহাল করে ও বাড়তি অর্থ আদায় করে। হাণ্টারের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২০ বৎসরের মধ্যে বাংলার গ্রামগুলির দারিদ্র বাড়িয়া যায়। কোন কোন জমিদার যথাসময়ে সরকারকে কর আদায় দিতে না পারায় সূর্যাস্ত আইনের বলে উচ্ছেদ হইয়া যায়।

জমিদারগণের অযোগ্যতা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া দেয়। যতদিন জমিতে স্থায়ী স্বত্ব ছিল না ততদিন বহুলোক জীবিকা নির্বাহের জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিত। শিল্প ও বাণিজ্যে সফলতা পাইবার জন্য লোকে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করিত। কিন্তু জমিতে স্থায়ী অধিকার চালু হইবার পর সকলেই জমি পাইবার চেষ্টা করে। বহু ব্যবসায়ী ব্যবসায় ছাড়িয়া তাহাদের মূলধন জমিতে লগ্নী করে। ইহার ফলে জমির উপর চাপ বাড়ে। লোকে হাতের কাজ ও কুটির শিল্প ছাড়িয়া কৃষির

বাংলার অর্থনীতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। কামার, কুমোর প্রভৃতি লোক নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়িয়া চাষের কাজে লাগিয়া যায়। ফলে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। লোকে বিলাতী মালের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এদিকে সকল লোক কৃষিকেই একমাত্র জীবিকা হিসাবে লইলে জমির অভাব দেখা দেয়। বংশানুক্রমিকভাবে জমিগুলি বণ্টনের ফলে জমি টুকরা টুকরা হইয়া যায়। ফলে জমির আয় কমিয়া যায়। অন্য কোন কাজ করিতে না শিখায় কৃষকেরা হত দরিদ্র হইয়া পড়ে। গ্রাম জীবনে দারিদ্রের করাল ছায়া নামে। ফ্লাউড রিপোর্টে এই সকল ত্রুটি দেখাইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের সুপারিশ করা হয়। স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৫৩ খ্রীঃ জমিদারী উচ্ছেদ আইন দ্বারা ও মধ্যস্বত্ব উঠাইয়া দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করিয়াছেন।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসন সংস্কার (Aministrative reforms of Lord William Bentinck)ঃ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক ভারতে বড়লাট নিযুক্ত হইবার পর বিলাতের হুইগ দলের উদারপন্থী নীতি ভারতে বাস্তবায়িত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি মনে করিতেন যে কোন সরকার ক্ষমতা ভোগ করিবার সহিত প্রজার প্রতি কর্তব্য করিতে বাধ্য। কোম্পানী যেহেতু ভারতে ক্ষমতা পাইয়াছে সেহেতু ভারতীয় প্রজাগণের উন্নতির জন্য কোম্পানীর নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে।

বেন্টিঙ্কের নীতি

জেরেমি বেন্হামের হিতবাদী আদর্শ (Utilitarian philosophy) বেণ্টিঙ্কের শাসন নীতিকে প্রভাবিত করে। এই কারণে শাসন সংস্কারের সহিত তিনি সামাজিক ও শিক্ষা বিভাগীয় সংস্কার করেন। (সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের বিবরণ তৃতীয় অধ্যায় ৫৩ পৃঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬৯ দেখ)। লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকই উল্লেখযোগ্য শাসন সংস্কারের কাজ করেন।



লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

বেণ্টিংক কোম্পানীর ব্যয় সংক্ষেপ ও সুশাসন উভয় সমস্যার সামঞ্জস্য বিধান করেন। (১) তিনি কর্ণওয়ালিসের প্রবর্তিত প্রাদেশিক আপীল আদালত ও ভ্রাম্যমান ফৌজদারী আপীল আদালত উঠাইয়া দেন। সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামতী আদালতে আপীলের মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়। (২) জেলা জজগণকে দেওয়ানী মামলার সহিত ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা জজগণের নাম পাল্টাইয়া সেসন জজ রাখা হয়।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার

(৩) জেলার কালেক্টরগণকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। (৪) কয়েকটি জেলা লইয়া একটি করিয়া বিভাগ (Division) গঠন করা হয়। প্রতি বিভাগে একজন করিরা

বিভাগীয় কমিশনার নিয়োগ করিয়া জেলা কালেক্টরগণের কাজের তদারকি করার ব্যবস্থা করা হয়। (৫) কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত গ্রাম্য আমিনী আদালত বা সালিশী আদালতকে নিয়মিত আদালতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলের বিচারের দায়িত্ব আমিনী আদালত প্রধানতঃ বহন করে।

বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন পাশ হইলে ভারতীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। লর্ড মেকলে বড়লাটের আইন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি একটি আইন কমিশনের সাহায্যে ভারতীয় আইনের সংকলনের কাজে হাত দেন। অতঃপর সরকারী আইনগুলি রেগুলেশন নামে পরিচিত না হইয়া এ্যাক্ট বা বিধি নামে পরিচিত হয়। মেকলের নেতৃত্বে আইন কমিশন ভারতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন সঙ্কলন করে। এই আইনগুলি ভারতে চালু হয়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের আমলে এই ব্যবস্থার সূচনা দেখা দেয়।

আইনের সংস্কার

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক উচ্চ আদালতে ফার্সী ভাষার স্থলে ইংরাজী ভাষায় কাগজপত্র লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি নিম্ন আদালতে ফার্সীর স্থলে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ইহার ফলে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। তিনি কাজের সুবিধার জন্য এলাহাবাদে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করেন। উত্তর প্রদেশের উপর এই আদালতের এক্তিয়ার স্থাপিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে সরকারী পদে ভারতীয় নিয়োগের কথা বলা হয়। ইহার ফলে বেণ্টিঙ্ক উচ্চপদে বিশেষতঃ বিচার বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ চালু করেন। তিনি ভারতীয় বিচারপতিগণের ক্ষমতাও বাড়াইয়া দেন। ইহার ফলে কর্ণওয়ালিসের বৈষম্য-মূলক নীতির কিছু পরিমাণ অবসান হয়। বেণ্টিঙ্কের আশা ছিল যে তিনি প্রাচ্য দেশীয় স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঞ্চার করিবেন।[১] তাঁহার এই আশা ফলবতী হয় নাই। তিনি তাঁহার শাসন সংস্কার দ্বারা ভারতীয়গণকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দানে বিফল হন।

অন্যান্য সংস্কার

লর্ড ডালহৌসীর শাসন সংস্কার (Reforms of Lord Dalhousie)ঃ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক পাশ্চাত্য প্রথায় শাসন ব্যবস্থা সংগঠনের যে পথ প্রদর্শন করেন লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রীঃ শাসনভার গ্রহণ করিয়া সেই নীতিকে তীব্রতর করেন। ডালহৌসী একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন, অপরদিকে তিনি মনে করিতেন যে ভারতীয় শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য ও আধুনিক ছাঁদে না গঠন করিলে কোন ফল হইবে না। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের মতে ডালহৌসীর "সাম্রাজ্যবাদের সহিত শাসন সংগঠনের একটি নৈতিক দায়িত্ববোধের উদয় হয়।"[২] বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি সংস্কারকগণ সামাজিক সংস্কার প্রবর্তনের সময়ে দ্বিধা ও সংশয় প্রকাশ করিতেন। কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে

ডালহৌসীর নীতি

১. "To infuse in oriental despotism the spirit of British freedom."

২. "The conseiousness of conquest competed with the sense of moral mission."

ভারতীয়গণ এই সংস্কারকে পছন্দ নাও করিতে পারে। ডালহৌসী ভারতীয়গণের পছন্দ বা অপছন্দের ধার ধারিতেন না। তিনি সাম্রাজ্যবাদী গর্বে গর্বিত হইয়া আত্মবিশ্বাস ও দর্প লইয়া তাঁহার সংস্কারগুলি চালু করেন। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ভারতীয়গণের অপকৃষ্ট ভারতীয় ব্যবস্থার স্থলে উন্নত ইওরোপীয় ব্যবস্থা স্থাপনের অধিকার তাঁহার আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন।



লর্ড ডালহৌসী

ডালহৌসী নববিজিত প্রদেশ পাঞ্জাবের শাসন সংগঠন ও উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি পাঞ্জাবের শাসন সংস্কারের জন্য হেনরী লরেন্সের নেতৃত্বে একটি বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ডের সাহায্যে তিনি পাঞ্জাবের রাজস্ব সংস্কার করেন। তিনি পাঞ্জাবে বিচার বিভাগীয় সংস্কার চালু করিয়া কোম্পানীর সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে লর্ড ডালহৌসীকে "আধুনিক পাঞ্জাবের জনক" (Father of British Punjab) বলা হয়। জন লরেন্সের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের শাসন ব্যবস্থা এরূপ খ্যাতিলাভ করে যে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ পাঞ্জাবে গিয়া হাতে-কলমে কাজ শিখিতে উৎসাহ দেখান।

পাঞ্জাবে শাসন সংস্কার

ডালহৌসী পাঞ্জাবে যে শাসন নীতি প্রবর্তন করেন তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সরকার সরাসরি কৃষক বা রায়তের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। সরকারী কর্মচারীগণ সাধারণ লোকের সহিত সংযোগ রাখিয়া চলিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে জনসাধারণের সহিত সরকারের যোগাযোগ বাড়ে। পাঞ্জাব দ্রুত আধুনিকতার পথে ধাবিত হয় এবং অচিরকালের মধ্যে ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী প্রদেশে পরিণত হয়।

সরকার ও রায়ত সংযোগ স্থাপন

পাঞ্জাবের উন্নতিকল্পে ডালহৌসী কৃষি, রাজস্ব সংস্কার করেন। লাহোর হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়। আভ্যন্তরীণ শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। সিন্ধু ও অন্যান্য নদী হইতে খাল খনন করিয়া পাঞ্জাবের উর্বরা জমিকে শস্য-শ্যামলা করার ব্যবস্থা হয়।

রাজস্ব সংস্কার

ডালহৌসী বাংলার সুশাসনের জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর নিয়োগ করেন। তিনি কলিকাতায় সরকারের সদর দপ্তর বা সেক্রেটারিয়েটকে সংগঠন করেন। ডালহৌসী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিগণকে যোগদানের অধিকার দেন। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের মতে সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী ভারতীয়গণকে স্বায়ত্ব শাসন দান না করিলেও ভবিষ্যতে ভারতীয়গণের স্বায়ত্ব শাসনের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেন নাই।[১]

আইন সংস্কার

১. "Even self-government was not beyond his vision."

ডালহৌসী বহু জনহিতকর কাজ করেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী অখ্যাতির তলায় তাঁহার জনহিতকর কার্যাবলী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। (১) তিনি পাবলিক ওয়ার্কস (P. W. D.) বিভাগ গঠন করিয়া ইহার হাতে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের দায়িত্ব দেন। (২) তিনি গঙ্গা ক্যানেলের কাজ আরম্ভ করেন। (৩) কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড-ট্রাংক রোড নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। (৪) ডালহৌসী ছিলেন ভারতীয় রেলপথের জনক। তিনিই প্রথম ভারতে ২০০ মাইল রেলপথ নির্মাণ করেন। রেলপথ ছিল ভারতের আধুনিকতা ও যোগাযোগের প্রধান সোপান। (৫) ১৮৫৪ খ্রীঃ ডালহৌসী বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু করেন। (৬) তিনি বিলাতের ন্যায় পেনী পোষ্টকার্ড বা দুই পয়সার খাম চালু করেন। (৭) তিনি ভারতীয় বন্দরগুলির উন্নতি সাধন করেন। (৮) ডালহৌসী ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এ স্থাপন করেন এবং তিনি স্কুলগুলিকে নিয়মিত সরকারী সাহায্য দেওয়ার নিয়ম চালু করেন। শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে ভারত সচিব স্যার চার্লস উডের ডেসপ্যাচের অনেকগুলি সুপারিশকে তিনি কার্যে পরিণত করেন।

জনহিতকর কাজ

এইভাবে ডালহৌসী তাঁহার প্রগতিশীল সংস্কারগুলি চালু করেন। তিনি দৃঢ়হাতে ভারতে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য প্রথা চালাইবার চেষ্টা করেন। বেণ্টিংক ভারতের আধুনিকীকরণের সূত্রপাত করিলেও তিনি বেশী দূর আগাইতে পারেন নাই। ডালহৌসী আধুনিকতার চওড়া রাস্তা নির্মাণ করেন। ডালহৌসী যে কাজ আরম্ভ করেন লর্ড কার্জন তাহাকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। লর্ড ডালহৌসী ছিলেন বহুমুখী সংস্কারক। তবে জনগণের পছন্দ অপছন্দের দিকে লক্ষ্য না করিয়া উপর হইতে সংস্কার চাপাইয়া দেওয়ার ফলে তিনি জনপ্রিয়তা হারান। বেন্টিংক যেক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিতেন, ডালহৌসী সেক্ষেত্রে ঔদ্ধত্য ও আত্মবিশ্বাস দেখাইতেন। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার লর্ড ডালহৌসীকে "ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রধান প্রচারক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১]

সমালোচনা

শাসন সংস্কারে জেলা শাসনের গুরুত্ব (District administration as pivot)ঃ কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ ছিল জেলার শাসন ব্যবস্থা। যদিও প্রতি জেলার শাসন প্রতি প্রদেশে ঠিক এক ধরণের ছিল না, তবুও সর্বত্র জেলা শাসনের ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হইত।

কোম্পানীর আমলে প্রতি জেলার শাসনের দায়িত্ব কালেক্টর নামক কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। নব গঠিত প্রদেশগুলিতে ইহাদের কালেক্টর না বলিয়া ডেপুটি কমিশনার বলা হইত। কালেক্টরগণের দুই প্রকার দায়িত্ব ছিল। কালেক্টর হিসাবে তাহাদের জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইত; অপরদিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ফৌজদারী মামলার বিচার ও বিচারের তদারকির দায়িত্ব বহন করিতে হইত। জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের হাতে। ফলে জেলা

১. "Apostle of Modern India." Smith—Oxford History of India.

কালেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেটগণের কর্মক্ষমতার উপর জেলার উন্নতি নির্ভর করিত। পুলিশ, জেল, রাজস্ব, মিউনিসিপ্যালিটি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের দায়িত্ব জেলা কালেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেটকে বহন করিতে হইত। হাণ্টারের মতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে একাধারে আইন, প্রশাসন, অর্থনীতি, সরকারী নথি রচনা, পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করা ও জেলার জনসাধারণের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইত। খুব পাকা ও ঝানু কর্মচারী ছাড়া জেলার কালেক্টরের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করা সম্ভব ছিল না।[১] সরকারের নীতিগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার সকল দায়-দায়িত্ব ছিল জেলা শাসকের। ডাঃ স্মিথের মতে কোড কর্ণওয়ালিস ও পরবর্তী কর্ম বিধি অনুযায়ী জেলা শাসকগণ শাসন কার্য চালাইতেন। জেলার কর্মচারীগণের কার্যবিধি হিসাবে রেগুলেশন বা নিয়মাবলী রচিত হয়। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের জেলাগুলি রেগুলেশন অনুযায়ী শাসিত হইত। নব অধিকৃত জেলাগুলিতে সব সময় রেগুলেশন অনুযায়ী চলা সম্ভব ছিল না। এজন্য এইগুলির নাম হয় "অনিয়মিত প্রদেশ" (Non regulation Province)।

কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

গভর্ণর ম্যাকফারসন বাংলায় ৩৫টি জেলা গঠন করিলেও, কর্ণওয়ালিস তাহা কমাইয়া ২৩টি জেলায় পরিণত করেন। পরে ইহা বাড়াইয়া ২৮টি জেলায় পরিণত হয়।[২] মাদ্রাজে ২০—২৬টি জেলা এবং বোম্বাইয়ে ১৩টি জেলা ছিল।

জেলার কালেক্টরগণকে সাহায্য করিবার জন্য সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ লর্ড হেস্টিংসের আমল হইতে জেলা পুলিশ পরিচালনার দায়িত্ব পান। ১৮৩৩ খ্রীঃ ডেপুটি কালেক্টর পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহারা জেলা কালেক্টরকে সহায়তা করিত। ১৮৪৩ খ্রীঃ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ সৃষ্টি করা হয়। এই সকল কর্মচারীগণ কালেক্টরের নির্দেশে বিভিন্ন প্রকার কার্য নির্বাহ করিত।

সহকারী জেলা কর্মচারী

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের পরবর্তীকালে মহকুমাগুলিতে মহকুমা অফিসার (S. D. O.) নামে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মহকুমা অফিসারকে মহকুমার শাসনকার্যে সহায়তা করিতেন।[৩] সুতরাং দেখা যায় যে কোম্পানীর শাসনের আমলে জেলার শাসনকার্য জেলা কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ সহকারী অফিসারগণের সহযোগিতা লইয়া পরিচালনা করিতেন। মহকুমা অফিসারগণ মহকুমার শাসন পরিচালনা করিতেন। প্রতি জেলাকে ১৫টি হইতে ২০টি থানায় ভাগ করা হইত। প্রতি থানায় শান্তি রক্ষার জন্য দারোগা নিযুক্ত করা হয়। দারোগাকে শান্তি রক্ষায় সাহায্য করিবার জন্য ২০-৫০ জন সিপাহী থাকিত। গ্রামগুলিতে নিরাপত্তার জন্য চৌকীদার নিয়োগ করা হয়। গ্রামের বিচারকার্য সাধারণতঃ পঞ্চায়েতগণ করিত।

মহকুমা ও থানা

———

১. Hunter—The Indian Empire. P. 113.
২. Cambridge History of India. Vol. VI.
৩. Cambridge History of India. Vol. VI.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিভিল সার্ভিস : ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ

(Civil Service : Fort William & Haileybury College)

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কাজ চালাইবার জন্য এপ্রেণ্টিস (Apprentice), রাইটার্স (Writers), ফ্যাক্টর (Factor) প্রভৃতি নামের কর্মচারী নিযুক্ত হইত। কোম্পানী ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর শাসন ও বাণিজ্য এই উভয় বিভাগের কাজ চালাইবার জন্য দক্ষ প্রশাসক ও কর্মচারীর দরকার হয়। সৎ কর্মচারী ব্যতীত গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। দ্বৈত শাসনের যুগে কোম্পানীর কর্মচারীগণ এরূপ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে তাহাদের দ্বারা ন্যায়বিচারমূলক শাসন ব্যবস্থা গঠন করা কঠিন হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়, উপঢৌকন গ্রহণ, উৎকোচ প্রথা, বেনামীতে জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ প্রভৃতি নানাবিধ দুর্নীতির জালে কোম্পানীর কর্মচারীগণ আটকাইয়া পড়ে। অসাধু কর্মচারীগণ অসাধু উপায়ে প্রচুর অর্থলাভ করিয়া বিলাতে ফিরিয়া গিয়া "ভারতীয় নবাবের" (Indian Nabobs) ন্যায় আড়ম্বরসহ বাস করিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর হাতে বাণিজ্য, রাজস্ব ও শাসনের দায়িত্ব থাকায় একই কর্মচারীকে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিতে হইত। ফলে তাহার পক্ষে বিশেষ বিভাগে দক্ষতা লাভ (specialisation) করা সম্ভব হইত না। তৃতীয়তঃ, ভারতে উচ্চ কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব বিলাতের পরিচালক সভা বা কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসের হাতে থাকায়, পরিচালক সভা কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অনেক সময় স্বজন পোষণ ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিত। ইহার ফলে নির্দোষ ও ন্যায্য শাসন ব্যবস্থা গঠন করা শক্ত হয়।

কোম্পানীর কর্মচারীগণের দুর্নীতি

মুঘল যুগ হইতে সরকারী কাজ ফার্সী ভাষায় চলিতেছিল। এই কারণে ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম বলেন যে ইংরাজ কর্মচারীগণের ফার্সী ভাষা শিক্ষা করা দরকার। লর্ড কর্ণওয়ালিস বড়লাট নিযুক্ত হইবার পর কোম্পানীর অধীনে কর্মচারী নিয়োগের দিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি একটি পরিচ্ছন্ন, কর্মপরায়ণ ও সৎ প্রশাসক গোষ্ঠী গঠনের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখান। বিলাতের পরিচালক সভা কোম্পানীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থীকে না লইয়া তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগের জন্য চাপ দিলে কর্ণওয়ালিস ইহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানান। এমনকি তিনি এজন্য পদত্যাগের হুমকি দেন। দ্বিতীয়তঃ, কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর বাণিজ্য দপ্তরকে রাজস্ব দপ্তর হইতে আলাদা করায় শাসনকার্যের প্রভূত উন্নতি হয়। রাজস্ব দপ্তরের কর্মচারীগণকে শাসন ও অন্যান্য বিশেষ দায়িত্ব পালনের কাজে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া কর্ণওয়ালিস কর্মচারীগণকে স্থানীয় ভাষা শিক্ষার জন্য উৎসাহ দেন। স্যার জন শোর, জেমস গ্রাণ্ট, স্যার জোনাথান ডানকান প্রভৃতি দক্ষ সহযোগীর সাহায্যে কর্ণওয়ালিস শাসন বিভাগের কর্মচারীগণের দক্ষতা বাড়াইবার চেষ্টা করেন।

কর্ণওয়ালিসের সংস্কার

কর্মচারীগণ যাহাতে দুর্নীতির পথে পা না দেয় এজন্য তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসা, উপঢৌকন গ্রহণ প্রভৃতি কড়াভাবে নিষিদ্ধ করেন। দোষী কর্মচারীকে শাস্তি দেওয়া হয়। কর্মচারীগণ যাহাতে স্বাচ্ছল্যের সহিত থাকিতে পারে এজন্য তিনি তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি করেন। এইভাবে কর্ণওয়ালিস সর্বপ্রথম একটি সিভিল সার্ভিস বা 'জন পালন কৃত্যক' গঠন করিবার চেষ্টা করেন।

লর্ড ওয়েলেসলি বড়লাট নিযুক্ত হইবার পর উপলব্ধি করেন যে বিলাত হইতে যে সকল কর্মচারী ভারতে নিযুক্ত হয় তাহারা ভারতীয় আইন, ভাষা, সাহিত্য ও ভাবধারার সহিত পরিচিত না হওয়ায় শাসক ও শাসিতের ব্যবধান বাড়ে, সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার বিঘ্ন হয়। এই বাধা দূর করিবার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন।[১] ওয়েলেসলি নিয়ম করেন যে কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ এই কলেজে হিন্দু ধর্মের মূলনীতি, হিন্দু ও মুসলিম আইন, ভারতীয় ভাষা, অর্থনীতি ও ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি শিখিবে। ইংরাজ কর্মচারীগণকে তিন বৎসর কাল এই কলেজে পড়িয়া পাশ করিতে হইবে। প্রতি বৎসর দুইটি পরীক্ষা নেওয়া হইবে। ক্যাডেট বা চাকুরি প্রার্থী ছাত্রগণকে কঠোর নিয়ম-শৃংখলা পালন করিতে হইবে। এই কলেজে কোম্পানীর যুবক কর্মচারীরা শিক্ষা সমাপন করিলে তাহাদের কোম্পানীর চাকুরিতে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই কলেজের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার সর্বপ্রথম আধুনিক বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তন করেন। ওয়েলেসলি ভারত ত্যাগ করিবার পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পতন আরম্ভ হয়। বিলাতের কর্তৃপক্ষ এই কলেজের প্রতি আগ্রহের অভাব দেখান। কলেজের ছাত্রগণের শৃংখলাবোধ নষ্ট হইয়া যায়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারেও গাফিলতী বাড়ে। ছাত্রগণ পড়াশোনা ছাড়িয়া আমোদ আহলাদে সময় কাটায় এবং বিলাস ব্যসনে বেহিসাবী খরচ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৪ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরিবর্তে বিলাতে হেইলেবেরী কলেজ স্থাপিত হয়। যাহা হউক ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষের চোখ খুলিয়া দেন। তিনি ইহা প্রমাণ করেন যে জনকল্যাণমূলক শাসন প্রবর্তন করিতে হইলে শাসক কর্মচারীগণের অবশ্যই স্থানীয় ভাষা ও জনগণের সহিত সংযোগ শিক্ষাও দরকার।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ ভারতে কোম্পানীর কাজে যোগদানের আগে যাহাতে ভারতীয় ভাব, ভাষা ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হয় এজন্য তাহাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮০৫ বা ১৮০৬ খ্রীঃ বিলাতে হেইলেবেরী কলেজ (Haileybury college) স্থাপন করা হয়। এই কলেজের আসল নাম ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ। হেইলেবেরী নামক স্থানে ইহা স্থাপন করা হয় বলিয়া ইহাকে হেইলেবেরী কলেজ বলা হয়। কোম্পানীর নিযুক্ত ইংরাজ কর্মচারীগণ ভারতে আসিবার আগে এই কলেজে দুই বৎসরের জন্য তাহাদের শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করা হয়।

হেইলেবেরী কলেজ

১. মতান্তরে ১৮০১ খ্রীঃ।

হেইলেবেরী কলেজে ভর্তি হইবার জন্য প্রার্থীকে কোম্পানীর পরিচালক সভা মনোনয়ন করিত। এই সভার মনোনয়ন লাভ একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল। প্রথমে ১৫ বৎসর বয়স্ক ছাত্রকে এই কলেজে ভর্তি করা হইত। পরে বয়স সীমা বাড়াইয়া ২১ বৎসর করা হয়। ফার্সী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, ইওরোপের ইতিহাস, আইন, অংক প্রভৃতি এই কলেজে পড়ান হইত। খ্রীষ্টধর্ম ও নীতি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। বোর্ড অফ কণ্ট্রোল ও কোর্ট অফ ডাইরেক্টর এই কলেজ পরিচালনা করিত। ১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে বলা হয় যে হেইলেবেরী কলেজ হইতে পাশ না করিলে কোন ব্যক্তির কোম্পানীর উচ্চ পদে চাকুরী করা যাইবে না। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীঃ এই ব্যবস্থা পাল্টাইয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীঃ নূতন আইনে বলা হয় যে বিলাতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করা ছাত্রগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করিলে চাকুরীর জন্য নির্বাচিত হইবে। বিলাতের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল ফল করে। ফলে হেইলেবেরী কলেজের আকর্ষণ কমিয়া যায়। ১৮৫৮ খ্রীঃ কোম্পানীর শাসন লুপ্ত হইলে এই কলেজের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

ডাঃ স্মিথের মন্তব্য

ডাঃ স্মিথ হেইলেবেরী কলেজের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উচ্চবংশজাত যুবকগণ এই কলেজে শিক্ষা পাইত। প্রায়ই বিশেষ বিশেষ বংশের যুবকগণ এই কলেজের ছাত্র হিসাবে কোম্পানীর দ্বারা নির্বাচিত হইত। ইহার ফলে প্রায় বংশানুক্রমে ভারতীয় চাকুরী পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। যোগ্যতার পরিবর্তে বংশ মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি চাকুরী লাভের মাপ-কাঠি হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৩৩ খ্রীঃ হইতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার চলন হইলে এই অব্যবস্থার অবসান হয়। তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার যোগদানের সুযোগ হইতে ভারতীয়গণ বঞ্চিত হওয়ায় এই প্রথা কেবলমাত্র ইংরাজ ছাত্রগণের একচেটিয়া সুযোগের পথ খুলিয়া দেয়।

চার্টার আইন, ১৮১৩ কভেন্যাণ্টেড সার্ভিস বা চুক্তি বন্ধ কর্মসংস্থান প্রথা

১৭৯৩ খ্রীঃ চার্টার আইন পাশ হইলে কোম্পানীর অধীনে একটি 'কভেন্যাণ্টেড সার্ভিস' বা চুক্তিবদ্ধ কৃত্যক গড়িয়া উঠে। চার্টার আইনে বলা হয় যে কোম্পানীর শাসন ও জনকল্যাণ বিভাগে যে সকল পদ খালি হইবে তাহাতে কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীগণকে নিয়োগ করিতে হইবে। কার্যক্ষেত্রে ৫০০ পাউণ্ড ও তদূর্ধ্ব মাহিনার সকল পদই কোম্পানীর সহিত চুক্তি-বদ্ধ কর্মচারীগণের দ্বারা ভর্তি করা হয়। এই আইনের বলে কোম্পানীর জনকল্যাণ কৃত্যক বা পাবলিক সার্ভিস দপ্তর বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠে। তবে এই পদগুলিতে ভারতীয় নিয়োগ করার ব্যবস্থা না থাকায় কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গগণই এই উচ্চ পদগুলি লাভ করে। ডাঃ স্মিথের মতে কোম্পানীর কর্মচারীগণ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই সকল কর্মচারীর দ্বারা সৎ ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগের দুর্নীতির কলঙ্ক কাটিয়া যায়। পরিশ্রমী, আদর্শবান প্রশাসক গোষ্ঠী কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করে। মেটকাফ, এলফিনষ্টোন,

লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় প্রশাসক কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে উঁচু পর্দায় বাঁধিয়া দেন।

১৮৫৩ খ্রীঃ বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড প্রস্তাব দেন যে বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী নির্বাচন করা হোক। লর্ড মেকলেও এই মতকে জোর সমর্থন জানান। মেকলে বলেন যে গভর্ণর জেনারেল অপেক্ষা জনসংযোগ কৃত্যকের চরিত্র গঠন বিশেষ দরকার। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনই হইল একমাত্র উপযুক্ত পন্থা। মনোনয়নের দ্বারা কোম্পানী কর্মচারী নিয়োগ করিলে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তি মনোনীত হইবে বলিয়া মেকলে সতর্ক করিয়া দেন। কোম্পানীর পরিচালক সভার মনোনয়ন বন্ধ করার জন্য তিনি জোর সুপারিশ করেন। মেকলের সুপারিশ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে অতঃপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। এই পরীক্ষায় ইংলণ্ডরাজের যে কোন প্রজা বসিতে পারিবে। প্রার্থীর বয়স ১৮-২৩ বৎসরের মধ্যে হইবে। মেকলের সভাপতিত্বে একটি কমিটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নিয়মাবলী স্থির করে। ১৮৫৫ খ্রীঃ হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। অক্সফোর্ড ও কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে এই পরীক্ষার বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইংরাজ ছাত্রগণই এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া চাকুরী পায়। ইংরাজ ছাত্রগণ চাকুরী পাইয়া ভারতে ইংরাজীয়ানা চালু করে। ফলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ইংরাজীয়ানা কায়েম হয়। পরে ভারতীয়গণ এই চাকুরীতে যোগদানের দাবী জানায়। ভারতীয়গণ যোগদানের অধিকার পাইয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় এবং সফলতা লাভ করিয়া তাহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে।



লর্ড মেকলে

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীয়গণের নিয়োগ

(Employment of Indians in Company's services)

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীয়গণের নিয়োগ (Employment of Indians upto Bentinck) : কোম্পানী নিজ হাতে দেওয়ানীর ভার লইবার পর কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে (পৃঃ ৪২-৪৪ দেখ)। কোম্পানীর হাতে শাসনভার পড়িলে শাসনযন্ত্র চালাইবার জন্য বহু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এই সকল কর্মচারীগণের মধ্যে ভারতীয়গণের কি স্থান ছিল তাহা বিবেচনা করা দরকার।

ওয়ারেন হেস্টিংসের নীতি

ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার শাসনকালে উচ্চপদে বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগে কিছু কিছু ভারতীয় নিয়োগ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও পিটের ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারতে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে সংগঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু এই আইনগুলিতে কোম্পানী শাসনকার্যে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোন ধারা যোগ করেন নাই।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভারতীয় বিদ্বেষ

লর্ড কর্ণওয়ালিস বড়লাট হইবার পর কোম্পানীর উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কর্ণওয়ালিসের ভারতীয়গণের সততা ও দক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ছিল না।[১] সম্ভবতঃ তিনি কিছুটা শেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৭৯৩ খ্রীঃ চার্টার আইন পাশ হইলে লর্ড কর্ণওয়ালিসের হাত আরও শক্ত হয়। এই আইনে বলা হয় যে ভারতে কোম্পানীর বছরে ৫০০ পাউণ্ড ও তদূর্ধ মাহিনার পদগুলি খালি হইলে কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীগণকে (Covenanted service) নিয়োগ করিতে হইবে। ফলে হেইলেবেরী কলেজের তামিল পাওয়া শ্বেতাঙ্গ যুবকগণ কালেক্টর প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত হয়। উচ্চ পদগুলি শ্বেতাঙ্গগণের একচেটিয়া হইয়া যায়। ভারতীয়গণের যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন তাহারা এই সকল পদ লাভে বঞ্চিত হয়। কেবলমাত্র বিচার বিভাগে মুন্সেফ ও রাজস্ব বিভাগে সদর আমিনের পদ লইয়া তাহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সামরিক বিভাগে সুবেদার বা হাবিলদার পদের ঊর্ধতন কোন উচ্চ পদের জন্য ভারতীয়দের অযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়।

কর্ণওয়ালিসের ভারতীয় বিদ্বেষের ফল ছিল ইংরাজ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকারক। ভারতীয়গণ কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ না পাইয়া উৎসাহহীন ও ইংরাজ শাসন সম্পর্কে

১. Keith—Constitutional History of India.

নিস্পৃহ হইয়া পড়ে। মাদ্রাজের বিখ্যাত গভর্ণর স্যার টমাস মনরোর মতে ভারতীয়গণের প্রতি এই বৈষম্য নীতি গ্রহণ করায় ইংরাজ ও ভারতীয়গণের মধ্যে ব্যবধান ও তিক্ততা বাড়ে। ১৮১৫ খ্রীঃ নাগাদ, দেখা যায় যে ভারতীয়গণ ইংরাজ কর্মচারীগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, স্যার জন শোরের মতে ভারতীয় জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে উচ্চপদে ইংরাজ নিয়োগ বহাল রাখিয়া ভারতবর্ষকে পদানত রাখার চেষ্টা চালান হইতেছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ না করার যে নিয়ম করেন তাহা ১৮৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। এ বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। ১৮৩৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদের মেয়াদ শেষ হইলে নূতন সনদ দানের সময় ভারতীয়গণকে উচ্চ চাকুরীতে নিয়োগের কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচিত হয়। রাজা রামমোহন বিলাতে গিয়া হাউস অফ কমন্সের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেন তাহাতে তিনি নির্ভীকভাবে কোম্পানীর সেনাদলে ভারতীয়গণের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ, ভারতীয় জুরী নিয়োগ এবং কোন নূতন আইনের প্রস্তাব করিবার আগে ভারতীয় নেতাগণের মতামত গ্রহণের দাবী জানান। এদিকে হুইগ দল বিলাতের ক্ষমতায় আসায় শাসন ব্যবস্থায় উদার নীতির প্রভাব পড়ে। মেকলে, মিল প্রভৃতি নেতাগণ ভারতীয়গণের উপর ন্যায়-বিচার করার জন্য তুমুল বিতর্ক করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের নীতির ফল

ইহার ফলে ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে ৮৭ নং ধারায় বলা হয় যে কোম্পানীর কোন চাকুরীতে যোগ্যতা থাকিলে ভারতীয় প্রার্থীকে বর্ণ, ধর্ম বা জাতির বাধার জন্য নিয়োগে বাধা থাকিবে না। বিলাতের পরিচালক সভা এই আইনের ব্যাখ্যায় বলেন যে এই সর্তের দ্বারা ভারতীয়গণের নিয়োগে যে বাধা এতকাল ছিল তাহা দূর করা হইল। চাকুরী লাভের জন্য যোগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসারে ধরা হইবে। ১৭৯৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ১৮৩৩ খ্রীঃ আইনে লোপ করা হয়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এই আইনের বলে কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের কাজে হাত দেন। তিনি বিচার বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ করেন এবং ভারতীয় বিচারপতিগণের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেন। মুন্সেফ, ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতি পদে তিনি ভারতীয় নিয়োগ করেন। কিন্তু শাসন বিভাগের উচ্চপদে তিনি ভারতীয় নিয়োগ করিতে ব্যর্থ হন।

১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন ও ভারতীয় নিয়োগ ব্যবস্থা

কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন কাগজকলমে কোম্পানীর উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের নিয়ম করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য রাখা হয়। এই আইনকে এড়াইয়া কোম্পানীর উচ্চপদগুলি ভারতীয়গণের নাগালের বাহিরে রাখা হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ হাউস অফ কমন্সে ব্রিটিশ সরকার একথা স্বীকার করেন যে, ভারতে উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে দেশীয় কর্মচারীগণ কাজ করেন (Native agency and European superintendence)।[১] উচ্চপদগুলি ভারতীয়গণকে দেওয়া হয় না। ইহাই হইল ইংরাজ সরকারের নীতি। এমন কি ১৮৫৮ খ্রীঃ কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটাইয়া ইংরাজ সরকার ভারতের শাসন ব্যবস্থা

বাস্তবক্ষেত্রে উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগে বাধা আরোপ

১. Sir J. W. Hogg. Hausars 3rd June, 1853,

নিজ হাতে লইলেও এই নীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। বড়লাট লর্ড লিটন গোপন চিঠিতে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানান যে, "১৮৩৩ খ্রীঃ আইন পাশ হইবার পর হইতে সরকার এই আইনের ৮৭ ধারাকে অকার্যকরী রাখার জন্য সকল রকম চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। কারণ ভারতীয়গণের উচ্চপদ লাভের আশা পূরণ করা সম্ভব নহে।"[১] ব্রিটিশ সরকার মনে করিত যে উচ্চপদগুলিতে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করিলে ভারতে ইংরাজ শাসন দুর্বল হইয়া পড়িবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের অগ্রগতি ও জাগরণের সূচনা

(Advancement of India and beginning of political consciousness)

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব (Rise of Middle class) ঃ ইংরাজের শোষণমূলক শাসন নীতির চাপে বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হয়। সেই ভস্ম হইতে নবীন সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উদ্ভব হয়। এই নবীন সমাজ ব্যবস্থার মুখপাত্র ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইওরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা বুর্জোয়া বলিতে যাহা বুঝায় ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঠিক তাহা ছিল না। ইওরোপে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বলিতে শিল্পপতি ও ধনী ব্যবসায়ী বুঝায়। বাংলায় যে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় ইহাদের মধ্যে কিছু পরিমাণ ধনী ব্যবসায়ী থাকিলেও ইহারা ছিল প্রধানতঃ চাকুরীজীবি, আইনজীবি, শিক্ষক, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত জমিদার শ্রেণীর।

ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন

ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে একশ্রেণীর বাঙালী ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। ইহারা ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের হৌস বা ব্যবসায়ের আড়তে দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দির কাজ করিত। ইহারা অনেক সময় নবাগত ইংরাজ কর্মচারীকে ব্যবসায়ের জন্য টাকা ধার দিত ও তাহাদের ব্যবসায়ে দেখাশোনা করিত। ইংরাজগণের সহিত দৈনন্দিন যোগাযোগের ফলে ইহারা কাজ চলা ইংরাজী ভাষা শিখে এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দালালি ও সুদে টাকা খাটাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করে। উদাহরণস্বরূপ মতিলাল শীল, রামদুলাল সরকারের নাম করা যায়। এছাড়া কোম্পানীর বিভিন্ন মাঝারি ও ছোট চাকুরিতে বহু সংখ্যক

১. Quoted by W. J. Bryan—British Rule in India.

বাঙালী কেরানী প্রভৃতির কাজকর্ম করিত। ইহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীর অনেক লোক ছিল। জমিদার শ্রেণীর মধ্যে অনেকে কলিকাতায় স্থায়ী বসবাস করিয়া এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার ও বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বহুলোক ইংরাজী শিখিয়া উকিল, ডাক্তার, চাকুরীয়া, সাংবাদিক ও শিক্ষকের পেশা নেয়। ইংরাজী শিক্ষিত এই সকল পেশার লোকেরা ছিল প্রকৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ইহারা একদিকে ছিল ইংলণ্ডের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অপর দিকে ভারতবাসীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন। এই নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মমর্যাদা বোধ প্রখর ছিল। ইহারা ইওরোপের ইতিহাস, ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান পড়িয়া আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়। ইহারাই বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রসারে অগ্রণী হয়। ইহাদের চলতি কথায় "ভদ্রলোক" (Bhadralogs) বলা হইত। লর্ড লিটন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ইহাদের "বাঙালী বাবু" (Bengali Baboo) বলিয়া নিন্দা করিতেন। এই ভদ্রলোক শ্রেণীই ছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রেরণার মেরুদণ্ড।

চাকুরীজীবি, বৃত্তিজীবি ও বণিক শ্রেণী

নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, ইহারা সকলেই ছিল শহরবাসী ও নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত। কলিকাতা শহর ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পীঠস্থান। এই শহরে বাস করিয়া মধ্যবিত্তগণ বিভিন্ন চাকুরী ও কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। মধ্যবিত্তগণের সহিত গ্রামের শ্রমিক, কৃষক বা পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা, জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা পৃথক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। ইহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্যের উদারতন্ত্র ও স্বায়ত্ব শাসনের আদর্শ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামীন সমাজ হইতে আলাদা হইয়া কলিকাতা-কেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহাদের মনোভাব অনেক পরিমাণে উদার ও প্রগতিশীল হয়। চতুর্থতঃ, গ্রামীন পরিবার-কেন্দ্রিক জীবনের স্থলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবনধারা গঠনে তাহারা অভ্যস্ত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজে পুরাতন যৌথ পরিবার প্রথার স্থলে ক্ষুদ্র পরিবার গড়িয়া উঠে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকাই তাহার সামাজিক পরিচয়ের মাপকাঠি হইল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ এইভাবে জাতিগত পার্থক্যের স্থলে কে কি রকম শিক্ষিত এবং কে কোন ধরণের চাকুরী করে তাহাই পরিচয়ের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়। অর্থ কৌলিন্য ও চাকুরী কৌলিন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট প্রধান বিচার্য ছিল। পঞ্চমতঃ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিলে, পুরাতন জাতিভেদ ও কুসংস্কারের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার ফলে এই শ্রেণী সমাজ সংস্কার ও কুপ্রথাগুলিকে দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগ্রণী হয়। ইহারা বুঝিতে পারে যে ইওরোপে বিজ্ঞান, শিল্প-বিপ্লব ও সাহিত্যে যে বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়াছে, ভারতে সেই অগ্রগতির প্রবর্তন না করিলে ভারত চিরকাল পিছাইয়া থাকিবে। পুরাতন ঘুণ ধরা, কুসংস্কারময় সমাজ ব্যবস্থা এই নূতন

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য : নগরকেন্দ্রিক জীবন

শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। তেজী টাটকা ফেনিল মদ্য যেমন পুরাতন বোতলে ভরিলে বোতল ফাটিয়া যায়, তেমনই নব্য শিক্ষা ও ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে হইলে সমাজ হইতে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস তাড়াইতে হইবে। মধ্যবিত্তগণ এজন্য ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার হাওয়া ঢুকাইয়া দেয়। বাংলা দেশে এই অগ্রগতি প্রথম আরম্ভ হয়। পরে তাহা ভারতের অন্যান্য নগরে ছড়াইয়া পড়ে।

ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝিতে পারে যে ইংরাজ মুখে উদারতার কথা বলিলেও উচ্চ সরকারী পদে কখনও শিক্ষিত ভারতীয়গণকে নিয়োগ করিবে না। সরকারী চাকুরীর সিংহভাগ শ্বেতাঙ্গগণের জন্যই বরাদ্দ থাকিবে। ভারতীয়গণকে আইনসভায় প্রবেশের অধিকারও দেওয়া হইবে না। এককথায় বলা যায় যে ইংরাজের ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখাই ইংরাজের লক্ষ্য। মধ্যবিত্তগণ ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতির চেহারা দেখিয়া নৈরাশ্য বোধ করে। বেন্হাম, মিল, বার্ক ও কাণ্টের দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও অধিকারবোধ জাগে। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজ শাসনের সমালোচনা আরম্ভ করে। তাহারা সরকারী চাকুরীতে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ, অর্থনৈতিক শোষণের অবসানের দাবী জানায়। ক্রমে ইহা স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আসলে ইংরাজ ও ভারতীয় মধ্যবিত্তগণের সংঘাতের ফল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মধ্যবিত্তগণই প্রধান ভূমিকা নেয়। মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে ইহা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ইংরাজ শাসনে পুরাতন গ্রামীন কুটির শিল্প ও কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির ভাঙনের ফলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এজন্য মার্কস ইংরাজ শাসনকে "ইতিহাসের অজ্ঞ হাতিয়ার" (unconscious tool of history) বলিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব

ভারতে নগর জীবনের উদ্ভব (Urbinization in India) ঃ মুঘল যুগের শেষ দিকে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি শহরের সমৃদ্ধির কথা আমরা জানিতে পারি। এই শহরগুলির জীবনধারা ছিল মধ্যযুগীয় ও সংকীর্ণ। ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় কুটির শিল্প, বাণিজ্য ধ্বংস হইলে এই শহরগুলি ধ্বংস হয়। ইহার স্থলে কলিকাতায় ইংরাজের শাসন ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইলে কলিকাতার দ্রুত উন্নতি হয়। ১৬৯০ খ্রীঃ ইংরাজ বণিক জব চার্ণক মুঘল বাদশাহের ফর্মাণ লইয়া সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামে ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। কলিকাতা তখন ছিল একান্তই একটি গণ্ডগ্রাম। ইংরাজ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইবার পর ধীরে ধীরে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। দেশীয় বণিক ও অন্যান্য লোক কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ করে। ১৭১৭ খ্রীঃ মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়ারের ফর্মাণ পাইয়া কোম্পানী কলিকাতার পাশে ৩৮খানি গ্রাম কিনিয়া কলিকাতার বিস্তার ঘটায়। ইংরাজ বণিকগণের সৎ ব্যবহারের জন্য বহু দেশী বণিক কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করে। কোম্পানী বাংলার রপ্তানি

কলিকাতা শহরের উন্নতি

বাণিজ্য কলিকাতা বন্দর হইতে চালায়। আলিবর্দীর শাসনকালে মারাঠা আক্রমণের ভয়ে বহু হিন্দু বাঙালী পরিবার কলিকাতায় আশ্রয় নেয়। কোম্পানী এই সকল আশ্রয়-প্রার্থীগণের সহিত সৎ ব্যবহার করায় অনেকেই স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করে।[১] কোম্পানী মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য কলিকাতার চতুর্দিকে 'মারাঠা খাত' নামক খাল খনন করে। ইহার ফলে বহু বাঙালী বণিক ও সাধারণ লোক কলিকাতায় বসবাসের জন্য আসে। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানী বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইলে কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়ে। নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ শ্রীহীন হইয়া পড়ে। কলিকাতাই বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। এছাড়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। কোম্পানীর কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্যও কলিকাতায় হৌস বা আড়ৎ খুলে। কলিকাতায় একটি টাকশালও স্থাপিত হয়। রেগুলেটিং এ্যাক্টের বলে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও সরকারী দপ্তরখানা ভারতের শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি লাট-ভবন নির্মাণ করিয়া কলিকাতার গুরুত্ব বাড়ান।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ প্রধানতঃ কলিকাতায় বসবাস করিয়া তাহাদের জীবিকা অর্জন করিত। সওদাগরী হৌসে, সরকারী দপ্তরে কর্মচারী, বেনিয়ান হিসাবে, কোম্পানীর ঠিকাদার হিসাবে, অথবা কেরানী, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার হিসাবে কলিকাতাই এই শ্রেণীর জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেয়। কলিকাতায় ব্যবসায় করিয়া মুন্সী নবকৃষ্ণ, শোভারাম বসাক, হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন। ইঁহাদের নামে এখনও কলিকাতায় রাস্তার নাম আছে। এইসঙ্গে চাকুরীজীবি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি কলিকাতা-কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনযাবন করিতে অভ্যস্ত হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধ্যুষিত কলিকাতার সমাজ

কলিকাতায় জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ তেমন ছিল না। এই শহরে অর্থই ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি। ফলে কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, তাঁতি সকলেই এই শহরে নিজ যোগ্যতা দেখাইয়া সমাজে আপন স্থান করিয়া লইবার সুযোগ পায়। গ্রামীন সংকীর্ণতা, জাতিভেদ ও রেষারেষি হইতে মুক্ত হইয়া লোকে এই শহরে স্বচ্ছন্দে ও আরামে জীবন কাটাইবার সুযোগ পায়। মধ্যযুগের শেষদিকে ইতালীর নগরগুলিতে যেমন এক পরিশ্রমী, আত্মবিশ্বাসী, অধ্যবসায়ী ও উদারপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় হয়, তেমনই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠে।

একশ্রেণীর ধনী লোক এই শহরে আমোদ-প্রমোদ বা উৎসব উপলক্ষে দুহাতে পয়সা খরচ করিয়া নাম পায়। মুন্সী নবকৃষ্ণ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন বলিয়া সমসাময়িক পত্রিকা হইতে জানা যায়। এছাড়া অপর একশ্রেণীর ধনী ব্যক্তি ইতর আমোদ-প্রমোদ, বাঈজী নাচ ও সং-এর জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে। ইহাদের 'বাবু' সম্প্রদায়ের লোক বলা হইত। এই সকল অপদার্থ লোকের কাহিনী হুতোমের লেখায় পাওয়া যায়। ইংরাজের জেলা ও মহকুমা শাসনকেন্দ্রগুলিতেও ক্রমে নগর গড়িয়া উঠে।

১. K. K. Datta—Alivardi and his Times.

হুগলী, চুঁচুড়া, বর্ধমান, ঢাকা প্রভৃতি জেলা শহরগুলিতে নগর জীবনের প্রসার ঘটে। বাংলার বাহিরে মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহরও অনুরূপভাবে গড়িয়া উঠে। মোট কথা, নগর জীবনের উদ্ভবের ফলে বাংলা তথা ভারতে যুক্তিবাদী আধুনিক ভাবধারা বিস্তারের ক্ষেত্র তৈয়ারী হয়। নাগরিক মধ্যবিত্তগণ ছিল এই নব ভাবধারার অগ্রদূত। আচার্য যদুনাথের মতে প্রাচীন গ্রীসে এথেন্স নগরী যেমন সমগ্র গ্রীসের সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র ছিল তেমন কলিকাতা নগরী সমগ্র ভারতের আধুনিক সভ্যতা প্রসারের পীঠস্থানে পরিণত হয়।[১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার

(Spread of Western Education through English medium)

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার (Spread of Western Education): অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দকে আধুনিক ভারত ইতিহাসের অন্ধকার যুগ বা Dark Age বলা যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন, রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া ও শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা লাভ এই যুগে ঘটে। ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতের পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে। এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া জাতি দিশাহারা হইয়া যায়। ইহার ফলে ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পিছাইয়া পড়ে। পুরাতনপন্থী ভারত প্রগতিশীল ইওরোপের নিকট পরাজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধ, কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ আসলে নূতনের নিকট পুরাতন জীবনী শক্তিহীন সমাজের পরাজয়ের পরিচয় দেয়।

অষ্টাদশ শতকের অন্ধকারময় যুগ

ভারতে ইংরাজ শাসন কায়েম হইলেও কিছুকাল ভারতে ইংরাজ-পূর্ব পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থা চলিতে থাকে। চেতনাহীন ভারতবাসী তখনও বুঝিতে পারে নাই যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আহরণ না করিলে তাহারা কখনও ইংরাজের সমান হইতে পারিবে না। সুতরাং পুরাতন প্রথা অনুসারে সাধারণ হিন্দুগণ পাঠশালায় ও মুসলমানগণ মক্তবে বাংলা, গণিত ও ফার্সীর পাঠ নেয়। টোলে সংস্কৃত শিক্ষা ও মাদ্রাসায় ফার্সী ও আরবী শিক্ষা চলিতে থাকে। এড্যাম সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ও বিহারে প্রায় এক লক্ষ গ্রাম্য পাঠশালা ছিল। এই সকল পাঠশালায় প্রাচীন শিক্ষাধারাই চলিত। এই যুগে মৌলিক চিন্তা, গবেষণা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা ছিল অজ্ঞাত। ইওরোপে যে বিপুল প্রগতির স্রোত চলিতেছিল ভারতের বদ্ধ জলে তাহার কোন বেগ দেখা দেয় নাই। ভারতের মানস সরোবর ছিল শৈবালে আচ্ছন্ন, স্রোতহীন, পঙ্কিল।

কোম্পানীর আমলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শাসন কায়েম করিলেও এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

---

১. History of Bengal. Vol II. P. 498.

সম্পর্কে গোড়ার দিকে উদাসীন থাকে। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ইংরাজ এদেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য আগ্রহ দেখান। যথা ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশতঃ কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রীঃ) স্থাপন করেন। স্যার জোনাথান ডানকান কাশীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২ খ্রীঃ) স্থাপন করেন। স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্য বিদ্যার চর্চার জন্য কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খ্রীঃ) স্থাপন করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই যুগে কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রয়াস দেখা যায় নাই।

প্রাচ্য শিক্ষা

ক্রমে ভারতীয় নেতাগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কলিকাতার নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ইংরাজগণের সহিত লেন-দেনের জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া ফেলে। সরকারী চাকুরীতে উন্নতি লাভের জন্য ইংরাজী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আদালতে বিচার কার্যে ইংরাজী আইনের চলন হইলে ইংরাজী জ্ঞানের দরকার দেখা দেয়। এই সকল কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ দেখা দেয়।

ইংরাজী শিক্ষায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহ

বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, মিশনারীগণের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা, বেসরকারী প্রচেষ্টা ও সরকারী প্রচেষ্টা।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ ভারতে খ্রীষ্টীয় বাণী প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগাইয়া আসেন। ১৮০১ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করিয়া ইংরাজ কর্মচারীগণকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ রবার্ট মে নামে এক ব্যক্তি চুঁচুড়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বাইবেলের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। কেরী শ্রীরামপুরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ হয়। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে কেরী, টমাস ও মার্শম্যান ২৬টি ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। কেরী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ১৮১৫ খ্রীঃ শ্রীরামপুর কলেজে পরিণত হয়।[১] কেরী ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের যে পথ দেখান তাহা অন্যান্য মিশনারীগণকে অনুপ্রাণিত করে। ১৮২০ খ্রীঃ বিশপস্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কটিশ মিশনারী রেভারেণ্ড

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীগণের দান



আলেকজাণ্ডার ডাফ

১. মতান্তরে ১৮১৮ খ্রীঃ।

আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ খ্রীঃ জেনারেল এ্যাসেম্বলীস ইনষ্টিটিউশন নামে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায় এই বিদ্যালয় স্থাপনে ডাঃ ডাফকে সহায়তা করেন। এই বিদ্যালয় এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও মিশনারীগণ ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে যত্নবান হন। মিশনারীগণের চেষ্টায় বোম্বাইয়ে উইলসন কলেজ ও মাদ্রাজে খ্রীষ্টান কলেজ স্থাপিত হয়।

বেসরকারী প্রচেষ্টা : রাজা রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, হিন্দু কলেজ

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী চার্লস গ্রাণ্ট এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোম্পানীর নিকট জোর সুপারিশ করেন। তিনি বিলাতে ফিরিয়া গিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোম্পানী এই বিষয়ে নিরুৎসাহ থাকে। শেরবার্ণ, মার্টিন, ব্রাণ্ডন, এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি শিক্ষানুরাগী লোকেরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১] রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রধান ভূমিকা নেন। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা রাজা রামমোহন তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার দ্বারা স্বদেশবাসীর মানসিক ও সামাজিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। এজন্য তিনি কলিকাতার শুঁড়িপাড়ায় একটি অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্কচ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফকেও তিনি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব, বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও জয়নারায়ণ ঘোষালও নিজ চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজ করেন। ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রধান ভূমিকা নেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার হাইড ইষ্টও ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহার বাসভবনে কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সভা হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রধান পুরোহিত। ইহাতে স্থির হয় যে, ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। ইহার ফলে ১৮১৭ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধুনা এই কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ঐতিহাসিক মনে করেন যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজা রামমোহন জড়িত ছিলেন না। এ বিষয়ে বহু বিতর্কের অবকাশ



ডেভিড হেয়ার

১. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।

আছে। যাহা হউক হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ঘটনা ছিল। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা বিস্তারের কাজে এই কলেজের ছাত্রমণ্ডলী এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রথমদিকে ধনী হিন্দুগণ ও মহাত্মা ডেভিড হেয়ার এই কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। পরে সরকার ১৮২৩ খ্রীঃ এই কলেজটির দায়িত্ব নেন। এছাড়া ডেভিড হেয়ার কলিকাতার পটলডাঙায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। এই উদার প্রাণ, আদর্শবাদী ও যুক্তিবাদী শিক্ষক তাঁহার যুব-ছাত্রগণকে নবভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার প্রভাবে এই ছাত্রমণ্ডলী হিন্দু সমাজের পুরাতন কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন গঠন করেন। ঊনবিংশ শতকের বাংলার জাগরণে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের একটি বড় ভূমিকা ছিল।

স্কুল বুক সোসাইটি

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মিশনারী ও মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীঃ স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সমিতি ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক ছাপিয়া সস্তাদরে অথবা দাতব্য হিসাবে বিতরণ করায় দরিদ্র ছাত্রগণের পড়ার বিশেষ সুবিধা হয়। এছাড়া স্কুল সোসাইটি নামে অপর এক সমিতি মফস্বলে জেলায় ইংরাজী স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়। ১৮২৩ খ্রীঃ সরকার এই দুই সমিতিকে তাহাদের কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও প্রথমে বেসরকারী প্রচেষ্টা দেখা যায়। স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ দেখান। লসন (Lawson) নামক জনৈক ইংরাজ নারী সমিতি বা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সমিতি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা চালায়। চার্চ মিশনারী সোসাইটি মিস কুক নামক শিক্ষিকার সহায়তায় কয়েকটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করে। লেডী আমহার্স্টের চেষ্টায় বেঙ্গল লেডী সোসাইটি ও একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীঃ ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন বিখ্যাত বেথুন স্কুল বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন স্কুলে সম্ভ্রান্ত বাড়ীর কন্যাগণ শিক্ষালাভ করে। পরে বেথুন বিদ্যালয় বেথুন কলেজে পরিণত হয়। ক্রমে বেথুন স্কুলের আদর্শে বারাসত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে অন্যান্য মহিলা স্কুল স্থাপিত হয়।

রাজা রামমোহনের প্রতিবাদপত্র

ভারতীয়গণের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের পক্ষে দীর্ঘদিন উদাসীন থাকা সম্ভব হয় নাই। লর্ড মিণ্টো ১৮১০ খ্রীঃ এক রিপোর্টে ভারতের শিক্ষার দুরবস্থার কথা কোম্পানীর নিকট উল্লেখ করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার আইন রচনার সময় মিণ্টোর রিপোর্টের ফল দেখা যায়। ১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে বছরে ১ লক্ষ টাকা ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য ব্যয় করা হইবে। ১৮২৩ খ্রীঃ জনশিক্ষা সমিতি বা কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নামে সরকার এক বিভাগ গঠন করেন। এই বিভাগ শিক্ষা বিস্তারের

জন্য দায়িত্ব পায়। জনশিক্ষা কমিটি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় পুস্তক প্রকাশের জন্য সরকারের বরাদ্দ টাকা ব্যয় করিবার অধিকার পায়। ১৮২৩ খ্রীঃ এই সমিতি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ করিলে রাজা রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট এক স্মারকলিপি দ্বারা এই অর্থ পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করার দাবী জানান। রাজা রামমোহন ও খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবী সরকারের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নাই।

কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা সরকারের জনশিক্ষা দপ্তরের সভ্যগণের মধ্যে ক্রমে পরস্পর-বিরোধী মত দেখা দেয়। মেকলে এবং ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সরকারী উদ্যোগের জন্য জোর সুপারিশ করেন। অপর দিকে প্রিন্সেপ, কোলব্রুক প্রভৃতি সভ্যগণ সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি শিক্ষার উপর জোর দেন। প্রথম মতবাদের অনুরাগীগণকে বলা হয় এ্যাংলিসিষ্ট বা পাশ্চাত্যবাদী ও দ্বিতীয় মতবাদীগণকে প্রাচ্যবাদী বা ওরিয়েণ্টালিষ্ট বলা হয়। ইতিমধ্যে দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে এ্যাডামস্ রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে দেশীয় পাঠশালাগুলির দুরবস্থা, পাঠ্য পুস্তকের অভাব ও পাঠ্যবস্তুর অনুপযোগীতা সম্পর্কে সকলে জানিতে পারে। এদিকে বড়লাটের আইনমন্ত্রী লর্ড মেকলে কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। মেকলে ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্য-বাদী। তিনি ১৮৩৫ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার বিখ্যাত মিনিট বা স্মারকলিপির দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী নীতি গ্রহণের জোর সুপারিশ করেন। মেকলে তাঁহার সুপারিশে বলেন যে, "এক তাক ভর্তি ইংরাজী সাহিত্যের পুস্তকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা প্রাচ্য দেশীয় সমগ্র সাহিত্য সম্ভার অপেক্ষা মূল্যবান।" মেকলের এই উক্তির মধ্যে জাতিগর্ব ও অহমিকা দেখা যায়। যাহা হউক মেকলের সুপারিশ বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের মনোগ্রাহী হয়। সুতরাং বড়লাটের পরিষদ ১৮৩৫ খ্রীঃ স্থির করেন যে, অতঃপর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সরকারী অর্থ ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সরকারী কাজ-কর্মে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের নিয়ম করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ বড়লাট হার্ডিঞ্জ আইন করেন যে সরকারী চাকুরী লাভ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান আবশ্যিক হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় ছাত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ বাড়ে। ১৮৩৪ খ্রীঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় এবং বোম্বাইয়ে এলফিনষ্টোন কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৯ খ্রীঃ মাদ্রাজে সরকারী হাই স্কুল স্থাপিত হয়। তাছাড়া মিশনারীগণ মাদ্রাজে ও অন্যান্য স্থানে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এইভাবে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হয়।

প্রাচ্যবাদী বনাম পাশ্চাত্যবাদী : মেকলে মিনিট ; পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে সরকারী আগ্রহ

১৮৫৪ খ্রীঃ বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক সুপরিকল্পিত খসড়া করেন। ইহাকে বলা হয় উড্‌স ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch)। ইহাতে বলা হয় যে, (১) শিক্ষা বিভাগের জন্য আলাদা সরকারী দপ্তর স্থাপন। (২) কলিকাতা, মাদ্রাজ ও

উড ডেসপ্যাচ

বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। (৩) দেশের বিভিন্ন স্থানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। (৪) বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করা হইবে। (৫) উপযুক্ত সংখ্যক কলেজ স্থাপন করা হইবে। (৬) জনশিক্ষার জন্য বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। (৭) শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। (৮) স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

স্যার চার্লস উডের সুপারিশ অনুসারে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ১৮৫৭ খ্রীঃ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতি প্রদেশে সরকারের শিক্ষা দপ্তর স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা দপ্তরের সাহায্যে সরকার শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফল

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য সম্পর্কে অনেকের আশা ছিল যে, ফিল্টারের জল যেমন উপরের কলসী হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় নীচের কলসীতে জমে, তেমনই কিছু লোক ইংরাজী শিখিলে তাহাদের কাছ হইতে ক্রমে ইহা সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাকে ফিলট্রেশন নীতি বা ক্রম-বিস্তার নীতি বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে ইংরাজী শিক্ষা কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সর্ব সাধারণের মধ্যে ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষা ছড়ায় নাই। শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণও ইহাকে গণ শিক্ষায় পরিণত করার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাকে নিজ নিজ উন্নতির সোপান হিসাবে ব্যবহার করেন। জাতির মধ্যে ইহাকে ছড়াইয়া দিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম দিকে হিন্দুগণই ইহার সুযোগ নেয় ও সরকারী চাকুরী লাভ করে। মুসলিম সমাজ ইহা হইতে মুখ ফিরিয়া থাকে। ফলে সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, হিন্দুগণের মধ্যে উচ্চ বর্ণের লোকেরা ইহার সুযোগ নেয় ও সরকারী চাকুরী লাভ করে। নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও দুর্বল শ্রেণী অবহেলিত থাকে। যাহা হউক ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হয়। ইহারা যুক্তিবাদী দৃষ্টি লইয়া সমাজ সংস্কারের কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত ইঁহারা ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল ছিল এই শিক্ষার ফসল। বঙ্কিম, মধুসূদন ছিলেন এই শিক্ষার সোনার ফসল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খ্রীষ্টধর্ম ও নব্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া

(Challenge of Christianity and New Learning)

হিন্দুসমাজে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিক্রিয়া (Challenge of Christianity)ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পার্থিয় গোণ্ডোফার্ণিসের আমলে খ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস ভারতে আসেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ষষ্ঠ শতকে সীরিয় খ্রীষ্টানগণ মালাবার

অঞ্চলে একটি গীর্জা স্থাপন করে। পশ্চিম ভারতের গোয়াতে জেসুইট পাদ্রীগণও তাহাদের ধর্ম প্রচার করে। সুতরাং ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে হইতে ভারতের সহিত খ্রীষ্টধর্মের সহিত পরিচয় ছিল। কোম্পানীর আমলের গোড়ার দিকে ইংরাজেরা ভারতীয়গণের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিল না। কোম্পানীর সনদের অন্যতম শর্ত ছিল ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারীগণকে আসিবার সুযোগ না দেওয়া। পাদ্রী উইলিয়াম কেরী ও তাঁহার সহকর্মীগণ এজন্য কলিকাতায় কোম্পানীর নিকট সুযোগ না পাইয়া, পার্শ্ববর্তী ডেন উপনিবেশ শ্রীরামপুরে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ক্রমে শ্রীরামপুর মিশন একটি সর্বভারতীয় সংস্থায় পরিণত হয়। শ্রীরামপুর ছাপাখানায় ভারতের প্রায় ২৬টি ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ছাপা হয়। পরে উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব পান। তিনি ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই কলেজে বাংলা গদ্য রচনার পথ দেখান।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে কোম্পানীর ঔদাসীন্য

বিলাতে জনমতের চাপে ইংরাজ সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের নীতি পাল্টাইতে বাধ্য হন। ১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে মিশনারীগণকে ভারতে আসিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম-প্রচার করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ফলে বহুসংখ্যক প্রটেস্টাণ্ট মিশনারী ভারতে আসেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনজন বিশপ নিযুক্ত হন। ভারতীয় রাজস্ব হইতে তাঁহাদের মাহিনা বহন করার ব্যবস্থা হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ শিক্ষা বিস্তার ছাড়া ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কোম্পানীর আমলে বহু উচ্চবর্ণের হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। ১৮৫৮ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সহিত রাজ-শক্তির বিরোধ দেখা দেয়। মিশনারীগণ প্রধানতঃ অনুন্নত সম্প্রদায় যথা সাঁওতাল, মুণ্ডা, নাগা, লুসাই, খাসি, গারো প্রভৃতি জাতিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন।

১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার আইন ও মিশনারী অনুপ্রবেশ

খ্রীষ্টান মিশনারীগণ তাহাদের ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের খুবই তীব্র সমালোচনা করেন। হিন্দু সমাজের কুসংস্কার, পৌত্তলিকতাকে তাহারা তীব্র আক্রমণ করেন। জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, নারীগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা মিশনারীগণের সমালোচনায় স্থান পায়। হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ মিশনারীগণ কর্তৃক সমালোচিত হয়। বহুসংখ্যক নিম্ন বর্ণের লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অবহেলিত জীবন হইতে মুক্ত হইয়া সমান অধিকারের স্বাদ পায়। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার হাত হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীতে সামাজিক সমমর্যাদা লাভ করে। কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীগণ তাঁহাদের জনসেবার জন্য বাঙালীর নিকট সম্মানিত হন। সমসাময়িক প্রবাদে ও ছড়ায় তাঁহাদের নাম ছড়াইয়া যায়।[১] বাংলায় ম্যার্শম্যান, ব্রাণ্ডসন, ডাঃ ডাফ, বোম্বাইয়ে উইলসন ও মাদ্রাজে রবার্ট নোবল প্রভৃতি মিশনারীগণ ধর্ম বিস্তারের কাজে বেশ সাফল্য লাভ করেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে জনসভায় তর্ক যুদ্ধে আহবান

হিন্দু সমাজ ও ধর্মের উপর তীব্র আক্রমণ

১, সমসাময়িক একটি সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করা হইল—'হেয়ার কলিন পামারশ্চ কেরী মার্শম্যান স্তথা। পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্।'

করিয়া হিন্দু ধর্মের অসারত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। স্কটিশ পাদ্রী ও শিক্ষা সংগঠক রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সহিত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জেনারেল এ্যাসেম্বলী কলেজের (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজের) উদ্দেশ্য ছিল "উদারতন্ত্রী পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার।"[১] হিন্দু কলেজ ও জেনারেল এ্যাসেম্বলীর কিছু কিছু হিন্দু ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে সাড়া পড়িয়া যায়। লালবিহারী দে, গোপীনাথ নন্দী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। পরবর্তীকালে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

রক্ষণশীল সমাজে আলোড়ন

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ও খ্রীষ্টান মিশনারীগণের বিরূপ সমালোচনা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে ফাটল ধরাইয়া দেয়। হিন্দু সমাজের যে সকল প্রথা এতকাল লোকে অন্ধভাবে মানিয়া চলিতেছিল তাহার অসারতা সকলের চোখে পড়ে। হিন্দু সমাজের যুক্তিবাদীগণ যথা রামমোহন রায় ও নব্যবঙ্গ দল হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনে যত্নবান হন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে যুগের পরিবর্তনের সহিত হিন্দু সমাজ খাপ খাওয়াইয়া না চলিলে ইহা ধ্বংস হইবে। ইহার ফলে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন তীব্রতর হয়।

রামমোহন ও সৈয়দ আহমদের প্রতিবাদ

রাজা রামমোহন ও স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি নেতাগণ খ্রীষ্টান মিশনারীগণের উগ্র ধর্ম প্রচার ও হিন্দু-মুসলিম সমাজের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানান। রাজা রামমোহন ১৮২১ খ্রীঃ তাঁহার Brahmanical Magazine পত্রের মুখবন্ধে অত্যন্ত মার্জিত ও গম্ভীর ভাষায় বলেন যে গত ২০ বৎসর মিশনারীগণ হিন্দু ও মুসলমানগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার চেষ্টা চালাইতেছে। মিশনারীগণ এই সকল ধর্মের মতবাদ ও দেবদেবীর প্রতি নিন্দা জানাইয়া বই ছাপায় এবং তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করে। তাহারা এদেশীয় ব্যক্তির বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে এবং খ্রীষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে।[২] তৃতীয়তঃ, হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের লোকদের চাকুরী ও বৈষয়িক উন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মান্তরিত করে। যাহা হউক খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের সমালোচনার দাপটে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার দুর্গে ফাটল ধরে। সেই ফাটল দিয়া নূতন সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের হাওয়া প্রবল বেগে ঢুকিয়া পড়ে। হিন্দু সমাজের আধুনিকীকরণ আরম্ভ হয়।

ইয়ং বেঙ্গল: নব্য শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া (Challenge of New Learning): পাশ্চাত্য শিক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নূতন চেতনাবোধ সৃষ্টি করে। মিল, বেন্থাম, রুশো, ভলতেয়ারের দর্শন পড়িয়া যুব সমাজ যুক্তিবাদ ও প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। ইওরোপীয়

১. "Propagation of Gospel through education at once liberal and religious." (Vide College Prospectus)

২. Vide ঊনবিংশ শতকে বাংলার কথা ও যোগেশ চন্দ্র বাগল—প্রবন্ধ—দিলীপ কুমার বিশ্বাস।

ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহারা মানবিক অধিকার ও সামাজিক সাম্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ইওরোপীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে তাহাদের যুক্তিবাদ দৃঢ় ভিত্তি পায়। রাজা রামমোহন পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদীর আলোকে ভারতীয় শাস্ত্র, উপনিষদের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা করেন। তিনি সামাজিক কুসংস্কার যথা সতীদাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি ও ধর্মীয় কুসংস্কার যথা পৌত্তলিকতার নিন্দা করেন। রাজা রামমোহন যুক্তিবাদের দ্বারা নিজ দেশের সভ্যতাকে পরিশুদ্ধ ও সংস্কার করিতে চাহেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবঙ্গ দল

অপর এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় সকল কিছুকেই ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। ইহারা নিহিলিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদীগণের ন্যায় সকল প্রকার প্রচলিত প্রথা ও ধর্মীয় সংস্কারকে ভাঙিবার জন্য আগাইয়া আসেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন কুপ্রথা ও রক্ষণশীলতার ধ্বংস সাধন। রক্ষণশীলতার বদ্ধ জলাকে শুকাইয়া ফেলিলে তাহাতে নূতন স্রোত বহিবে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

নব্যবঙ্গবাদীগণের নস্যাৎ প্রবণতা

হিন্দু কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এই ভাঙন-ধর্মী ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহাদের নাম ছিল নব্যবঙ্গ দল বা ইয়ংবেঙ্গল দল। হিন্দু কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অধ্যাপক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এই সম্প্রদায়ের গুরু। ডিরোজিও ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক, সুলেখক, কবি, ভাবুক ও দার্শনিক প্রকৃতির লোক। তিনি ড্রামণ্ডের ধর্মতলা একাডেমীর মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ৫ বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৮৩১ খ্রীঃ মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে এই প্রতিভাবান অধ্যাপকের মৃত্যু হয়। ডিরোজিও ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী, পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনে কৃতবিদ্য। তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে সর্বদা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন এবং কোন প্রথাকে যুক্তি দ্বারা যাচাই না করিয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেন। এদিকে তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে নীচতা ও নৈতিক স্খলন দোষে না পড়ে এজন্য তিনি তাহাদের সতর্ক করিয়া দিতেন। কলেজের পরে তাঁহার গৃহে তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে পাঠ ও আলোচনার সুযোগ দিতেন। তাঁহার উৎসাহে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সমালোচনার জন্য একাডেমিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালেচনা করা হয়। বিভিন্ন বিতর্ক সভায় ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যগণ যোগ দিয়া হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথাকে আক্রমণ করেন। পার্থেনন নামক এক পত্রিকার দ্বারা ডিরোজিও এবং তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর স্বাধীন মতামত জনসমাজে প্রকাশিত হয়

ডিরোজিও ও ছাত্রমহল



হেনরী ডিরোজিও

ডিরোজিওর প্রভাবে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী হিন্দু সমাজের প্রথাগুলিকে ভাঙিতে আরম্ভ করেন। ডিরোজিও শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর মন্ত্র ছিল "হিন্দু ধর্ম নিপাত যাক, গোঁড়ামি নিপাত যাক।" ফলে কোন কোন নব্যবঙ্গ যুবক কোন ব্রাহ্মণকে রাস্তায় দেখিলে তাঁহাকে বিরক্ত করিবার জন্য "আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো" বলিয়া চীৎকার করিত।[১] ছাদে উঠিয়া প্রতিবেশীগণকে বলিত, "এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিলাম।" যাহারা আরও উগ্রপন্থী তাহারা সত্যসত্যই নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিত এবং পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিত। তাহারা টম পেইনের পুস্তক Age of Reason বা "যুক্তির যুগ" হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। আসলে ইয়ং বেঙ্গল দলের নব্যপন্থীগণের উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য ও ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে পুরাতন সংস্কারকে ভাঙিয়া কেলা।

নব্যবঙ্গ দলের উন্নাসিকতা ও ভাঙন-ধর্মী আন্দোলন

ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার উপর আক্রমণ কলিকাতায় গোঁড়া হিন্দুগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তাঁহাদের চাপে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পদত্যাগ করিবার পর তিনি অল্প বিছুকাল সাংবাদিকতার কাজ করেন। অতি অল্প বয়সে এই মনস্বী অধ্যাপকের অকাল-মৃত্যু ঘটে।

প্রতিক্রিয়া

ডিরোজিওর প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয় নাই। ডিরোজিওর ভক্তগণ তাঁহাকে নবযুগের অগ্রদূত মনে করেন। অপর দিকে ডিরোজিওর বিরোধীগণ তাঁহাকে উগ্রপন্থী কাণ্ডজ্ঞানহীন সমালোচক বলিয়া অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ডিরোজিও ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী ও রোমাণ্টিক সংস্কারক। তিনি যেমন একদিকে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিকে আক্রমণ করেন তেমন অপর দিকে তিনি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাও রচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীন চিন্তার সহিত তিনি সামঞ্জস্য জ্ঞানের পরিচয় দেন। তাঁহার অল্পবয়স্ক ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে সাময়িকভাবে ভাঙন-ধর্মী ও নস্যাৎ-প্রবণ হয় একথা সত্য। কিন্তু যে স্বাধীন চিন্তার বীজ তিনি তাহাদের মনে বপন করেন তাহার প্রভাবে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী প্রখ্যাত সংস্কারক ও সমাজসেবকে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, ডিরোজিও হিন্দু সমাজের গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিলেও তাঁহার যুক্তিবাদকে তিনি খ্রীষ্টধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন নাই। তিনি খ্রীষ্টান হিসাবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চতুর্থতঃ, জিরোজিও হিন্দু দর্শন বিশেষভাবে চর্চা না করিরা এই ধর্মের কুপ্রথাগুলিকে আক্রমণ করেন মাত্র। হিন্দু দর্শনের শ্রেষ্ঠ দিকগুলি তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহার চিন্তা-শক্তি হিউম, কাণ্ট ও বেকনের মতবাদে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি বায়রণের ন্যায় তাঁহার ভাবধারা রোমাণ্টিকভাবে প্রচার করিতেন। তাঁহার দেশভক্তি ভারত সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

ডিরোজিওর মূল্যায়ন

তবুও এ কথা বলা যায় যে ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলী সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি

১. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।

করেন। এই আলোড়নের ফলে ডিরোজিও শিষ্যগণ নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় বা ইয়ং বেঙ্গল দল নামে পরিচিত হন। তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকেরাই ছিলেন এই সম্প্রদায়ের। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নব ভারতের দিকপাল সমাজবিদ ও চিন্তানায়কগণ ছিলেন ডিরোজিওর মানস সন্তান। নব্য শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত যুক্তিবাদ ভারতের ঘুণ ধরা মরা সমাজে নূতন সংস্কারের জোয়ার আনে। ইহারই পরিণামে জাতীয়তাবাদ জাগে।

নব্যবঙ্গের প্রভাব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন : ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন

(Religious and social Reforms : Brahmo Movement)

পুরাতন সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা (Recovery of the Past) : তৃতীয় পরিচ্ছেদে খ্রীষ্টধর্ম ও নব্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এক শ্রেণীর লোকের মনে কি প্রকার অনাস্থা দেখা দেয় তাহা আলোচনা করা হইয়াছে (পৃঃ ৫৯-৬২ দেখ)। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় সভ্যতার প্রভাবে কিছু লোকের চোখ ধাঁধাইয়া যায়। তাহারা উন্মার্গগামী হইয়া স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করে। অপর এক শ্রেণীর নব্যপন্থী ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের গভীরে না ঢুকিয়া কেবলমাত্র ইহার আচার ও কুপ্রথাগুলিকে আক্রমণ করে। নব্য সম্প্রদায়ের এই আক্রমণ ও খ্রীষ্টান মিশনারীগণের সমালোচনার ফলে কিছুদিনের জন্য দেশের অগ্রগতির লক্ষ্য কি হইবে এ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

নব্যবঙ্গবাদীগণের আক্রমণ : রক্ষণশীলতায় ফাটল

দেশের এই অবস্থায় ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কিছু কিছু চিন্তাশীল লোক গভীরভাবে অনুভব করেন। রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ এই যুগে জাতিকে নূতন পথ ও মতের সন্ধান দিতে আগাইয়া আসেন। ইহার ফলে ভারতে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়।

ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা যায়, যথা, (১) পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত ধর্ম আন্দোলন। (২) ভারতীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলন। (৩) উভয় ধারা ও অন্যান্য ধর্মের সহিত সমন্বয়বাদী আন্দোলন।

ত্রিমুখী ধারা

ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন (The Brahmo Movement)ঃ আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ধর্ম সংস্কারের কাজে আগাইয়া আসেন। রাজা রামমোহন ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী ও আধ্যাত্ম-ভাবের মানুষ। তিনি হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রগুলি যত্ন সহকারে পড়িয়া উহার যুক্তিবাদী বিচার করেন। হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শ্রেণীর অনাচার, সমাজের কুপ্রথা তাঁহাকে ব্যথিত করে। রাজা রামমোহন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ হিন্দু সমাজের কুপ্রথাগুলিকে নিন্দা করিলে তিনি বুঝিতে পারেন যে হিন্দু ধর্মে বহু গলদ ঢুকিয়াছে। ইহাকে পরিশুদ্ধ না করিলে শৈবালে যেমন স্রোত আটকাইয়া নদী মজিয়া যায়, হিন্দু ধর্মের প্রাণশক্তি তেমনই নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। রাজা রামমোহন বেদ ও উপনিষদের আলোকে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে যাচাই করেন। তিনি এই স্থির সত্যে উপনীত হন যে ঈশ্বর এক এবং তিনি নিরাকার। বেদে ও উপনিষদে মূর্তি পূজার ব্যবস্থা নাই। ঈশ্বরকে বহুভাবে ও বহু মূর্তিতে পূজা করা অশাস্ত্রীয়। রাজা রামমোহন এই সত্যে উপনীত হইয়া তাঁহার মতবাদ জনসমাজে প্রচারের জন্য পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন তাঁহার পুস্তিকায় পৌত্তলিকতার নিন্দা, যাগযজ্ঞ, মূর্তি পূজা ও জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেন।[১] তিনি হিন্দু উপনিষদের আলোকে বিশ্বজনীন ধর্মবোধের কথা প্রচার করেন। রামমোহন তাঁহার রচনায় যেমন হিন্দুধর্মের গোড়ামি ও কুপ্রথাকে নিন্দা জানান, তেমনই তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের কুপ্রথাকেও আক্রমণ করেন। তিনি একেশ্বরবাদ সমর্থন করেন।

ধর্ম সংস্কারে রাজা রামমোহনের ভূমিকাঃ উপনিষদ ও একেশ্বর-বাদ



রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন তাহার ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৮১৪-১৮১৫ খ্রীঃ মধ্যে আত্মীয় সভা নামক সমিতি স্থাপন করেন। এই সভায় কলিকাতার মান্যগণ্য লোকেরা রামমোহনের ধর্মীয় ব্যাখ্যা শুনিতে পান ও সে সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পান। রামমোহন উপনিষদের বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেন। তিনি বেদান্তসার ও উপনিষদ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কলিকাতার রক্ষণশীল সমাজ রামমোহনের ধর্মমতকে অসার প্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার তর্কযুদ্ধের ব্যবস্থা করে। এই তর্কযুদ্ধে রামমোহন সাফল্যলাভ করেন। খ্রীষ্টান পাদ্রী এ্যাডামস্‌ও তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

আত্মীয় সভা

রামমোহন তাঁহার একেশ্বরবাদকে প্রচার করিবার জন্য ১৮২৮ খ্রীঃ ফিরিঙ্গী কমল বোসের গৃহে ব্রাহ্ম সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ এই সভার নাম পাল্টাইয়া "ব্রাহ্ম

১. S. D. Colet—Life and Letters of Raja Rammohan.

সমাজ" রাখা হয়। ডিরোজিও শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা ও বেদ মন্ত্র গাহিবার ব্যবস্থা কয়া হয়। উপাসনার সময় উপনিষদ পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। ব্রাহ্ম সমাজে মূর্তি পূজা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়। রাজা রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজের দ্বার সকল ধর্মের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসীগণের জন্য উন্মুক্ত করেন।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন

রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম মতবাদে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আকৃষ্ট হন। কলিকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে ধর্মসভা স্থাপন করেন এবং সমাচার চন্দ্রিকা নামক পত্রিকার মাধ্যমে রামমোহনের মতবাদকে আক্রমণ করেন। অপর দিকে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকার সাহায্যে রামমোহন নিজ মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

রক্ষণশীল সমাজের প্রতিবাদ

রাজা রামমোহন বিলাতে যাওয়ার পর কিছুকাল ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন ঝিমাইয়া পড়ে। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৩৮ খ্রীঃ) ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলে ইহাতে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের আদর্শে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্ম-মতকে জনপ্রিয় করিয়া তুলেন। অক্ষয়-কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারের ফলে লোকে বুঝিতে পারে যে—(১) ইওরোপীয় সভ্যতার ভাল গুণগুলি এদেশের লোকের গ্রহণ করা দরকার। (২) কুসংস্কার বাদ দিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি গ্রহণ করা উচিত। (৩) এইভাবে পশ্চিম ও পূর্বের সমন্বয়ে নব ভারতকে গড়িতে হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহার পর কেশবচন্দ্র সেন ১৮৫৮ খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। কেশবচন্দ্র ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদ পান। কেশবচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব বাগ্মীতা, ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা ও আবেগ দ্বারা শুষ্ক যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম ধর্মকে ভাববাদী ও ভক্তিবাদী করিয়া তুলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সংকীর্তন প্রথার প্রচলন করেন। কেশবচন্দ্র ও নব্য ব্রাহ্মগণ যুক্তিবাদের আলোকে ব্রাহ্ম সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কোন কোন সভ্যের উপবীত ধারণের বিরোধিতা করেন। ইহা লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সমর্থকগণের

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন

গভীর মতভেদ দেখা দেয়। ফলে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের এক নূতন শাখা স্থাপন করেন। ইহার নাম হয় ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের নাম হয় আদি ব্রাহ্ম সমাজ। আদি ব্রাহ্ম সমাজ রামমোহনের আদর্শ অনুযায়ী একেশ্বরবাদ ও উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া উপাসনা চালায়। কিন্তু এই সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছেদ না করার নীতি গ্রহণ করে।



কেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৬৪ খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজের দীক্ষিত সভ্যের সংখ্যা প্রায় ২ হাজারে দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ সমর্থন, বাল্য বিবাহ বর্জন, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ও পর্দা প্রথা বর্জন প্রভৃতি প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের নীতি নেয়। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে সরকার ভারতীয় বিবাহ বিধি আইন, ১৮৭২ খ্রীঃ পাশ করেন। ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ নিজ নিজ পরিবারে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নেন। সুলভ সমাচার নামে এক পত্রিকার দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক সংস্কারগুলি জন সমাজে প্রচার করা হয়। ব্রাহ্মিকাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা হয়।

সমাজ সংস্কার

কেশবচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন শহরে তাঁহার ধর্মমত ও সামাজিক সংস্কার প্রচার করিলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ইহা আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁহারই প্রভাবে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ ও মাদ্রাজে বেদ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পথ রচনা করেন। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে তাঁহার অপূর্ব বাগ্মীতার জন্য ভূয়সী খ্যাতি পান।

সর্বভারতীয় আন্দোলন

কিছুদিন পর কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার ব্রাহ্ম সহকর্মীগণের মতবিরোধ দেখা দেয়। কেশবচন্দ্র নারীগণের উচ্চ শিক্ষার বিরোধিতা এবং গুরুবাদের সমর্থন করায় যুব ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহার ঘোর মত-বিরোধ হয়। ফলে ১৮৭৮ খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজের আর একটি নূতন শাখা স্থাপিত হয়। ইহার নাম হয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ইহাতে নেতৃত্ব দান করেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের নাম হয় নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ

বাংলার জেলা ও মফস্বল শহরগুলিতে ব্রাহ্ম সমাজের শাখা স্থাপিত হয়। তাছাড়া বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও ব্রাহ্ম সমাজের শাখা স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সম্প্রদায় বিশেষ বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা

স্থাপিত হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। হিন্দু সমাজের পুরাতন কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়ে। তবে হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন দূর করিতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ উল্লেখযোগ্য কাজ করে। ইহার প্রভাবে হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়। তৃতীয়তঃ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনও হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে কৌলীন্য প্রথা ও বাল্য বিবাহ ক্রমে লোপ পায়। চতুর্থতঃ, ব্রাহ্ম সমাজ সর্বপ্রথম সমাজসেবা ও জনসেবার নীতি গ্রহণ করে। দুর্ভিক্ষের সময় সেচ ও ত্রাণ কার্য ব্রাহ্ম সমাজ গ্রহণ করে। পরে রামকৃষ্ণ মিশন এই আদর্শ নেয়। এছাড়া বয়স্কগণের অবৈতনিক শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ সেবার কাজ ব্রাহ্ম সমাজ করে। এছাড়া জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উপরও ব্রাহ্ম সমাজ আঘাত হানে। পঞ্চমতঃ, শিবনাথ ও বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতাগণের মনে ক্রমে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়। ইংরাজ শাসনের হাত হইতে স্বদেশের মুক্তির সুদূর স্বপ্ন তাঁহাদের মনে প্রথম উন্মেষ লাভ করে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্ষীণভাবে দেখা দেয়।[১] সর্বোপরি হিন্দু সমাজে সংস্কারবাদী আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের পরোক্ষ ফল ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে সুলভ সমাচার ও ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া জনমতকে প্রভাবিত করা হয়। বাংলার সাংবাদিকতা ইহার ফলে শক্তিশালী হয়।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলাফল

প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন (The Prarthana Samaj Movement)ঃ কেশবচন্দ্রের প্রভাবে বোম্বাই শহরে ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হয়। আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ ছিলেন ইহার স্থাপয়িতা। পরে মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এই সম্প্রদায়ে যোগ দিলে প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন বলবতী হয়। প্রার্থনা সমাজ মূর্তি পূজার বিরোধিতা ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিলেও ব্রাহ্মগণের ন্যায় হিন্দু সমাজের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করে নাই। রানাড়ে সমাজ সংস্কারের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা দূর করা ও বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের আদর্শ প্রচার করেন। প্রার্থনা সমাজ অন্ধ্রের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে জনপ্রিয়তা পায়। দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি প্রার্থনা সমাজের প্রভাবে স্থাপিত হয়।



মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে

১. Memoirs of Bepin Chandra Vol. II.

আর্য সমাজ আন্দোলন ও স্বামী দয়ানন্দ (The Arya Samaj Movement and Swami Dayananda) ঃ ঊনবিংশ শতকের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুধর্ম সংস্কার। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু আর্য সমাজ আন্দোলন ভারতীয় ঐতিহ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর্য সমাজ আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজ অপেক্ষা কম প্রগতিশীল ও জনপ্রিয় ছিল না।

প্রাচীন ঐতিহ্যের জাগরণ

আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর, ১৮২৮ খ্রীঃ গুজরাটের টংকারা নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়। তাঁহার আদি নাম ছিল শংকর। বালক বয়সেই তাঁহার মনে স্বাধীনভাবে চিন্তার ক্ষমতা দেখা যায়। তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ১৫ বৎসর কঠোর যোগ সাধনা ও শাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি স্বামী বিরজানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ নাম পান। তিনি মাদ্রাজ ছাড়া ভারতের সকল অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া হিন্দু সমাজের অধঃপতন লক্ষ্য করেন। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের তুলনায় হিন্দু পৌত্তলিক সমাজের হীনতা ও কুসংস্কার দয়ানন্দের মনে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে বৈদিক হিন্দু ধর্ম হইতে বিচ্যুতির জন্যই হিন্দু সমাজের এই অবনতি দেখা দিয়াছে। ইহার পর দয়ানন্দ তাঁহার সমগ্র জীবন ধর্ম সংস্কারের কাজে ব্যয় করেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী



দয়ানন্দ সরস্বতী

দয়ানন্দ ঘোষণা করেন যে বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞান ও সমাজ সংস্কারের আদর্শের জন্য ভারতবাসীর পক্ষে ইওরোপের দ্বারস্থ হইবার দরকার নাই। ভারতের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদেই সকল সত্য নিহিত আছে। আধুনিক প্রগতিবাদী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সকল তথ্য বেদেই পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় যেরূপ বাইবেলে তাহাদের সকল ধর্ম নীতি ও সমাজ নীতির সন্ধান পায়, হিন্দু সমাজের বেদের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দয়ানন্দ বলেন যে মূর্তি পূজা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি অনাচার পরবর্তী যুগে হিন্দু সমাজে ঢুকিয়াছে। ইহা দূর করিয়া বেদের আদর্শে হিন্দু সমাজকে পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, দয়ানন্দ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের এক ও অভিন্নতার কথা ঘোষণা করেন। তিনি পুরাণ, তন্ত্র ও হিন্দু আচার কর্মের নিন্দা করেন। চতুর্থতঃ, ১৮৭৫ খ্রীঃ বোম্বাইয়ে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় ইহার দশটি বিধি ঘোষণা করা হয়। বেদের বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই একমাত্র শাস্ত্রীয় জ্ঞান বলিয়া গণ্য করা হয়। মূর্তি পূজা, বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ নিষিদ্ধ করা হয়। নিরাকার পরম ব্রহ্ম ঈশ্বরের উপাসনাকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ বলা হয়।

দয়ানন্দের ধর্মমত

দয়ানন্দের মতবাদ রক্ষণশীল সমাজে প্রবল আঘাত হানে। ফলে হিন্দু তীর্থস্থান বারাণসীতে ৩০০ জন হিন্দু পণ্ডিতের বিরুদ্ধে তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে যোগ দিতে হয়। দয়ানন্দ এই বিতর্কে জয়লাভের পর সর্বভারতীয় খ্যাতিলাভ করেন। তিনি সত্যার্থ প্রকাশ, বেদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার ধর্মমত ও বেদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। দয়ানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন নামক আন্দোলন দ্বারা অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে হিন্দু ধর্মান্তরিত করার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে যে সকল হিন্দু নানা কারণে নিজধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা পুনরায় হিন্দু সমাজে প্রবেশের সুযোগ পায়।

দয়ানন্দের প্রভাব

দয়ানন্দ তাঁহার ধর্মমত প্রচার ছাড়া সমাজ সংস্কারের দিকেও নজর দেন। তিনি হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহের নিন্দা করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও তিনি চেষ্টা করেন। তাঁহার শিষ্য লালা হংসরাজ লাহোরে বিখ্যাত দয়ানন্দ এ্যাংলো-ভেদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উত্তর ভারতের নানা স্থানে এইরূপ কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত বৈদিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয়। এছাড়া হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ বৈদিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে লালা হংসরাজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, গুরু দত্ত বিশেষ বিখ্যাত। আর্য সমাজ আন্দোলন উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবে বিশেষ প্রসার লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আর্য সমাজ আন্দোলন জন সমাজে ছড়াইয়া যায়। দয়ানন্দ হিন্দী ভাষাকে তাঁহার প্রচারের মাধ্যম করেন। রাজা রামমোহনের সহিত দয়ানন্দের মতবাদের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই বেদের উপর গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। কিন্তু রাজা রামমোহন সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের যেরূপ সমন্বয়ের কথা ভাবেন দয়ানন্দ সেইরূপে ভাবেন নাই। রামমোহনের ন্যায় বিশ্বজনীনতা দয়ানন্দের ছিল না। দয়ানন্দ কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বলেন।

আর্য সমাজ
সংস্কার

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও রামকৃষ্ণ মিশন (Ramkrishna Paramhansa and the Ramkrishna Mission): ঊনবিংশ শতকে ভারতের ধর্ম আন্দোলন যখন দুই সমান্তরাল ধারায় যথা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের পথে ও ভারতীয় ঐতিহ্যবাদের পথে চলিতেছিল তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস এই উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বেদান্তের মর্মকে এমন সহজ ভাষায় গল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন যে শ্রোতাগণের মনে তাহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলেন যে ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। লোকে তাঁহাকে বহু নাম দেয়। 'একম্ সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। তিনি কেবলমাত্র মুখে এই কথা না বলিয়া সাধনা দ্বারা দেখাইয়া দেন যে হিন্দু মতে, খ্রীষ্টীয় মতে ও ইসলামীয় মতে সাধনা করিলে একই ঈশ্বরের নিকট উপনীত হওয়া যায়। তিনি দেশবাসীকে নিরর্থক কোন ধর্ম ভাল,

রামকৃষ্ণের সমন্বয়বাদ : ভারতবাসীর আত্মিক জাগরণ

কোন ধর্ম মন্দ, ইহা লইয়া ঝগড়া না করিয়া নিজ ধর্ম নিষ্ঠা সহকারে পালনের আহবান জানান। কারণ তিনি বলেন যে ঈশ্বর এক। যে কোন মতেই তাঁহার উপাসনা করা হোক না কেন তিনি তাহাতে সাড়া দিবেন। দ্বিতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ বেদ শ্রেষ্ঠ, কি মূর্তি পূজা শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া অনর্থক কলহ না করিতে বলেন। তিনি বলেন যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে যে ভাবেই ভজনা করা হোক না কেন, আন্তরিকভাবে ভজনা করিলে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা সম্ভব। সাকার ও নিরাকার একই ঈশ্বরের বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। যিনিই নিরাকার তিনিই আবার সাকার। মূর্তি পূজার দ্বারা ঈশ্বর লাভ সম্ভব। তিনি নিজে কালী বা শক্তি সাধনার দ্বারা ইহা প্রমাণ করেন। রামকৃষ্ণের এই মতবাদের ফলে হিন্দু সমাজে মূর্তি পূজা লইয়া যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার নিরসন হয়। তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ হিন্দু সমাজের আচার-সর্বস্বতা ও অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার নিন্দা করেন। তিনি বলেন ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্ম-নিবেদন ছাড়া আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা ঈশ্বর লাভ সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, রামকৃষ্ণ বেদান্তের মানবতাবাদকে বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করেন। তিনি জীবসেবা ও মানব সেবাকে ঈশ্বরের সেবা বলিয়া মনে করিতেন। কারণ জীবই হইল শিব, 'যত্র জীব তত্র শিব'। পঞ্চমতঃ, রামকৃষ্ণ নারীজাতির মুক্তির কথা জোরের সঙ্গে বলেন। এইভাবে পাশ্চাত্যের সভ্যতার মোহে অন্ধ ভারতবাসীর মনে রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মবাদের জাগরণ ঘটান। ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মবাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে "প্রায় তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভারত আধ্যাত্ম জগতে যে অগ্রগতি লাভ করে রামকৃষ্ণ ছিলেন তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্তি"।[১]



রামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণের আদি জীবন

রামকৃষ্ণ পরমহংসের আদিনাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৮৩৪ খ্রীঃ হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কুল, কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে দিব্য ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। পরে তিনি রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার নিকটে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পুরোহিত নিযুক্ত হন। দক্ষিণেশ্বরেই গদাধর দিব্য জীবনের সাধনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে পরিচিত হন।

রামকৃষ্ণের ভক্তি ও ভাবের কথা প্রচারিত হইলে বহু লোক তাঁহার নিকটে আসে। রামকৃষ্ণ সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাষায় ধর্মের দুরূহ তত্ত্বগুলি তাহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন।

১. "Ramkrishna was a visible embodiment of the spiritual attainment of India during three hundred years."—Dr. R. C. Majumdar

উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও দিব্য অনুভূতির বলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তাহার সাহায্যে তিনি বহু বিদ্বান ব্যক্তিগণকেও জ্ঞান দান করেন। তাঁহার প্রখ্যাত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও নাট্যকার কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৬ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণের প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন (Swami Vivekananda and Ramkrishna Mission)ঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসের লোকান্তরের পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কলিকাতার কাশীপুরের মঠে রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন এই সংঘের প্রাণ। নরেন্দ্রনাথ সিমলার দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার জেনারেল এ্যাসেম্বলী বা অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে দর্শনে ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই নরেন্দ্রনাথের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তিনি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের নিকট তাঁহার সকল প্রশ্নের সমাধান পান এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আদি জীবন

রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কাশীপুরের মঠে রামকৃষ্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলী বা সংঘ স্থাপন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই সংঘের প্রাণ। রামকৃষ্ণের বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ তাঁহার মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হয়। এই সময় তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। ভারতীয় জনগণের দারিদ্র, অশিক্ষা, ভারতীয় সভ্যতার অবনতি এবং পরাধীন ভারতের ধূলিমলিন রূপ তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করে। অবনত ভারতকে জাগাইবার জন্য স্বামীজী ব্রত গ্রহণ করেন। বেদান্ত, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনে স্বামী বিবেকানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বেদান্তের মূল সূত্রগুলি তাঁহার ভাষণে প্রাণ পাইয়া শ্রোতার মর্মে মর্মে গাঁথিয়া যাইত। ১৮৯৩ খ্রীঃ আমেরিকার শিকাগো শহরে নিখিল বিশ্বধর্ম সম্মেলনে অনাহূতভাবে যোগ দানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কপর্দকহীন অবস্থায় যান। এই সম্মেলনে স্বামীজীর বেদান্ত, ভারতীয় সভ্যতার বিশ্বজনীনতা, ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়বাদী ব্যাখ্যা শ্রোতা-গণের হৃদয় স্পর্শ করে। বিজ্ঞান ও আর্থিক সম্পদে গর্বিত পাশ্চাত্যকে স্বামীজী ভারতের আধ্যাত্ম সম্পদের কথা শোনান। সমগ্র আমেরিকা ও ইওরোপে স্বামী বিবেকানন্দ অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা পান। বিবেকানন্দের সম্মান লাভে ভারতবাসী সম্মানিত হয়। ইংরাজের হাতে শাসিত ভারতবাসী নিজেকে হীন ভাবিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল, স্বামীজী সেই জাতিকে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরাইয়া দেন।

বিবেকানন্দের মানবতা, স্বদেশপ্রেম- বেদান্তবাদ ও জাতীয়তাবাদ

ইওরোপ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া স্বামীজী দেশবাসীকে নব বেদান্তের আলোকে জাগাইয়া তুলেন। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা সর্বত্র তিনি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া বেড়ান। হতাশাগ্রস্ত, অধঃপতিত জাতির মনে তিনি নব আশার মুকুল ফোটাইয়া দেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী, কাঙাল ভারতবাসী তোমার ভাই"। "ভুলিও না

স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় জাগরণ

ভারতই তোমার শৈশবের শিশু শয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী"। স্বদেশবাসীকে তিনি তিরস্কার করিয়া বলেন যে, "আমরা বেদান্তবাদী বা পুরাণবাদী নই, আমরা আজ কেবলমাত্র অস্পৃশ্যতাবাদী"। "আমাদের ধর্ম কেবল রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে"। তিনি কঠোর ভাষায় অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের নিন্দা করেন। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীজী জাতিকে কর্মশক্তিতে, তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিতে বলেন। "খালি পেটে ধর্ম হয় না"। সুতরাং জাতিকে "ক্ষাত্র বীর্য ও ব্রহ্মতেজে" উদ্দীপ্ত হইবার জন্য স্বামীজী ডাক দেন। কর্মশক্তি ও ভাবশক্তির দ্বারা ভারতমাতার মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জনা স্বামীজী আহবান জানান। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সহিত ভারতের আধ্যাত্মের সমন্বয়ের কথা তিনি বলেন। গ্রাম্য কুসংস্কার অথবা ইংরাজীয়ানার মোহ ছাড়িয়া ভারতবাসীকে আপন গৌরব ঐশ্বর্যে দাঁড়াইবার জন্য তিনি ডাক দেন। যুবশক্তিকে শরীর গঠন ও চরিত্র গঠনের জনা স্বামীজী উদাত্ত আহবান দেন। হাতের পেশী লোহার, শিরা ইস্পাতের, মনের জোর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করার জন্য স্বামীজী বলেন। চতুর্থতঃ, স্বামীজী ধর্মীয় গোঁড়ামি বাদ দিয়া রামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের উপর জোর দেন। "যত মত তত পথ"ই একমাত্র সত্য। পঞ্চমতঃ, মানব সেবাই পরম ধর্ম। জীবের মধ্যেই শিব বা ভগবান আছেন। এই সত্য উপলব্ধির জন্য তিনি বার বার বলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে সমাজ সেবা, শিক্ষা বিস্তার, দরিদ্র সেবার কাজে তিনি নিয়োজিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি, উদ্দীপনাময়ী বাণী অধঃপতিত জাতিকে জাগাইয়া তুলে। নব ভারতের ভিত্তি স্বামীজীর হাতেই স্থাপিত হয়।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি (The Theosophical Society)ঃ মাদাম ব্লাটাভস্কি ও কর্ণেল অলকট মাদ্রাজের আদিয়ারে সমুদ্রতীরে ১৮৬৬ খ্রীঃ থিওজফিক্যাল সোসাইটি নামক এক সংস্থা স্থাপন করেন। মিসেস অ্যানি বেশান্ত এই সম্প্রদায়ে যোগ দিবার পর ইহার বিস্তৃতি ঘটে। থিওজফিক্যাল সোসাইটি হিন্দু ধর্মের জাগরণের জন্য চেষ্টা চালায়। মিসেস বেশান্ত বলেন যে, ভারতীয়গণ তাহাদের নিজ ধর্ম ও সভ্যতার প্রকৃত অনুশীলনের দ্বারা সার্থকতা লাভ করিবে। মিসেস বেশান্ত বারানসীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। কালক্রমে ইহা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।



এ্যানি বেশান্ত

উনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন (The Social Reform Movements of the 19th Century)ঃ ভারতবর্ষে ধর্মের সহিত সমাজ ব্যবস্থার ওতপ্রোত সম্পর্ক দেখা যায়। উনবিংশ শতকের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সমাজে আধুনিক সংস্কারের হাওয়া ঢুকে। মধ্যযুগীয় জড়তা, কুসংস্কার ও অনাচার কাটাইয়া ভারতীয় সমাজ আবার নূতন প্রাণশক্তি ফিরিয়া পায়।

আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম সমাজ সংস্কারের কাজে আগাইয়া আসেন। নিন্দুকের নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া, রক্ষণশীলগণের ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন গঠন করেন কালক্রমে তাহা হিন্দু সমাজের মরা গাঙে বান ডাকাইয়া দেয়। রাজা রামমোহন নারী জাতির মুক্তির জন্য বিশেষ যত্নবান হন। সতীদাহ নামে এক কুপ্রথা অনুযায়ী হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবাকে স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারা হইত। ইহার নাম ছিল 'সহমরণ প্রথা'। কোন কোন ক্ষেত্রে সদ্য বিধবা ইচ্ছা পূর্বক সতী হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংস্কারবশতঃ বা সম্পত্তির লোভে বিধবাকে মৃত স্বামীর সহিত জীবন্ত দাহ করা হইত। এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করিবার জন্য রাজা রামমোহন আগাইয়া আসেন। তিনি শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। রামমোহন সংবাদ কৌমুদি নামক পত্রিকার সাহায্যে সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। তিনি দেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন দ্বারা বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংককে সতীদাহ নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। এই আবেদনের দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী ছিলেন রাজা রামমোহন। টাকীর রাজা কালীনাথ রায় ছিলেন প্রথম স্বাক্ষরকারী। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক ১৮২৯ খ্রীঃ ১৭ নং রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৮০০ জন হিন্দুর স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন-পত্র বিলাতে পাঠান। কিন্তু রামমোহন বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের নিকট সতীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক দেখাইলে বেণ্টিঙ্কের আদেশ বহাল থাকে। রামমোহন কৌলিন্য প্রথা, বাল্য বিবাহ নিরোধ ও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের জন্যও চেষ্টা চালান। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা, জুরী প্রথার প্রচলন ও রায়তগণের উপর নিপীড়ন বন্ধ করার দাবী জানান। শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম সংস্কারের জন্য তাঁহার কাজ আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে (পৃঃ ৬৩ দেখ)।

রামমোহনের সমাজ সংস্কার

রামমোহনের পর পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু সমাজে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঘোর সমালোচনা চালায়। নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল দল হাতে-কলমে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ভাঙিতে আগাইয়া আসে (পৃঃ ৫৯ দেখ)। ইহার ফলে হিন্দু সমাজে চেতনার সঞ্চার হয়। কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ প্রভৃতি লোপ পায়। ব্রাহ্ম সমাজ এই সকল সংস্কারের জন্য বিশেষ অগ্রগামী ভূমিকা নেয়। কেশবচন্দ্র ও অন্য সংস্কারকগণের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ খ্রীঃ ভারতীয় বিবাহ বিধি আইন পাশ হয়। ইহা দ্বারা বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হয়।

ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্যবঙ্গ দলের সমাজ সংস্কার

তাছাড়া অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্ম সমাজ এছাড়া নিজ সম্প্রদায়ের সভ্যগণের পরিবারে বাল্য বিবাহ, সুরাপান নিষিদ্ধ করে। ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদ প্রথায় আঘাত করে। তাছাড়া পর্দা প্রথা রদ ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মগণ চেষ্টা চালান। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে নারী মুক্তি আন্দোলন ব্যাপকতা পায়। মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজও অনুরূপ কাজ করে। শিক্ষিত হিন্দুগণ সুরাপান নিবারণী সমিতি গঠন করেন।[১]

আর্য সমাজের সংস্কার

আর্য সমাজও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। স্বামী দয়ানন্দ শিক্ষা বিস্তার ও স্ত্রী শিক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব দেন। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে তীব্র আক্রমণ করেন এবং শুদ্ধি আন্দোলনের দ্বারা অহিন্দু বা হিন্দু ধর্ম হইতে অন্য ধর্মান্তরিতগণের হিন্দু সমাজে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করেন। দয়ানন্দের শুদ্ধি আন্দোলন উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী ও জাতিভেদ প্রথায় কুঠারাঘাত করে।

পার্শী সমাজের সংস্কার

বোম্বাইয়ের পার্শী সংস্কারক মালাবারি (Malabari) শিশু বয়সে পুত্র-কন্যার বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চালান এবং জনমত গঠন করেন। ইহার ফলে লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৯১ খ্রীঃ সম্মতির বয়স আইন বা Age of Consent Act পাশ করেন। ইহাতে বলা হয় যে, ১২ বৎসরের নীচে কাহারও বিবাহ দান বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে। পরে বয়স বাড়াইয়া বিবাহের বয়স কন্যাদের পক্ষে ১৪ বৎসর ও পাত্রদের পক্ষে ১৮ বৎসর করা হয়। রক্ষণশীল সমাজ ইহার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাইলেও কোন ফল হয় নাই।

বিদ্যাসাগর ও বিধবা বিবাহ আন্দোলন

সমাজ সংস্কারের আর একটি দিক ছিল বিধবা বিবাহ আন্দোলন। হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের দরুণ সমাজে দুর্দশার একশেষ হয়। কুলীন ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বহু পত্নী গ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বালিকা বধুগণ বিধবা হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেন। বয়স্ক লোকেরা বালিকা কন্যাগণের পানিগ্রহণ করিয়া বার্দ্ধক্য বশতঃ মৃত্যুমুখে পড়িলে অল্প বয়স্কা বিধবাগণ ভরণ-পোষণহীন হইয়া নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতেন। হিন্দু সমাজের বিধবাগণের তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া পথ ছিল না।

আলিবর্দীর দেওয়ান রাজবল্লভ, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উদারচিত্ত লোকেরা হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ দানের জন্য চেষ্টা করেন। ঊনবিংশ শতকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজের সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে জনমত গঠন করেন। তিনি পরাশর সংহিতা হইতে প্রমাণ করেন যে হিন্দু শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের অনুমোদন দেওয়া আছে।[২] পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাবে লর্ড ক্যানিং

১. সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র।

২. "নষ্টে, মৃতে, প্রব্রজিতে
ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ;
পঞ্চাপৎ স্থ নারীনাং
পতিরন্যো বিধীয়তে।"

১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র হাতে-কলমে এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে জনৈকা বিধবা পৌত্রীর সহিত বিবাহ দেন। মহারাষ্ট্রে বিষ্ণু শাস্ত্রী প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন চালান। মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে এই বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশেও বিধবা বিবাহ সমিতি স্থাপিত হয়।


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাহাদের অবরোধ বা পর্দা প্রথা হইতে মুক্ত করার জন্য ঊনবিংশ শতকে চেষ্টা চলে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে পর্দা প্রথা ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। ব্রাহ্ম নারীগণ ক্রমে বিদ্যালয়, সভা, সমিতিতে যাতায়াত করিবার অধিকার পান। এই অধিকার ক্রমে হিন্দু পরিবারের নারীগণও লাভ করে। নারী শিক্ষার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। বেথুন কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে হিন্দু সমাজে স্ত্রী শিক্ষা আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। নারীগণ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজেও পাঠ করার অধিকার পান। বড়লাটের পত্নী লেডী ডাফরিন নারীগণকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেন। ক্রমে ভারতীয় নারীগণ ভোটাধিকার লাভের জন্যও দাবী জানান। ১৯১৭ খ্রীঃ একটি নারী প্রতিনিধিদল মাদ্রাজে ভারত সচিব মণ্টেগুর সহিত এজন্য সাক্ষাৎ করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে নারীগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

নারী মুক্তি ও স্ত্রী শিক্ষা

ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও আদিবাসীগণের উন্নয়নের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সংস্কারগণ চেষ্টা করিলেও ইহাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজে এমনই শিকড় গাড়িয়া বসে যে তাহাকে দূর করা সহজ কাজ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু ধর্মের অঙ্গ মনে করিয়া উচ্চবর্ণের লোকেরা তাহা আঁকড়াইয়া থাকে। এদিকে চতুর ইংরাজ সরকার ইহার সুযোগ লইয়া ভেদনীতি দ্বারা উচ্চবর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণের বিভেদ ঘটাইয়া ভারতের জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করিবার চেষ্টা করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অস্পৃশ্যতাকে ধিক্কার জানাইলেও কোন ফল হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী হরিজন আন্দোলন দ্বারা ভারতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ক্রমে শিক্ষার প্রসারের সহিত জাতিভেদের তীব্রতা কমিলেও ভারতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এখনও দেখা যায়।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলন

নবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতের মুসলমান সমাজেও ঢেউ তুলে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের চেষ্টায় আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সমাজে আধুনিক ভাবধারা ঢুকে। খোদাবকস প্রভৃতি সমাজসেবীগণও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিকতা ও যুক্তিবাদ প্রচার করেন। আঞ্জুমান সমিতি ও আহমদীয় আন্দোলন মুসলিম সমাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে।

মুসলিম সমাজে আন্দোলন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের বিকাশ

(Beginning of New Literature)

উনবিংশ শতকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ ও তাহার কারণ (The beginning of new Bengali and Indian literature in the 19th century and factors contributing to it) ঃ বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রথম বিকাশ পালযুগে চর্যাপদের মধ্যে দেখা যায়। তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী এবং মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা কাব্যানুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিকশিত হয়। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহার বিকাশ উনবিংশ শতকের আগে লক্ষ্য করা যায় না। উনবিংশ শতকের আগে বাংলা কাব্য ছন্দের বাঁধনে এমনই বাঁধা ছিল যে, ভাব ও ভাষা ছন্দের বাঁধনে মারা পড়িত। পয়ার, ত্রিপদী, লাছাড়ী ছন্দে কবিতা বাঁধিবার নিয়ম ছিল। বাংলা গদ্যের তেমন কোন স্পষ্ট রূপ ছিল না। বাংলা ভাষা ছিল উৎকট সংস্কৃতময়।

পুরাতনপন্থী গতিহীন বাংলা সাহিত্য

উনবিংশ শতকে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে যেরূপ স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তা জাগে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব দেখা যায়। বঙ্গ সরস্বতীকে কয়েকটি মাত্র বাঁধা ছন্দের বাঁধন-মুক্ত করিয়া, ভাষাকে ভাবের বাহন করিয়া, কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আঙিনায় আনিয়া সাহিত্যের বদ্ধ জলায় নূতন প্রবাহ সঞ্চার করা হয়। সৎ সাহিত্য ব্যতীত জাতির জাগরণ সফল হয় না। কারণ সাহিত্যের মাধ্যমেই নূতন ভাব জাতির প্রাণ কেন্দ্রে সঞ্চারিত হয়। উনবিংশ শতকে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে নব্য বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজাইবার কাজে হাত দেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বাংলা সনেট রচনা করেন। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র নব বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি বঙ্গ ভারতীর আঙিনায় সাহিত্য সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়। তৃতীয়তঃ, ছাপাখানা স্থাপনের ফলে সহজে বই ছাপিবার ব্যবস্থা হইলে বাংলা সাহিত্যের প্রচার সহজতর হয়।

বাংলা সাহিত্যে নবযুগ

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে উইলিয়াম কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ প্রথমে বাংলা গদ্য রচনার কাজে হাত দেন। তাঁহারা বাইবেলের বাংলা অনুবাদ দ্বারা বাংলা গদ্য রচনার পথ দেখান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও উইলিয়াম কেরী প্রভৃতি শিক্ষকেরা (১৮০০ খ্রীঃ) কয়েকটি বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। রামরাম বসু প্রভৃতি পণ্ডিত বাংলায় রাণা প্রতাপাদিত্যের জীবনী রচনা করেন। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ধর্মমত ও সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে মত প্রচারের জন্য যে পুস্তিকাগুলি রচনা করেন, তাহাতে বাংলা গদ্য বিশেষ একটি রূপ পায়। এই দিক হইতে রাজা রামমোহনকে বাংলা গদ্য রীতির স্রষ্টা বলা যায়। তিনি বাংলায় কয়েকটি ব্রহ্ম সঙ্গীতও রচনা করেন। রাজা রামমোহনের ভাষা ছিল গুরুগম্ভীর ও উৎকট। তবুও তিনি বাংলা গদ্য রীতির প্রথম পথ দেখান ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলায় প্রবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত করেন। তাঁহার গদ্যরীতি ছিল উৎকৃষ্ট। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম গদ্য সাহিত্যে কলা-নৈপুণ্যের পথ দেখান। গদ্যকে তিনি সাহিত্যের দরবারে স্থাপন করেন। তাঁহার আগে বাংলা গদ্যের শ্রী ও ছন্দ ছিল না। তিনি ইহাকে লালিত্য, শ্রুতিমাধুর্য ও ছন্দ দান করেন। গদ্যেরও যে একটি ছন্দ আছে বিদ্যাসাগর তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে গতিময় ও ভাব প্রকাশের বাহনে পরিণত করেন। বাংলা গদ্যের জড়তা দূর করিয়া তিনি অসাধ্য সাধন করেন। শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি রচনা বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অক্ষয় কীর্তি বহন করিতেছে। তাছাড়া বাংলা ভাষা যাহাতে সহজে শেখা যায় এজন্য সুকুমারমতি শিশুদের কথা ভাবিয়া তিনি বর্ণ পরিচয় ও বোধোদয় রচনা করেন। ফলে সর্বসাধারণের পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষা সহজ হয়।

বাংলা গদ্য সাহিত্য রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজ নারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি বাংলা গদ্য রচনা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে কথ্য ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" নামে এক রচনা দ্বারা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের সহিত সর্ব সাধারণের সংযোগ স্থাপিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা। তাঁহার হাতেই বাংলা গদ্যের জয়যাত্রা ঘটে। গদ্য কেবলমাত্র তথ্যের বাহন না হইয়া ইহা যে রস ও কাব্য সৃষ্টি করিতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রই তাহা সর্বপ্রথম দেখান। সংস্কৃত প্রভাব-মুক্ত হইয়া বাংলা গদ্যের হাল্কা ছিপ নৌকা বঙ্কিমের হাতে তরতর করিয়া বহিয়া চলে। বঙ্কিমের গদ্যের ছটা, ভাব, রস ও মাধুর্য পাঠকগণকে মোহিত করে। পুরাতনপন্থী সংস্কৃতবাগীশগণ বঙ্কিমের সাহিত্য গোষ্ঠীকে "শবপোড়া মড়াদাহের দল" বলিলে, বঙ্কিম "ভট্টাচার্যের চানা" বলিয়া সংস্কৃতপন্থী গদ্য রীতির সমালোচনা করেন। দুর্গেশ-

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য

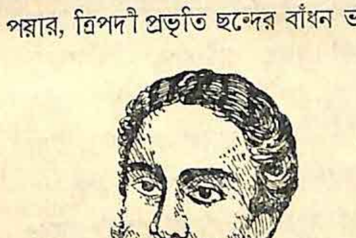
নন্দিনীতে বঙ্কিম যে গদ্য রীতি আরম্ভ করেন, রজনী ও কমলাকান্তের দপ্তরে তাহা পূর্ণতা পায়। বঙ্কিম বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নূতন যুগের সূচনা করেন। কৃষ্ণচরিত্র, বিবিধ প্রবন্ধ, কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করিয়া ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে তিনি কাব্য-ধর্মী বাংলা সাহিত্যকে প্রবন্ধ সাহিত্যের দ্বারা সমৃদ্ধশালী করেন। বঙ্কিমকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী বাংলা ভাষায় নবযুগ সৃষ্টি করে। রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার, হরপ্রসাদ, দীনবন্ধু প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে ফুলে ফলে ভরাইয়া দেন। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথও বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যকে তাঁহার স্বর্ণ লেখনীর ছোঁয়ায় নূতন রূপ দেন। এইভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কাব্য সাহিত্য

বাংলা কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা কাব্য ভারতচন্দ্রের প্রভাবে মধ্যযুগীয় ভাব ধারায় আচ্ছন্ন ছিল। ইহার পর মধুকবি মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলা কাব্য জগতে বিপ্লব ঘটায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করিয়া মধুসূদন বাংলা কবিতার বন্ধ জলায় নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত করেন। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের বাঁধন ভাঙিয়া মধুসূদন কাব্য সরস্বতীকে অমিত্রাক্ষর ও নানা ছন্দের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ব্রজাঙ্গনা ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যদ্বয় লিখিয়া অক্ষয় যশ লাভ করেন। মধুসূদনের পাশাপাশি কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার কাব্যের দ্বারা বঙ্গ ভারতীর আঙিনায় মঙ্গলদীপ জ্বালাইয়া দেন। মধুসূদন যে নূতন কাব্য রীতি চালু করেন তাহা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের হাতে আরও পূর্ণতা লাভ করে। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ নামক দেশ-প্রেমমূলক গ্রন্থের দ্বারা দেশবাসীকে মাতাইয়া দেন। তাঁহার রৈবতক কাব্যগ্রন্থে কবি নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারত বা ভারত রাষ্ট্রের স্থাপয়িতা বলিয়া বর্ণনা করেন। বিহারীলাল তাঁহার গীতি কবিতায় মানুষের ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনার কথা বলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আগমনে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আরম্ভ



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হয়। কবিগুরু তাঁহার গান ও কাব্যে ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করেন। উপনিষদের শাশ্বতবাণী, মানব মনের বিচিত্র ভাবলীলা, প্রকৃতির রূপ, মানুষের একতা তাঁহার কাব্যে পূর্ণতা পায়। তাঁহার হাতে বাংলা কাব্য বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সম্মানিত আসন পায়। তাঁহার কাব্য গ্রন্থ গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়া রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সম্মান কুড়াইয়া ভারতে আনেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি বাংলা কাব্যকে নূতন খাতে বহাইবার চেষ্টা করেন।

বাংলা উপন্যাস

বাংলা উপন্যাস ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রকেই বাংলা উপন্যাসের পথ-প্রদর্শক বলা যায়। প্রাত্যহিক ক্লেদাক্ত জীবনের উর্ধ্বে অনির্বচনীয়ের স্বাদ তাঁহার উপন্যাসে লাভ করা যায়। কপালকুণ্ডলার কাব্যধর্মী উপন্যাস হইতে বঙ্কিম তাঁহার লেখনীর যাদুদণ্ডে বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে সমাজ জীবনকে এক মায়াময় আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। আনন্দমঠের স্বদেশ মন্ত্র ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত জাতিকে নব প্রেরণায় ভরাইয়া দিয়াছে। শরৎচন্দ্র তাঁহার লেখনীতে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলিকে মানবিকতা ও হৃদয় দিয়া বিচার করিয়া বাংলা সাহিত্যকে বাস্তবের পটভূমিতে নামাইয়া আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করিয়াছে।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা নাটক

বাংলা নাটকের সূত্রপাত মাইকেল মধুসূদনের হাতে হইলেও, গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের ডালি ফুলে ফলে সাজাইয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি দ্বারা, ক্ষীরোদ প্রসাদ তাঁহার পৌরাণিক নাটক দ্বারা ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন ধরণের গীতি নাট্য দ্বারা বাংলা সাহিত্যের নূতন দিক উন্মোচন করেন।

বাংলা সংবাদপত্র

সর্বশেষে, বাংলা সংবাদ সাহিত্যের কথা না বলিলে নূতন সাহিত্যের চিত্র অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর ছিল একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার উপর কটাক্ষমূলক লেখার প্রচলন করেন। ঈশ্বর গুপ্ত নব্যবঙ্গবাদীগণের ইংরাজীয়ানার বিশেষ সমালোচনা করিয়া ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। কলিকাতার দুর্দশার জন্য তাঁহার "রেতে মশা দিনে মাছি ; এই নিয়ে কলিকাতায় আছি" বিশেষ-বিখ্যাত। তিনিই ছিলেন বাঙালীর প্রথম স্বদেশপ্রেমের কবি। তাঁহার রচিত

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে ; দেখ দেশবাসীগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া, কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" বাঙালীর অতি পরিচিত পদ। রামমোহনের পত্রিকা সংবাদ কৌমুদী ও তাঁহার বিরোধী পক্ষের পত্রিকা সমাচার চন্দ্রিকা বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। এই পত্রিকাগুলির দ্বারাই বাংলা সাংবাদিকতা আরম্ভ হয়। ক্রমে দিগ্‌দর্শন, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাংবাদিকতা প্রতিষ্ঠা পায়। এইভাবে নবজাগ্রত ভারতের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী প্রদেশ বাংলার সাহিত্য বিকশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যও বিকাশ লাভ করে। সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার বিকাশ হয়।

অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ গিলক্রিষ্ট ঊনবিংশ শতকে হিন্দী সাহিত্যের কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণও হিন্দী ভাষায় বাইবেল ছাপেন। হিন্দী লেখক পদ্মাকর ভট্টের জগৎ বিনোদ আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। ভারতেন্দু আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম বিখ্যাত কবি। নিরালাজী ও মৈথিলী কবি ভানুনাথ ঝা প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ বিখ্যাত।

হিন্দী

উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে মির্জা গালিব, জাফি, আনিশ, হুসেন আলি, মহম্মদ ইকবাল নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। মহম্মদ ইকবালকে 'ভারতের বুলবুল' বলা হয়। তাঁহার রচিত "সারে জাঁহে সে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামেরা" অতি বিখ্যাত গীত।

উর্দু

মারাঠী ভাষায় বিষ্ণু শাস্ত্রী মারাঠা গদ্য সাহিত্যের পথ দেখান। গুজরাটী সাহিত্যে পণ্ডিত দয়ারামের নাম উল্লেখ্য। এই দুই সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে লালিত হয়। এছাড়া তামিল, তেলেগু ও মালয়ালী সাহিত্যেও বিশেষ বিকাশ ঘটে। তামিল লেখক চান্দু মেননের ইন্দুলেখা উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের আদলে রচিত হয়। তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী কাব্য রচনায় বিশেষ খ্যাতি পান। তেলেগু সাহিত্যিক পোন্দনও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। উড়িয়া সাহিত্যে ফকিরমোহন সেনাপতি ও মধুসূদন রাও, কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহীর নামও উল্লেখযোগ্য।

মারাঠী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংবাদপত্রের বিকাশ

(Beginning of the Press)

সংবাদপত্রের ভূমিকা ও বাংলাদেশে সংবাদপত্রের অবদান (Influence of the Press) ঃ ভারতবাসীগণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকে ভারতে ছাপাখানা

বা মুদ্রনযন্ত্রের প্রচলন বাড়ে। ছাপাখানায় সংবাদপত্র সস্তাদরে ছাপা হইয়া জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হইবার সুযোগ বাড়ে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারের কার্যকলাপ ও নীতি সম্পর্কে সংবাদ লোকে জানিতে পারে। দেশের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন নেতাগণের মতামত সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অগাষ্টাস হিকি নামক জনৈক স্বাধীনচেতা ইংরাজ ১৭৮০ খ্রীঃ বেঙ্গল গেজেট নামক এক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া কোম্পানীর কর্তা-ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত কুৎসা ও কলিকাতার স্থানীয় সংবাদ প্রকাশ করেন। হিকির সংবাদপত্রে ব্যক্তিগত কুৎসা থাকিলেও তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের যে দৃষ্টান্ত দেখান তাহা পরে বহু সাংবাদিককে প্রভাবিত করে। ১৭৮০-৯৩ খ্রীঃ মধ্যে আরও ছয়টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বোম্বাইয়ে বোম্বাই হেরাল্ড ও মাদ্রাজে মাদ্রাজ কুরিয়ার প্রকাশিত হয়।

মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র বেঙ্গলগোষ্ঠী

ইংরাজী সংবাদপত্রের অনুকরণে ক্রমে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ফলে সর্ব-সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সহজ হয়। মার্শম্যান সর্বপ্রথম দিগ্‌দর্শন নামে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইলে বাংলা সংবাদপত্রের জগতে নব যুগের সৃষ্টি হয়। মার্শ-ম্যান এই পত্রিকাটিরও সম্পাদনা করেন। এই সংবাদপত্র স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও উদার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের প্রিয় হয়। রাজা রামমোহনের প্রেরণায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সংবাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়। সংবাদ কৌমুদীতে রামমোহন তাঁহার ধর্ম ও সামাজিক চিন্তা প্রচার করেন। রামমোহনের বিরোধী দল ইহার প্রতিবাদে সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ করে। এই দুই পত্রিকা বাংলাদেশে নবযুগের ভাবধারা লইয়া বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দেয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ হরিশচন্দ্র মুখার্জীর ইংরাজী পত্রিকা হিন্দু পেট্রিয়ট ভারতীয় সাংবাদিকতার এক উচ্চ মান সৃষ্টি করে। হিন্দু পেট্রিয়টের নির্ভীক সমালোচনা ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সরকারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নীল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু পেট্রিয়ট নির্ভীকভাবে সরকারী নীতির সমালোচনা করে। ইহা পড়িয়া লোকে রাজনীতি সচেতন হয়।

সমাচার দর্পণ হিন্দুগোষ্ঠী

গুজরাট দৈনিক, বোম্বাই সমাচার, দিল্লীর উর্দু পত্রিকা সৈয়দ-উল-আখবর ও বোম্বাইয়ের ইংরাজী পত্রিকা বোম্বে টাইমস প্রভৃতি পত্রিকা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নির্ভীক সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বোম্বাই টাইমস পত্রিকা পরে বিখ্যাত টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ ভারতে দেশীয় ভাষায় মোট ১৬৯টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

বাংলার বাহিরে সংবাদপত্রের ভূমিকা

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা চালাইলে কোম্পানী ১৮২৩ খ্রীঃ সংবাদপত্র আইন দ্বারা সংবাদপত্রগুলিকে দমন করার চেষ্টা করেন। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল এ্যাডামস সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন জারী করেন। রাজা রামমোহন ইহার প্রতিবাদে সুপ্রীম কোর্ট ও ইংলণ্ডের রাজার নিকট আবেদন পাঠান। রামমোহনের এই

সরকারী সংবাদপত্র দমন: রামমোহনের প্রতিবাদ

আন্দোলনকে ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়। পরে স্যার চার্লস মেটকাফ ১৮৩৫ খ্রীঃ সংবাদপত্রের উপর দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করেন। এই কারণে স্যার চার্লস মেটকাফকে "ভারতীয় সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা" বলিয়া অভিনন্দিত করা হয়। এইভাবে ভারতে স্বাধীন সাংবাদিকতার সূচনা হয়।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ভারতে সংবাদপত্রের কয়েকটি সুস্পষ্ট ভাগ দেখা যায়, যথা—(১) ইংরাজ মালিকানায় ইংরাজী সংবাদপত্র। ইহাদের নাম ছিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস। (২) ভারতীয় মালিকানায় ইংরাজী সংবাদপত্র। (৩) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র। প্রথমোক্ত সংবাদপত্রগুলি ছিল উন্নাসিক ও ভারতীয়গণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিহীন ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধী। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের মধ্যে মার্শম্যান প্রতিষ্ঠিত ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ও নাইট প্রতিষ্ঠিত ষ্টেটসম্যান একত্রে যুক্ত হইয়া ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় পরিণত হয়। কলিকাতায় ইংরাজ সমাজের মুখপত্র ছিল ইংলিশ-ম্যান। ইহা ছিল উন্নাসিক জাতীয়তা বিরোধী পত্রিকা। লাহোরের সিভিল ও মিলিটারী গেজেট, এলাহাবাদের পাইওনিয়ারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ করিত এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে নির্ভীক মতামত পরিবেশন করিত। এইদিক হইতে ইংরাজী পত্রিকা হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের মধ্যে গুজরাঠী রাশগোপ্তা, শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়ের বেঙ্গলী, বোম্বে টাইমস-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ইংরাজী পত্রিকার মধ্যে কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা, মাদ্রাজের হিন্দু, বোম্বাইয়ের বোম্বে টাইমস জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

দেশীয় মালিকানায় ইংরাজী সংবাদপত্র

সর্বশেষে বাংলা সংবাদপত্রের আরও অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা দরকার। কলিকাতায় যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ম্যাৎসিনী ও গ্যারীবল্ডীর ভাবধারা তাঁহার আর্যদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে ছড়ান। সোমপ্রকাশ, সাধারণী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকাগুলি জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। বাংলার বাহিরে মারাঠী পত্রিকা কেশরীর নামও এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সংবাদপত্র

লর্ড লিটন ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য ১৮৭৮ খ্রীঃ দেশীয় সংবাদপত্র আইন পাশ করিলে ইহার বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে নেতৃত্ব দিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে জাগান।

লিটনের সংবাদপত্র দমন

9798

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

(Development of Transport and Communication)

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি (Development of Transport and Communication) : ভারতবর্ষ হইল একটি বিশাল দেশ। ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ হইল ভারতীয় ইতিহাসের চিরন্তন সত্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সম্রাটগণ রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগসূত্র রচনা করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুযোগ বাড়িলে ভারতীয় ঐক্য বলবতী হয়। অশোকের যুগে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করা হয়; শের শাহের আমলে বড় বড় রাস্তা ও সরাইখানা নির্মাণের কথা জানা যায়। মুঘল যুগে রাজপথে মুঘল সেনাগণ যাতায়াত করিত। ইহা আবুল ফজলের রচনা হইতে পাওয়া যায়।

ইংরাজ-পূর্ব যুগে ভারতীয় পরিবহন

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই সকল জাতীয় রাজপথ রক্ষার দিকে কোম্পানী গোড়ার দিকে নজর দেয় নাই। কোম্পানী তাহার মুনাফা বৃদ্ধির কাজে এমনই ব্যস্ত থাকে যে, পরিবহন ও যোগাযোগের জন্য বড় বড় সড়কগুলিকে সংস্কারের অর্থ ব্যয় করিতে অনিচ্ছা দেখায়। বিভিন্ন প্রদেশে কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্গ ও সেনা ছাউনী তৈয়ারী হইলেও জনসাধারণের উপকারের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে অবহেলা দেখান হয়। ফলে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রধান রাজপথগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বাধা পায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঔদাসীন্য

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সর্বপ্রথম অন্তর্দেশীয় যোগাযোগের উন্নতির জন্য কাজ করেন। তিনি কলিকাতার সহিত উত্তরপ্রদেশের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের আদেশ দেন। উত্তরপ্রদেশের ছোটলাট টমসন এই কাজ সুসম্পন্ন করেন। তাছাড়া তিনি কলিকাতার সহিত আসামের নদীপথে সংযোগের জন্য ষ্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ক্রমে রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য একটি সরকারি বিভাগ স্থাপিত হয়। লর্ড ডালহৌসী বড়লাট হইবার পর অন্তর্দেশীয় পরিবহন ও যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। ডালহৌসীর রেলপথ নির্মাণ ও পরিবহন নীতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরায় রচনা করে। তিনি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইহা করিলেও, পরোক্ষভাবে তাহাতে দেশবাসী উপকৃত হয়।

বেণ্টিঙ্ক ও ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসী প্রতি প্রদেশে রাস্তাঘাট নির্মাণের দায়িত্ব সামরিক বোর্ডের হাতে

দেন। তিনি কেন্দ্রীয় পাবলিক ওয়ার্কস দপ্তর স্থাপন করেন। ইহার অধীনে বোম্বাই ও মাদ্রাজে সহকারী দপ্তর স্থাপন করিয়া রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও সেচের কাজ এই দপ্তরের হাতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে রাস্তাঘাটের উন্নতি ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে রাস্তাঘাট নির্মাণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করেন। ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার আইনে বলা হয় যে, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে। এই কাজ করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব হইতে ব্যয় করা হইবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাস্তা তৈয়ারীর জন্য নিয়মিত বরাদ্দ করে। ইহার ফলে নিয়মিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত হইবার ব্যবস্থা হয়।

ডালহৌসীর রেলপথ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ নীতি

ভারতের পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতির ক্ষেত্রে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের মধ্যে দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে আছে। লর্ড ডালহৌসী সর্বপ্রথম ভারতে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ করেন। ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করিয়া গরুর গাড়ীর যুগ হইতে ভারতে বাষ্পীয় যানের যুগ প্রবর্তনের জন্য তাঁহার অবদান স্মরণীয়।

রেলপথের গুরুত্ব

(১) ভারতীয় রেলপথগুলি প্রথমে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর সাহায্যে নির্মাণ করা আরম্ভ হয়। এই কোম্পানীগুলি ছিল বিলাতী। এই বিলাতী কোম্পানীগুলি ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য যে মূলধন নিয়োগ করে তাহার উপর সরকার শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলে ইহারা ভারতে রেলপথ নির্মাণের কাজে হাত দেয়। (২) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই কোম্পানীগুলিকে উঠাইয়া দিয়া নিজ হাতে রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব নেয়। সরকারী রেলপথ বিভাগ এই সময়ে সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও উত্তর বাংলার দুর্গম অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করে। (৩) সরকার রেলপথ নিমার্ণের দায়িত্ব নিজ হাতে লইলে বিলাতের কোম্পানীগুলির লাভ করার পথ বন্ধ হয়। সুতরাং সরকারের রেলনীতির বিরুদ্ধে এই কোম্পানীগুলি ও মুনাফালোভীগণ তুমুল সমালোচনা করে। ইহার ফলে ইংরাজ সরকার পুনরায় ইংলণ্ডের কোম্পানীগুলিকে ভারতে রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দেন। ইহার ফলে নীলগিরি, দিল্লী-কালকা, বেঙ্গল-সেণ্ট্রাল, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ রেলপথ প্রভৃতি নামে বড় বড় রেল কোম্পানী স্থাপিত হয়। এই কোম্পানীগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করে। এই কোম্পানীগুলি ভারতে রেলপথ নির্মাণ করিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটিয়া নেয়। (৪) বিলাতী কোম্পানীগুলির অতিরিক্ত মুনাফার বিরুদ্ধে ভারতে ও বিলাতে প্রবল সমালোচনা হয়। এ্যাকওয়ার্থ কমিশন সরকারের নিজ হাতে রেলপথ লইবার সুপারিশ করে। ইহার ফলে বিংশ শতকে সরকার প্রধান রেলপথগুলি নিজ হাতে নেন। (বিশদ আলোচনা পৃঃ ১৭০-৭১ দেখ)।

রেলপথ নির্মাণ ও বেসরকারী ইংরাজ মালিকানা

রেলপথ নির্মাণ ছাড়া, লর্ড ডালহৌসী ডাক ও তার বিভাগ গঠন করিয়া দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগের উন্নতি সাধন করেন। লর্ড ডালহৌসী সর্ব সাধারণের সুবিধার জন্য বিলাতের পেনী পোষ্টকার্ডের আদর্শে এক পয়সার পোষ্টকার্ড প্রচলন করেন।

পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন যুগের সূচনা করে। প্রথমতঃ, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় শহরগুলিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক আসিতে পারে। ফলে সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মত বিনিময় ও সংবাদপত্র প্রচারের সুবিধা হয়। তৃতীয়তঃ, সর্বভারতীয় ঐক্য দৃঢ় হয়। চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক চেতনা সর্ব-ভারতীয় স্তরে বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। যাহা নিছক স্থানীয় সমস্যা তাহা স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দেশের অন্যান্য স্থানেও সাড়া জাগায়।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফল

—·—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক সমিতি গঠন

(Beginning of Political Consciousness and Political Associations)

জাতীয় চেতনার উন্মেষ : ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব (Beginning of Political Consciousness : Birth of Indian Nationalism) : অষ্টাদশ শতকে ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতের পুরাতন রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়ে। এই ভাঙনের কাহিনী প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে উনবিংশ শতকে নব ভারতের উদ্ভব হয়। গ্রীক পুরাণে ফিনিক্স (Phoenix) নামক এক প্রকার পক্ষীর কথা পাওয়া যায়। এই পক্ষী আপন বাসায় আপনিই আগুন লাগাইয়া নিজেকে ভস্ম করিত। সেই ভস্মস্তূপ হইতে নূতন ফিনিক্স পক্ষীর জন্ম হইত। ভারতের জাতীয়তাবাদ রূপকথার ফিনিক্স্ পক্ষীর ন্যায় ইংরাজ শাসনের আমলে দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হয়। ভারতের জাতীয়তার আত্মাহুতির ফলে যে ভস্মরাশি ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইতে ফিনিক্সের ন্যায় নব-জাতীয়তাবাদ সহস্র জীবন লইয়া বিকশিত হয়।

উনবিংশ শতকে ভারতে যে নব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে তাহা ছিল অষ্টাদশ শতকের জাতীয়তাবাদ হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। প্রথমতঃ, উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদের প্রধান

মেরুদণ্ড ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অষ্টাদশ শতকের জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাজন্যকুল যথা—মারাঠা পেশবা বা পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ ছিল সর্বভারতীয়। ভারতের ঐক্য ও ভারতমাতার মুক্তি ছিল এই জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য। ভারতবর্ষকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করিয়া দেশবাসী তাঁহার মুক্তির জন্য জীবনপণ করে। অষ্টাদশ শতকের শিখ বা মারাঠা জাতীয়তাবাদ ছিল আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক। ইহাতে সমগ্র ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য চিন্তা তেমন জোরালো ছিল না। তৃতীয়তঃ, ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ ছিল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্দীপ্ত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ইহার প্রবক্তা। অষ্টাদশ শতকের জাতীয়তাবাদ এইরূপ প্রগতিশীল ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইহা শিখ বা মারাঠা রাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। চতুর্থতঃ, ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক চেতনা যেভাবে জনসমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়ে, অষ্টাদশ শতকে ইহা দেখা যায় নাই। ঊনবিংশ শতকের রাজনৈতিক চেতনা গণজাগরণে পরিণত হয়। ভারতের ইতিহাসে ইহার আগে এইরূপ রাজনৈতিক গণজাগরণ দেখা যায় নাই। পঞ্চমতঃ, অষ্টাদশ শতকের শিখ বা মারাঠা জাতীয়তাবাদ ধর্ম আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও ইহার সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি তেমন দৃঢ় ছিল না। অস্ত্রবলের সাহায্যে মারাঠা, শিখ বা রাজপুতগণ স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা সংস্কারের উপর দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হয়। নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইহাকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পরিচালিত করে। অস্ত্রের বদলে যুক্তি, শক্তির বদলে আবেগ, দমনের বিরুদ্ধে ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারা এই নব জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবী এই জাতীয়তাবাদকে নূতন প্রেরণা দেয়। ক্রমে ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে সর্ব-সাধারণের হাতে চলিয়া যায়।

উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য

ঊনবিংশ শতকে ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ প্রথম বাংলাদেশে ঘটে। ক্রমে তাহা ভারতের অন্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ডাঃ কালীকিঙ্কর দত্তের মতে, ভারতের পশ্চিম গগণে যখন মারাঠা জাতীয়তাবাদের সূর্য ক্ষীণ জ্যোতি হইয়া অস্ত যায়, তখন পূর্ব গগণে বাংলায় নূতন সূর্য নূতন তেজে উদিত হয়।[১]

ঊনবিংশ শতকের এই জাতীয় জাগরণ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ধীরে ধীরে সমাজে এই জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কলিকাতা ও ভারতের প্রধান শহরগুলিতে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই সকল শিক্ষিত লোকেরা ইওরোপের ইতিহাস, সাহিত্য, মিল, বেন্থাম, রুশো ও কাণ্ট প্রভৃতির রচনা পড়িয়া পাশ্চাত্য স্বায়ত্ব শাসনের আদর্শে দীক্ষা পায়। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার

১. "Maharastra went out of the stage and almost immediately Bengal stepped in give a new lead". Dr. K. K. Dutta—Renascent India.

বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া গণতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন সম্পর্কে ইহারা নূতন দৃষ্টি লাভ করে। ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা ছিল যে, তাহারা ভারতের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার ও সরকারী দপ্তরগুলিতে উচ্চ চাকুরী পাইবে। ভারতীয় শিক্ষিতগণের প্রতি ইংরাজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের চোখ খুলিয়া দেয়। ইংরাজ শাসকগণ ভারতীয়গণকে কিভাবে শোষণ করে তাহা শিক্ষিত ভারতবাসীরা বুঝিতে পারে। ইহার ফলে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনগণকে এই বিষয়ে সচেতন করে। (২) ভারতের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় বহু কুসংস্কার ও কুপ্রথা ঢুকিয়া জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। এই সকল কুপ্রথা দূর করিয়া ভারতের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ম্যধ্যমে দেশকে জাগাইবার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেষ্টা করে। রাজা রামমোহন এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। তিনি একদিকে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ভারতে যুক্তিবাদ ও আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া তিনি সমাজে নূতন চিন্তার যে স্রোত সঞ্চার করেন তাহা ক্রমে বেগবতী হয়। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে ধর্ম, সমাজ সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করিয়া মরা গাঙে বান বহাইয়া দেন। (৩) স্বামী বিবেকানন্দ জাতিকে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করেন। পরাধীন, দুর্বল, অধঃপতিত ভারতবাসী যখন পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা নিজেদের হীন মনে করিয়া আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখন স্বামীজী তাহাদের নূতন আশা ও অভয়ের বাণী দেন। তিনি দেশবাসীকে বলেন "ওঠ, জাগো, নিজ প্রাপ্য বুঝিয়া লও"। তিনি হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করিয়া সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেন। তিনি পরাধীন দেশবাসীর নিকট জাতির আধ্যাত্মিক ঐক্য ও ভারতমাতার মুক্তির আদর্শ তুলিয়া ধরেন। যুব সমাজ তাঁহার প্রভাবে নূতন মূল্যবোধ ও আদর্শ খুঁজিয়া পায়। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সভ্যতার ঐশ্বর্য সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণকে সচেতন করেন। (৪) ভারতের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। নির্ভীকভাবে সংবাদ প্রকাশ করিয়া এবং সরকারের নীতির স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমতকে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতীয় নেতাগণের মতামত ও সরকারী কাজের সমালোচনা শহর হইতে গ্রামে, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ছড়াইয়া যায়। ইংরাজী ভাষার সংবাদপত্রগুলি যথা হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, বোম্বে টাইমস্, হিন্দু প্রভৃতি জাতীয়তার জাগরণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র হিসাবে বাংলায় সোম প্রকাশ, সুলভ সমাচার, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, মারাঠী ভাষায় কেশরী, গুজরাটী ভাষায় রাশগোপ্তা, গুজরাটী দপ্তরণ, বাংলায় সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকা সর্বসারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। ইংরাজ সরকার ১৮২৩ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলে জনসাধারণ সংবাদপত্রের

জাতীয়তাবাদের বিকাশের কারণ, স্বাধীনতাকামী সংবাদপত্র প্রভৃতির ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব

সংবাদপত্রের ভূমিকা

গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। রাজা রামমোহন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ জানাইলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় বলা যায়। কারণ সংবাদপত্র ছিল জনমতের প্রতিচ্ছবি। ইহার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন জনমতকে নেতৃত্ব দেন। লর্ড লিটন লক্ষ্য করেন যে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি সরকারী কাজের সমালোচনা করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করিতেছে। এজন্য ১৮৭৮ খ্রীঃ তিনি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র দমন আইন পাশ করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় আন্দোলন গঠন করেন। সুরেন্দ্রনাথের এই আন্দোলন ভারতের জাতীয়তা গঠনে বিশেষ সহায়তা হয়। লর্ড রিপন শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ এই আইন রদ করেন। (৫)

জাতীয় সাহিত্যের প্রভাব

জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ ভারতের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করে। এই জাগরণ বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ হয়। বাংলার নবজাগরণের প্রধান স্তম্ভ ছিল বাংলা সাহিত্য। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার স্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতায় জাতিকে বলেন যে—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

রঙ্গলাল তাঁহার বিখ্যাত গান "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" দ্বারা জাতিকে স্বাধীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি তাঁহাদের লেখনীর দ্বারা জাতীয়তার ভাবধারা প্রচার করেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ পলাশীর যুদ্ধে পলাশীর পরাজয়ের পর মোহনলালের খেদোক্তি বাঙালীর হৃদয়কে মথিত করে।

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ
বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমনি
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
আসিবে ভারতে পুনঃ বিষাদ রজনী।"

সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে সর্বত্যাগী স্বামী সত্যানন্দের ভারতমাতাকে মাতৃরূপে কল্পনা ও 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত জাতিকে আবেগ সিঞ্চিত করে। "আনন্দমঠ উপন্যাসকে স্বাধীনতা সংগ্রামীগণের বাইবেল" বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি উপন্যাস দ্বারা অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। বঙ্কিম সাধারণী পত্রিকায় লেখেন, "যতদিন আমরা ইংরাজের সমতুল্য না হই, ততদিন আমাদের মধ্যে যেন জাতি বৈর ভাব এমনই প্রবল থাকে।"[১] রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সাহিত্যের দ্বারা জাতিকে জাগাইয়া তুলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গোরা উপন্যাসে গোরার মুখ দিয়া ভারতের তপোবনের সভ্যতার প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করেন। আত্মবিস্মৃত জাতিকে তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করিতে বলেন। নিজ দেশের সভ্যতার

১. যোগেশ চন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত।

তুলসী তলায় স্বদেশভক্তির নির্মল দীপ শিখা তিনি জ্বালাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগ্বলি জাতির মর্মে মর্মে দেশজননীর জন্য মমতা সঞ্চার করে। এছাড়া কবি দ্বিজেন্দ্রলালও বহ্ব স্বদেশী গান রচনা করেন। (৬) রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ডাক ও তার ব্যবস্থার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ সহজ হয়। কলিকাতার নেতাগণ বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণের সহিত সহজ যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন। কলিকাতার জাতীয়তার ভাবধারা সহজে ভারতের অন্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে ঊনবিংশ শতকে ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

ইংরাজ সরকারের শাসন নীতি পরোক্ষভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণের সহায়ক হয়। প্রথমতঃ, নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার এবং সাধারণ ইংরাজ কর্মচারীগণের ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা ও দ্বর্ব্যবহার ভারতবাসীর মনে বির্প প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নীলকর সাহেবরা নীল চাষীগণের উপর নিষ্ঠ্বর অত্যাচার চালাইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইহার প্রতিবাদ করে। দীনবন্ধ্ব মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকেন। পাদ্রী লং সাহেব এই নাটকের ইংরাজী তর্জমা করিয়া বিলাতে প্রচার করেন। এজন্য লং-এর জেল হয়। নীল চাষীরা বিদ্রোহ করিলে হিন্দ্ব পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র ম্বখার্জী সংবাদপত্রের কলমে নীল চাষীগণের উপর অত্যাচার সম্পর্কে অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ লেখেন। নীল আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতির স্বর্প শিক্ষিত শ্রেণীর চোখে ধরা পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে ইংরাজ সরকার ভারতীয় কর্মচারীর সততা সম্পর্কে হীন ধারণা প্রকাশ করে। ভারতীয়গণের সততার অভাব আছে এই অজ্বহাতে সকল উচ্চ-পদ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা হয়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যদিও ভারতীয়গণকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের নিয়ম করেন, তব্বও উচ্চপদগ্বলিতে ভারতীয় নিয়োগ রহিত করা হয়। ইহাতে ইংরাজ সরকারের ম্বখে ও মনে দ্বম্বখো নীতির কথা সকলে ব্বঝিতে পারে। ইহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীরা হতাশা বোধ করে। তৃতীয়তঃ, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে আইনের চক্ষে সকলে সমান এই কথা প্রচার করা হইলেও, কাজের বেলায় ইংরাজ কর্মচারীগণের অত্যাচারের বিচার হইত না। সাহেব মনিব দেশী চাকরকে হত্যা

ইংরাজের শাসন নীতি ও উহার প্রতিক্রিয়া



দীনবন্ধু মিত্র

করিলে সামান্য জরিমানা করিয়া তাহাকে রেহাই দেওয়া হইত। ইহার ফলে ইংরাজের ন্যায়-বিচার সম্পর্কে ভারতবাসীর আস্থা নষ্ট হয়। চতুর্থতঃ, লর্ড লিটনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ভারতবাসীর মনে ঘৃণার সঞ্চার করে। ১৮৭৭ খ্রীঃ যখন এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষে ভারতের দরিদ্র লোকেরা মরিতে থাকে, তখন লর্ড লিটন দুর্ভিক্ষ দমনের চেষ্টা না করিয়া ভারতের রাজস্ব হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবার করেন। এজন্য শিক্ষিত ভারতীয়গণ বলেন যে, "রোম নগরী যখন আগুনে পুড়ে, তখন রোম সম্রাট নীরো আগুন না নিভাইয়া বেহালা বাজান।" লর্ড লিটন নীরোর অনুরূপ কাজ করেন। শিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে পারে যে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর মঙ্গল সম্পর্কে উদাসীন। বলদর্পী শ্বেতজাতি, কৃষ্ণকায় দরিদ্র অন্নভোজী ভারতবাসীকে মানুষের পর্যায়ে দেখে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ কবি কিপলিং বলেন যে, "পূর্ব হইল পূর্ব, পশ্চিম হইল পশ্চিম, এই দুইয়ের মিলন কখনও হইবে না।"[১] ফলে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের দুস্তর জাতিগত ব্যবধান দেখা যায়।

অর্থনৈতিক শোষণ

পঞ্চমতঃ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ভারতে ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণের চালচিত্র তুলিয়া ধরেন। ভারতবাসী বুঝিতে পারে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরাজ বণিকেরা এদেশের সম্পদ ও কাঁচামাল লুন্ঠন করিয়া ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংস করিয়াছে। ভারতবাসীকে বিলাতীমাল কিনিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহার পর ভারতে যাহাতে কল-কারখানা গড়িয়া না উঠে সেজন্য ইংরাজ সাধ্যমত চেষ্টা চালাইতেছে। বিলাতী মালের উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া ভারতের বাজার সস্তা বিলাতী মালে ছাইয়া গিয়াছে। ভারতের তুলা, নীল, পাট, চা ইংরাজ বিদেশে রপ্তানী দিতেছে। এইভাবে ভারত চির দরিদ্র ও শোষিত হইতেছে। ইংরাজ শাসনের এই ভয়ঙ্কর রূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধরিয়া ফেলে।

কৃষক বিদ্রোহ

ইংরাজের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ভারতের কৃষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা শোষিত হইতেছিল। জমিদার, মহাজন ও নীলকর প্রভৃতিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া ইংরাজ সরকার ভারতের কৃষকগণকে শোষণ করিত। কৃষক সমাজের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের জন্য সরকারের কোন লক্ষ্য মোটেই ছিল না। ফলে শোষিত কৃষকশ্রেণী মাঝে মাঝে বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়িত। ১৮৮৩, ১৮৯০ খ্রীঃ যশোহরে নীল বিদ্রোহ, ১৮৭২—৭৬ খ্রীঃ পূর্ব বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৭৫ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৭৩ খ্রীঃ মোপালা বিদ্রোহ প্রভৃতি ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার প্রতি কৃষকগণের গভীর অসন্তোষের পরিচয় বহন করে। ইংরাজ সরকার সৈন্য, রাইফেল ও বেয়নেটের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণী কৃষকগণের দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। ক্রমে কৃষক অসন্তোষ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয়। ডাঃ বিপান চন্দ্রের মতে "বিংশ শতাব্দীতে কৃষক সমাজের অসন্তোষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভের সহিত যুক্ত হয়।" সর্বশেষে লর্ড লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন ও সিভিল সার্ভিস আইন অগ্নিতে

১. The East is East, the West is West the Twain shall never meet".

ঘৃতাহুতির কাজ করে। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দায়িত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের কাঁধে তুলিয়া নেয়।

রাজনৈতিক সমিতি গঠন (Beginning of Political Association)ঃ ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ ইংরাজ শাসনের শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে ধারণা গঠন করে। এই মধ্যবিত্তগণ ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও পাশ্চাত্য দর্শন পড়িয়া গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে দীক্ষা পায়। স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও ইহারা অবহিত হয়। শিক্ষিত শ্রেণী বুঝিতে পারে যে সংগঠন বা সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন না করিলে কোন কাজ হইবে না। ব্যক্তিগত প্রতিবাদ বা একক আন্দোলনের স্থলে সংগঠিতভাবে আন্দোলন করার যৌক্তিকতা তাহারা বুঝিতে পারে। ঐতিহাসিক অনিল শীল এই যুগকে "সমিতির যুগ" বা Age of Associations বলিয়াছেন। গণতন্ত্র হইল জনমতের দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী ধারণা করে যে সমিতির মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পথে আবেদন-নিবেদন চালাইলে গণতন্ত্রবাদী ইংরাজ তাহা মানিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং রাজনৈতিক সমিতি গঠন ও প্রস্তাব গ্রহণ ছিল এই যুগের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(১) ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন পাশ হইবার পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতাগণ কলিকাতার টাউন হলে সভা করিয়া এই আইনের সমালোচনা করেন। তাঁহারা সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ দাবী করেন। (২) ১৮৩৮ খ্রীঃ রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন বা জমিদার সমিতি স্থাপিত হয়। জমিদার সমিতির শাখা প্রতি জেলায় স্থাপন করা হয় এবং বিলাতেও এই সভার শাখা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। ইহাতে ভারতবাসীগণকে ইংরাজের সমান মর্যাদা দানের দাবী জানান হয়। (৩) উইলিয়াম এ্যাডাম নামে এক ভারত-হিতৈষী ধর্মযাজক ১৮৩৯ খ্রীঃ লণ্ডনে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন এবং ইহার মুখপত্র ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাডভোকেট প্রকাশ করেন। ইংরাজ বাগ্মী টমসন এই সমিতির পক্ষে ইংলণ্ডের বড় বড় শহরে ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দেন। (৪) নব্যবঙ্গ দলের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রামগোপাল ঘোষ সাধারণ জ্ঞানার্জনী সভা (১৮৩৮ খ্রীঃ) স্থাপন করিয়া পুলিশী জুলুম, বেগার প্রথা, সরকারী অবিচার প্রভৃতির নিন্দা করেন। জ্ঞানার্জনী সভার মুখপত্র বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকার মাধ্যমে ও বাগ্মী টমসনের বক্তৃতার দ্বারা এই সভা সরকারের অবিচারের সমালোচনা করে। (৫) নব্যবঙ্গের নেতাগণ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩ খ্রীঃ) স্থাপন করিয়া উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয় নিয়োগের দাবী জানান।

ল্যাণ্ড হোল্ডার্স, ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সমিতি

সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশার নিরসন ও নীলকর সাহেবগণের দৌরাত্মের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য কলিকাতায় ১৮৫১ খ্রীঃ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত

হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সভার প্রথম সম্পাদক। রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন প্রথম সভাপতি। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা ছিল এই সভার মুখপত্র। এই সভা বোম্বাই ও মাদ্রাজের নেতাগণকে লইয়া একটি সর্বভারতীয় সভা গঠনের চেষ্টা করে। ১৮৫৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের বিরুদ্ধে এই সভা একটি স্মারকপত্র পাঠায়। শাসনবিভাগ হইতে আইন বিভাগের পৃথকীকরণ, আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ, আই. সি. এস. চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ, কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান প্রভৃতি বিষয়ে এই সভা দাবী জানায়। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজ যদিও মুখ্যতঃ বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল, তবুও ইহার সর্বভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে দাবী সর্বভারতীয় সভা গঠনের পথ তৈয়ারী করে। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে দাবী জানাইলেও এই সভার নেতৃত্ব প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর হাতে পড়ে। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আদর্শে পুনায় ডেকান এসোসিয়েশন ও বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরোজীর চেষ্টায় বোম্বাই এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। মাদ্রাজে মহাজন সভা ও পাঞ্জাবে আঞ্জুমান সভা স্থাপিত হয়।

ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও সুরেন্দ্রনাথ (The Indian Association and Surendranath): ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণী অধিকার করিলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভব করেন যে মধ্যবিত্ত, সাধারণ লোক ও ধনী প্রভৃতি সকল শ্রেণীকে একটি অধিকতর গণতান্ত্রিক সমিতি গঠন করা দরকার। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন যে কেবলমাত্র বাংলা দেশে আন্দোলন চালাইলে কাজ হইবে না। ভারতের সকল অঞ্চলের নেতাকে সংগঠিত করিয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন।

সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. চাকুরী হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যুব ও ছাত্রগণের নিকট শিখ ও মারাঠা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়া তাহাদের নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ম্যাৎসিনী ও ইওরোপের জাতীয়তাবাদী নেতাগণের জীবনী বিশেষ নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করেন। ইহার পর সুরেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সমিতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সহযোগিতায় তিনি ১৮৭৬ খ্রীঃ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (Indian Association) বা ভারত সভা স্থাপন করেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান লীগও ভারত সভার সহিত যুক্ত হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার চারিটি লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়। যথা—জনমত গঠন, ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন, রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ভারতের জনসাধারণের যোগ স্থাপন।[১] যাহাতে সাধারণ লোক এই সভার সভ্য হইতে পারে এজন্য চাঁদার হার কমাইয়া সভ্যগণের চাঁদা মাত্র ১ টাকা ধার্য করা হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। এই সভাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পথ রচনা করে।

ভারত সভা

বড়লাট লর্ড লিটন ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ১৮৭৬ খ্রীঃ এক আদেশ দ্বারা আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীগণের বয়স ২১ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করেন। লিটনের এই আদেশ ছিল দুরভিসন্ধিমূলক। এই আইনের বলে ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে অল্প বয়সে বিলাতে গিয়া ইংরাজ ছাত্রগণের সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ও ভারত সভা লর্ড লিটনের এই বৈষম্যমূলক আই. সি. এস. আইনের বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বড় বড় শহরে সুরেন্দ্রনাথ এই আইনের প্রতিবাদে বক্তৃতা করেন। সিভিল সার্ভিস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে উপলক্ষ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতাগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বাড়ে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তীব্র হয়। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের প্রচারকার্য ভারতে রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায়।"[২] পরে ভারত সভা পার্লামেন্টের নিকট এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য বিলাতে বাগ্মী লালমোহন ঘোষকে পাঠাইয়া দেয়।



লর্ড লিটন

ভারত সভা ও সিভিল সার্ভিস আন্দোলন

দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রগুলি সরকারের কাজের তীব্র সমালোচনা করায় লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রীঃ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র আইন পাশ করেন। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির সরকারী সমালোচনার অধিকার হরণ করা। সংবাদপত্রগুলিকে এই দমনমূলক আইনের আওতায় আনিয়া তাহাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়। সংবাদপত্র জব্দ হইলে জনমত সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত হইতে পারিবে না বলিয়া লর্ড লিটন মনে করেন। অমৃত বাজার পত্রিকা এই আইনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাতারাতি বাংলার বদলে

লর্ড লিটনের দমন নীতি

১. যোগেশ চন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত।

২. R. C. Majumder—History of Freedom Movement. Vol. I. P. 369.

ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। এছাড়া লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রীঃ অস্ত্র-আইন দ্বারা ভারতবাসীগণের আগ্নেয়াস্ত্র রাখা নিয়ন্ত্রিত করেন।

সংবাদপত্র দমন আন্দোলন

সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভার উদ্যোগে লিটনের সংবাদপত্র দমন ও অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই আইনগুলির দ্বারা ভারতবাসীর কি ক্ষতি হইবে তাহা ব্যাখ্যা করেন। মাদ্রাজের মহাজন সভা প্রভৃতি ভারত সভার এই আন্দোলনের সামিল হয়। কলিকাতার টাউন হলে এক মহতী জনসভায় লর্ড লিটনের এই দমন নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়। বিলাতে পার্লামেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠাইয়া ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দাবী করা হয়। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের পিতা গ্ল্যাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ও রিপন ভারতের বড়লাট হইলে তাঁহারা লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন রদ করেন। লর্ড লিটনের দমনমূলক আইনগুলির বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ যে আন্দোলন করেন তাহা ভারতের রাজনৈতিক জাগরণে বিশেষ সহায়ক হয়। এছাড়া ভারত সভা কলিকাতায় একটি কৃষক সমাবেশ করিয়া রায়তের স্বার্থ রক্ষার দাবী জানায়। ইহার ফলে রায়তের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার ১৮৮৫ খ্রীঃ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন

লর্ড রিপনের শাসনকালে ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত সভা এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইংরাজের প্রচলিত আইনে শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার কালো চামড়ার ভারতীয় জেলা জজগণ করিতে পারিত না। শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার একমাত্র শ্বেতাঙ্গ জজই করিতে পারিত। যেহেতু মফস্বলে ইংরাজ জজ ছিল না সেহেতু মফস্বলে নীলকর সাহেবরা অত্যাচার করিলেও তাহাদের শাস্তি দেওয়া যাইত না। ফলে তাহাদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া যায়। লর্ড রিপন এই বৈষম্যমূলক জাতি-বৈর আইন রদ করিবার জন্য আইনমন্ত্রী ইলবার্টকে এক বিল রচনার আদেশ দেন। ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় জজগণকে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সকল প্রকার আসামীর বিচার করিবার অধিকার দান করা। ইলবার্ট বিলের এই সমদর্শী নীতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গগণ ক্ষেপিয়া যায়। তাহারা কালো চামড়ার ভারতীয় হাকিমের নিকট বিচারার্থী হইবার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ ও আন্দোলন আরম্ভ করে। গর্বিত, জাত্যাভিমানী, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের উদ্ধত চরিত্র ইহার ফলে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এদিকে ভারত সভা ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জোর প্রচার চালায়। কিন্তু লর্ড রিপন শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গগণের চাপের নিকট নতি স্বীকার করিয়া ইলবার্ট বিলটি সংশোধন করেন। সংশোধিত নূতন আইনে বলা হয় যে, শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার



লর্ড রিপন

কালো জজ করিতে পারিবে। কোন কালো চামড়ার জজ শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার করিলে সেই বিচারের সময় শ্বেতাঙ্গ জুরির সাহায্য লইয়া তাহাকে বিচার করিতে হইবে। ইহার ফলে জাতিবৈষম্য রহিয়া যায়। যাহা হউক ইলবার্ট বিলকে উপলক্ষ করিয়া যে আলোড়ন জাগে তাহা ইংরাজের জাত্যাভিমান সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতীয়গণের চোখ খুলিয়া দেয়। ইংরাজের সুবিচার সম্পর্কে ভারতবাসীর মোহ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইংরাজগণের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের সুফল দেখিয়া ভারতীয়গণ সংঘবদ্ধ হইতে শিক্ষা পায়। তৃতীয়তঃ, ইলবার্ট বিল আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের ইংরাজ জজ নরিসের দ্বারা কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। ইহার ফলে যুব সমাজ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। এমনকি স্যার আশুতোষ ছাত্র অবস্থায় হাইকোর্টের সম্মুখে বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে সরকার সুরেন্দ্রনাথকে মুক্তি দেন।

জাতীয় সম্মেলন (National Conference): লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন ও লর্ড রিপনের ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন হয় তাহার ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। এই আন্দোলনের নায়ক সুরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন না করিতে পারিলে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনাকে দৃঢ় ও কার্যকরী করা যাইবে না। সর্ব ভারতীয় সংগঠনের দ্বারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার সুবিধা হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুরেন্দ্রনাথ বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন এবং উৎসাহজনক সাড়া পান। ১৮৮৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার এলবার্ট হলে জাতীয় সম্মেলন বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লাহোর, মীরাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিনিধি যোগ দেন। জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন হয়। আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ, আইন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে এই সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়। জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৫ খ্রীঃ কলিকাতায় বসে। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৩০টি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি যোগ দেন। এই সম্মেলনেও উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্থাপন হয়। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন ১৮৮৬ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

জাতীয় সম্মেলন

হোমরুল লীগ (The Home Rule League): ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হইলে গোড়ার দিকে ইহাতে মডারেট বা নরমপন্থীগণের প্রাধান্য ছিল। নরমপন্থীগণ সক্রিয় আন্দোলন না করিয়া দাবী আদায়ের জন্য আবেদন চালাইত। ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট কংগ্রেসে তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি চরমপন্থীর সহিত নরমপন্থীগণের বিচ্ছেদ ঘটে। চরমপন্থীগণ বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করেন। চরমপন্থীগণের দাবী ছিল সক্রিয় আন্দোলনের দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীগণ সুযোগ বুঝিয়া ভারতবাসীদের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী

জানান। এই দাবী আদায়ের জন্য তিলক পুনা শহরে হোমরুল লীগ স্থাপন করেন।

চরমপন্থীগণের স্বায়ত্ব শাসন দাবী ও কংগ্রেস ত্যাগ

এদিকে মিসেস এ্যানি বেশান্ত মাদ্রাজে ১৯১৬ খ্রীঃ একটি হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। মিসেস বেশান্ত বলেন যে "যুদ্ধের সময় যদি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতে পারে তবে যুদ্ধের সময় ভারতের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তোলা অন্যায় নয়।" মিসেস বেশান্ত ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিলেও ভারতবাসীকে স্বশাসনের অধিকার দিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত তিলক ও মিসেস এ্যানি বেশান্তের উভয় সংস্থা মিলিত হইয়া ভারতীয় হোমরুল লীগে (১৯১৬ খ্রীঃ) পরিণত হয়। কংগ্রেসের মডারেট বা নরমপন্থীগণ হোমরুল বা স্বশাসনের দাবীকে সমর্থন না করায়, তিলক ও মিসেস বেশান্ত প্রভৃতি নেতাগণ স্বতন্ত্রভাবে হোমরুল আন্দোলন গঠন করেন।

হোমরুল লীগ স্থাপন



বাল গঙ্গাধর তিলক

যুব সম্প্রদায় এই আন্দোলনে বিশেষ সাড়া দেয়। ভারতের প্রধান শহরগুলিতে হোমরুল লীগের শাখা স্থাপিত হয়। তিলক ঘোষণা করেন যে, "স্বরাজ ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। ইহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"

হোমরুল আন্দোলনকে দমাইয়া দেওয়ার জন্য সরকার তিলক ও মিসেস বেশান্ত প্রভৃতি নেতাকে গ্রেপ্তার ও জরিমানায় দণ্ডিত করেন। তিলকের গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র দেশ প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে। জাতীয় কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করিবার হুমকি দেয়। মুসলিম লীগও সরকারের নীতির নিন্দা করে।

হোমরুল আন্দোলনের ফলাফল—১৯১৬ খ্রীঃ শাসন সংস্কার.

চতুর ইংরাজ সরকার অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯১৭ খ্রীঃ ভারত সচিব মণ্টেগু ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া ভারতবাসীগণ যাহাতে স্বশাসন পায় সেজন্য শাসন সংস্কার করা হইবে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল শাসন সংস্কারের প্রস্তাবের টোপে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতা ও মুসলিম লীগকে সরকারের পক্ষে আনা। নরমপন্থীগণ সরকারের শাসন সংস্কার সমর্থন করিলে তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীগণের স্বরাজ দাবী ইহাতে দুর্বল হইয়া পড়িবে বলিয়া ভাবা হয়। তিলক অবশ্য ইংরাজ সরকারের এই চাল বুঝিয়া ফেলেন। তিনি বলেন যে, "এই সংস্কারের দ্বারা ভারতবাসীর আশা-আকাংখা পূরণ হইবে না।" যাহা হউক মণ্টেগু প্রস্তাবের ফলে হোমরুল আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়ে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (The Foundation of the Indian National Congress) ঃ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আরম্ভ হয়। ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস স্থাপনের দ্বারা এই চেতনা পরিণতি লাভ করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই প্রতিষ্ঠান একাদিক্রমে প্রায় ৬০ বৎসর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে থাকে।" পৃথিবীর আর কোন দেশে কংগ্রেসের মত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ৬০ বৎসর জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের মুক্তি আন্দোলন চালাইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ভূমিকাই হইল কংগ্রেসের। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের জাতীয় চেতনাকে প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর করিয়াছে। ভারতের প্রাণদায়িনী গঙ্গার গৈরিক প্রবাহ যেমন ভারতের সমতল অঞ্চলকে রসে, ফুলে, ফলে সঞ্চারিত করিয়াছে, কংগ্রেস তেমনই ভারতের জাতীয়তা-বাদকে উর্বরা ও সুফলা করিয়াছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। কংগ্রেসের অনুমোদিত ঐতিহাসিক ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে প্রধানতঃ ত্রিমুখী পরিকল্পনার ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। (১) ১৮৭৭ খ্রীঃ দিল্লীর দরবারে ভারতের নানা অঞ্চলের নেতাগণ সমবেত হইলে তাঁহাদের মনে এক সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা জাগে। (২) ১৮৮৩ খ্রীঃ কলিকাতায় এক সর্ব-ভারতীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার অনুকরণে সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা নেতাদের মনে জাগে। (৩) ১৮৮৪ খ্রীঃ মাদ্রাজে অডিয়ার নামক স্থানে সমুদ্র উপকূলে থিওজফিক্যাল সোসাইটির এক জাতীয় অধিবেশন বসে। এই সম্মেলনের ১৭ জন নেতা গোপনে এক সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে সিদ্ধান্ত নেন। মিসেস এ্যানি বেশান্তের মতে এই ১৭ জনের মধ্যে সুরেন্দ্র-নাথও ছিলেন। ইঁহারা বিভিন্ন অঞ্চলে কমিটি স্থাপন করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের আয়োজন করেন। ডাঃ সীতারামাইয়া মনে করেন যে, উপরোক্ত তিনটি কারণের দ্বারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হয়। তবে একথা সত্য যে কংগ্রেসের ন্যায় একটি সর্ব-ভারতীয় সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা এই সময় সকলেই অনুভব করে এবং এইরূপ পরিকল্পনা অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল।[১] এই সময়ে এ্যালান.অক্টেভিয়ান হিউম নামক ভারত সরকারের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. কর্মচারীর উদ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়।[২]

সীতারামাইয়ার মত

উইলিয়াম ওয়েডার বার্ণ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমকেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। হিউম অবসর গ্রহণের আগে ভারত সরকারের স্বরাস্ত্র দপ্তরের সচিব ছিলেন। তিনি এই সময় বিভিন্ন সূত্র ও গোপন পুলিশ রিপোর্ট হইতে জানিতে পারেন যে, ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। এই অসন্তোষ

হিউমের উদ্যোগ

১. "We come to the conclusion that the idea was in the air, that the need of such an organisation was being felt"—Sitaramayyea.

২. Ibid.

এক ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ লইবার সম্ভাবনা ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ এই বিদ্রোহে নেতৃত্বে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল। শিক্ষিত শ্রেণী যাহাতে সরকারের বিপক্ষে না যায় এজন্য হিউম শিক্ষিত ভারতীয়গণকে লইয়া এক জাতীয় সভা গঠনের পরিকল্পনা করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া সংবাদপত্রে এক খোলা চিঠি লেখেন। তিনি স্নাতকগণকে "ভারতীয় জনসাধারণের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের" জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের আহবান জানান। হিউম এজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতাগণের সহিত যোগা-যোগ করেন ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন বা ভারতীয় জাতীয় সমিতি নামে এক সংস্থা স্থাপন করেন। ওয়েডার বার্ণের মতে হিউম প্রথমে এই সংস্থাকে রাজনৈতিক কাজ হইতে বিরত রাখিয়া সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োগের পরিকল্পনা নেন।



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিমধ্যে সিমলা শহরে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সহিত হিউমের সাক্ষাৎ হয়। ডাফরিন হিউমের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, সরকারের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত জানিতে পারিলে সরকারের কাজের সুবিধা হয়। এজন্য তিনি হিউমকে তাঁহার পরিকল্পিত সম্মেলনে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার পরামর্শ দেন। ডাফরিন ও হিউম মনে করিতেন যে, শাসনকার্যে মতামত প্রকাশের অধিকার পাইলে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ কমিবে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস "সেফটি ভালভ" (Safety Valve) বা অসন্তোষ কমাইবার নিরাপত্তামূলক যন্ত্রের কাজ করিবে। এই উদ্দেশ্যে হিউম ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন। পুনায় কলেরা রোগের প্রকোপ দেখা দিলে কংগ্রেসের সম্মেলন পুনায় না ডাকিয়া বোম্বাই শহরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাকা হয়। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

লর্ড ডাফরিনের পরামর্শ

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কংগ্রেসের অনুমোদিত ঐতিহাসিক ডাঃ সীতারামাইয়ার "ত্রিমুখী প্রভাব" তথ্য সমালোচনার দ্বারা নস্যাৎ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, দিল্লীর দরবারে ভারতের সকল অঞ্চলের লোকের সমাবেশ দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মস্তিষ্কেই সর্বপ্রথম এক সর্বভারতীয় সম্মেলন ডাকার চিন্তার উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতায় ১৮৮৩ খ্রীঃ সর্ব-ভারতীয় প্রদর্শনীর সুযোগ লইয়া তিনি জাতীয় সম্মেলন বা ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন ডাকেন। ইহাতে প্রতিনিধিগণের যোগদান সহজ হয়। তৃতীয়তঃ, মাদ্রাজে থিওজফিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে যে ১৭ জন নেতার নাম বলা হইয়াছে তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা হইলেও তিনি সেই অধিবেশনে যোগ দেন নাই। কারণ এই সময় তিনি

রমেশচন্দ্র কর্তৃক সীতারামাইয়ার মত খণ্ডন

কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং ডাঃ মজুমদার মিসেস বেশান্তের অভিমত ভ্রমাত্মক মনে করেন। চতুর্থতঃ, যে ১৭ জন নেতার নামের তালিকা মিসেস এ্যানি বেশান্ত দিয়াছেন তাহাতে হিউমের নাম দেখা যায় না। অথচ হিউমের দ্বারাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয় ইহা ইতিহাস-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত মনে করেন যে হিউম ও বড়লাট ডাফরিনের মধ্যে গোপন চক্রান্তের ফলে হিউম কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন। তাঁহারা ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ইহার মাধ্যমে ইংরাজের নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা করেন। ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ অনিল শীল প্রভৃতি এই মতের বিরোধিতা করেন। ডাফরিন ও হিউমের চক্রান্তের ফলে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এই মতবাদ যুক্তিসহ নহে। লর্ড ডাফরিন জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে শীঘ্রই মোহমুক্ত হইয়া যান। ১৮৮৮ খ্রীঃ সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজসভার বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করেন এবং কংগ্রেসের সভ্যগণকে "আণুবীক্ষনিক সংখ্যালঘু" (Microscopic minority) বলিয়া মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের অর্থ হইল কংগ্রেসের সভ্যগণের সংখ্যা এত কম ছিল যে তাঁহারা ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতামতের দাম দিতে সরকার বাধ্য ছিলেন না। হিউম সম্পর্কেও লর্ড ডাফরিনের ধারণা ভাল ছিল একথা মনে করা যায় না। হিউমের পিতা ইংলণ্ডের একটি চরমপন্থী দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিউমের উদারপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ সাম্রাজ্যবাদী বড়লাটের পছন্দসই ছিল না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাছাড়া হিউম জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ দেখান এবং ভারতীয়গণের স্বার্থ লইয়া বিলাতে লড়াই চালান। সুতরাং তাঁহার সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ করা সঙ্গত নয়। তবে একথা ঠিক সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় তিনি চরমপন্থী মতের ভক্ত ছিলেন না। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তিনি ভাবেন নাই। তবুও ভারতবাসীর মঙ্গল চিন্তা তিনি করিতেন একথা বলা যায়। কলিকাতার গ্র্যাজুয়েটগণকে তিনি যে খোলা চিঠি লেখেন তাহার ভাষা ছিল মর্মস্পর্শী ও আন্তরিকতাপূর্ণ।[১]

ডাফরিন ও হিউমের ভূমিকার মূল্যায়ন

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে শাসক শ্রেণীর যাহাই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, ভারতীয় প্রতিনিধিগণ জাতীয়তার ভাব লইয়াই তাহাতে যোগ দেন। ডাঃ বিপানচন্দ্রের মতে বলা যায় যে ভারতীয় নেতাগণ যাঁহারা এই সময় কংগ্রেসে যোগ দেন তাঁহারা ছিলেন নূতন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি। যদি হিউম তাঁহাদের সেফটি ভাল্ভ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তবে তাঁহারা হিউমকে লাইটনিং কণ্ডাক্টর বা বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করেন। মোট কথা কংগ্রেস সরকারী স্বার্থ সিদ্ধির বাহন না হইয়া জাতীয় স্বার্থের ধারক ও বাহকের ভূমিকা নেয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ভারতের ইতিহাস সে পথে প্রবাহিত হইতেছিল তাহাতে কংগ্রেসের ন্যায় একটি জাতীয় সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম অনিবার্য হইয়া পড়ে। ডাঃ অনিল শীলের মতে

১. The British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. II. P. 529.

সমিতির যুগের রাজনীতি এই পরিণতির দিকে চলিতেছিল। লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, সংবাদপত্র দমন, লর্ড রিপনের আমলের ইলবার্ট বিল আন্দোলন ইংরাজের দর্পিত সাম্রাজ্যবাদী রূপকে নগ্ন করিয়া দেয়। সুরেন্দ্রনাথ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গঠন করিতে যাইয়া সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। স্থানীয় রাজনৈতিক সমিতিগুলি ক্রমে জাতীয় রাজনৈতিক সমিতির ভিত্তি তৈয়ারী করিতেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত অনুকূল হইয়া পড়ে। সুরেন্দ্রনাথই এই পথ প্রথম দেখাইয়া দেন। তিনি জাতীয় সম্মেলন বা ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের ১৮৮৩ খ্রীঃ সর্বভারতীয় অধিবেশন ডাকিয়া জাতীয় কংগ্রেসের স্থাপনের পথ রচনা করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসিলে কংগ্রেস নেতাগণ কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের কার্য বিবরণী চাহিয়া পাঠান। কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদারের মতে জাতীয় সম্মেলনের আদর্শেই জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। যাহা হউক হিউম সুরেন্দ্রনাথকে পাশ কাটাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীঃ কলিকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দিলে কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদা বহুগুণ বাড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ও বাংলার উগ্রপন্থীগণের যোগদানের ফলে কংগ্রেসের সুর চড়া গ্রামে বাঁধা হইয়া যায়। জনমানসে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি জাতীয় পার্লামেন্টের মত হয়।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের পরিণতি ; সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

(Growth of British Indian Empire)

মহীশূরের উত্থান : প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (The Rise of Mysore : First Anglo-Mysore War) : অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে বহু ভাগ্যান্বেষী ধ্বংস-প্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করে। ডাঃ কালিকিঙ্কর দত্তের মতে "অষ্টাদশ শতকের ভারত ইতিহাস হইল ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসিকগণের ক্ষমতা লাভের কাহিনী।" হায়দরাবাদে নিজাম, বাংলায় আলিবর্দী, অযোধ্যায় সফদর জং ও মহীশূরে হায়দর আলি ছিলেন এই ভাগ্যান্বেষীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতকে মহীশূর রাজ্যে এক হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করিত। এই রাজবংশের মন্ত্রী বা দলবই (Dalwai) ছিলেন মানরাজ। তাঁহার অধীনে হায়দর আলি সামান্য

অশ্বারোহী সেনার চাকুরী লইয়া জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি নিজ যোগ্যতায় দ্রুত উন্নতি লাভ করেন।

হায়দর আলির ক্ষমতা বিস্তার



হায়দর আলি

ক্রমে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা আক্রমণ, ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব প্রভৃতির সুযোগ লইয়া হায়দর মহীশূর সেনা-বাহিনীকে হাত করেন। এই সেনার সাহায্যে তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজবংশকে সরাইয়া সকল ক্ষমতা দখল করেন। হায়দর ছিলেন অত্যন্ত চতুর, বিচক্ষণ ও বাস্তববুদ্ধির লোক। তিনি বুঝিতে পারেন যে, ভারতে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলিতেছে তাহাতে সামরিক শক্তিই একমাত্র ক্ষমতা লাভের উপায়। এই কারণে তিনি সেনাদলকে ঢালিয়া সাজাইয়া ফেলেন। তিনি সেরা, বেদনুর, গুটি প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। হায়দরের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান শক্তি মারাঠা পেশবা মাধবরাও তাঁহাকে তিনবার পরাস্ত করেন। হায়দর কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সাময়িকভাবে মারাঠার বশ্যতা স্বীকার করেন। পেশবা মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তির দুর্বলতার সুযোগে হায়দর পুনরায় রাজ্যবিস্তারের দিকে মন দেন। তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের একাংশ ও কেশরী, গুটি প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া দাক্ষিণাত্যে নিজ শক্তি স্থাপন করেন।

হায়দরের শক্তি বৃদ্ধির ফলে দাক্ষিণাত্যের অপর তিন শক্তি যথা, ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠা ঈর্ষাবোধ করে। ইহারা ত্রিশক্তি জোট গড়িয়া ১৭৬৬ খ্রীঃ মহীশূর আক্রমণ করে। ঐতিহাসিক ডডওয়েলের (Dodwell) মতে ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠার এই ত্রিশক্তি জোট স্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ ইহাদের স্বার্থ ছিল পরস্পর-বিরোধী (mutually destructive)। সুতরাং হায়দর কূটনীতি ও অর্থের সাহায্যে এই জোট ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তিনি মারাঠা ও নিজামকে নিজ পক্ষে আনিয়া ইংরাজকে মিত্রহীন করিয়া ফেলেন।

মহীশূরের বিরুদ্ধে ইংরাজ, মারাঠার শত্রুতা

হায়দর এইবার অশ্বারোহী সেনা লইয়া মিত্রহীন ইংরাজের অধিকৃত কর্ণাট অঞ্চল আক্রমণ করেন। হায়দরের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া নিজাম পুনরায় ইংরাজ পক্ষে যোগ দিয়া হায়দরের বিপক্ষে ইংরাজের সহিত এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর ইংরাজ সেনা হায়দরের বিরুদ্ধে ম্যাঙ্গালোর অভিমুখে আগাইয়া যায়।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হায়দর ইহাতে না দমিয়া বিরাট সেনাদল সহ ইংরাজ সেনার পাশ কাটাইয়া অতর্কিত-

ভাবে ইংরাজের ঘাঁটি মাদ্রাজের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়েন। ইংরাজ সেনা বাঙ্গালোর অধিকার করার ফলে মাদ্রাজ শহর তখন অরক্ষিত ছিল। হায়দরের আক্রমণে মাদ্রাজ ছারখার হইবার উপক্রম হয়। মাদ্রাজের গভর্ণর হায়দরের আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া হায়দরের সহিত মাদ্রাজের সন্ধি, ১৭৬৯ খ্রীঃ স্থাপন করেন। এই সন্ধির বলে উভয়পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরৎ দেয়। অপর কোন তৃতীয় শক্তি হায়দরকে আক্রমণ করিলে ইংরাজ শক্তি হায়দরকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শেষ হয়।

মাদ্রাজের সন্ধি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৮০-৮৪ খ্রীঃ (Second Anglo-Mysore war): মাদ্রাজের সন্ধি (১৭৬৯ খ্রীঃ) দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হইলেও, এই সন্ধি দ্বারা উভয়পক্ষের মধ্যে মৌলিক বিরোধের কোন মীমাংসা হয় নাই। সুতরাং মাদ্রাজের সন্ধি ছিল আসলে একটি যুদ্ধ-বিরতি মাত্র। ইংরাজেরা এই সন্ধির দ্বারা হায়দরকে হীনবল করিতে অপারগ হয়। ইহার ফলে হায়দরের সহিত ইংরাজের পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ইঙ্গ-মহীশূর বিরোধ

ইতিমধ্যে মারাঠাগণ ১৭৭১ খ্রীঃ মহীশূর আক্রমণ করে। মাদ্রাজের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী হায়দর মারাঠার বিরুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য চান। কিন্তু ইংরাজগণ এই শর্ত পূরণের কোন চেষ্টা না করিয়া মহীশূর-মারাঠা যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে। ইংরাজেরা মাদ্রাজের সন্ধি ভঙ্গ করার জন্য হায়দর কুপিত হন। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অজুহাতে ইংরাজেরা হায়দরের রাজ্য ভুক্ত ফরাসী উপনিবেশ মাহে দখল করে। ইংরাজেরা এই অজুহাত দেখায় যে মাহে হইতে ফরাসীরা ইংরাজকে আক্রমণ করিতে পারে। হায়দরের বিনা অনুমতিতে তাঁহার রাজ্যভুক্ত মাহে ইংরাজেরা অধিকার করিলে হায়দর মনে করেন যে ইংরাজেরা তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে অমান্য করিয়াছে এবং তাঁহাকে ফরাসীগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সুতরাং হায়দর ইংরাজের ঔদ্ধত্যকে খর্ব করিবার সংকল্প নেন। এই সুযোগ শীঘ্রই হাজির হয়। ইংরাজের সহিত মারাঠার প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ বাধিলে হায়দর ইংরাজের বিরুদ্ধে মারাঠার সহিত মৈত্রী জোট গঠন করেন। ধুরন্ধর মারাঠা কূটনীতিবিদ নানা ফড়নবীশের নেতৃত্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে মারাঠা-মহীশূর-নিজামের একটি ত্রিশক্তি জোট গঠিত হয়। ইংরাজেরা দারুণভাবে মিত্রহীন হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে।

ইংরাজের শত্রুতা নীতি, হায়দরের ইংরাজ বিরোধী ত্রিশক্তি মিত্রতায় যোগদান

মারাঠাগণ যখন ইংরাজকে পশ্চিম ভারতে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে সেই সুযোগে হায়দর বহু অশ্বারোহী সেনা লইয়া হিমবাহের ন্যায় চেঙ্গামা গিরিবর্ত্ম দিয়া দক্ষিণের কর্ণাটে নামিয়া পড়েন। মহীশূরী অশ্বারোহীর দাপটে কর্ণাট অঞ্চল ছারখার হইয়া যায়। কর্ণাটে ইংরাজের রাজস্ব আদায়ের মুস্কিল দেখা দেয়। ইংরাজ অর্থ সংকটে পড়ে। এই অবস্থায় ইংরাজের পক্ষে একাকী মারাঠা-মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব দেখিয়া চতুর ওয়ারেন

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হেস্টিংস মারাঠাগণের সহিত সলবাইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা যুদ্ধ মিটাইয়া নেন। ইহার ফলে হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি হাত খালি করিয়া ফেলেন। নিজাম পাঁকাল মাছের ন্যায় পিছলাইয়া হায়দরের পক্ষ ছাড়িয়া ইংরাজের দলে ঢুকিয়া পড়িলে হায়দর মিত্রহীন হইয়া পড়েন।

ওয়ারেন হেস্টিংস হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রবীণ সেনাপতি স্যার আয়ার কূটকে দক্ষিণে পাঠান। আয়ার কুট পোর্টোনোভা ও ত্রিনোমালির যুদ্ধে (১৭৮১ খ্রীঃ) হায়দরকে পরাজিত করিলেও হায়দরের সামরিক শক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ থাকে। ইতিমধ্যে নিজ শক্তি বাড়াইবার জন্য হায়দর ফরাসী সাহায্য চান। হায়দরের সাহাযার্থে ফরাসী নৌসেনাপতি সাফ্রেনের নেতৃত্বে এক ফরাসী নৌবহর দাক্ষিণাত্যে আসিলে হায়দরের ক্ষমতা বাড়ে। ইতিমধ্যে কর্কটরোগে হায়দরের (১৭৮২ খ্রীঃ) দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যু হয়। এদিকে স্যার আয়ার কুটও দেহত্যাগ করেন।

হায়দরের মৃত্যু

হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার বীরপুত্র টিপু সুলতান তাঁহার পিতার ন্যায় বীরত্বের সহিত ইংরাজের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। কিন্তু ইওরোপে ইঙ্গ-ফরাসী শান্তি স্থাপিত হওয়ায় ফরাসীগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে টিপুকে সাহায্য না করিয়া ফিরিয়া যায়। টিপু ইহাতে না দমিয়া নিজের শক্তিতে ইংরাজের হাত হইতে ম্যাঙ্গালোর পুনরধিকার করেন। তিনি ইংরাজ সেনাপতি ম্যাথুসকে এই যুদ্ধে বন্দী করেন। ইতিমধ্যে ইংরাজ ও টিপু দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় এবং ইংরাজ কোম্পানীর অর্থসঙ্কট দেখা দেওয়ায় মাদ্রাজের ইংরাজ গভর্ণর লর্ড ম্যাকার্টনে টিপুর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধি দ্বারা ইংরাজ ও টিপু পরস্পর উভয়ের অধিকৃত স্থান ফেরৎ দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধির বিপক্ষে ছিলেন। কারণ এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-মহীশূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অবস্থা দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে এমনই খারাপ হইয়া পড়ে যে, বাংলা হইতে সাহায্য দিলেও তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ চালান সম্ভব ছিল না। যাহা হউক ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিকে মহীশূরের উন্নতির ঊর্ধসীমা বলিয়া গণ্য করা যায়। কারণ এই সন্ধির ফলে টিপুর রাজ্যসীমা প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সন্ধির পর হইতে টিপুর শক্তি ক্রমে ক্ষয় পায়।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি

হায়দর আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব (Achievements of Haidar Ali): অষ্টাদশ শতকের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস হইল দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষীগণের (Adventurer) ক্ষমতা লাভের ইতিহাস। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে এই সকল ভাগ্যান্বেষী ক্ষমতা স্থাপন করেন। হায়দর এই ধরণের ব্যক্তি। হায়দর অতি অখ্যাত অবস্থা হইতে নিজ যোগ্যতাবলে মহীশূরের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। মহীশূরের হিন্দু রাজবংশের দুর্বল শাসন-ব্যবস্থা তাঁহার চক্ষে ধরা পড়ে। নিজ উচ্চাকাংখা পূরণের জন্য তিনি এই রাজবংশকে উৎখাত করেন। হায়দর নিরক্ষর হইলেও অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি ও সামরিক

হায়দরের কৃতিত্ব

প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন রণকৌশলে দক্ষ এবং অশ্বারোহী সেনার উপযুক্ত ব্যবহারে সুপটু। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে তিনি অতর্কিতে ইংরাজকে আক্রমণ করিয়া কাবু করিয়া ফেলেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে তিনি মারাঠার সহিত জোট বাঁধিয়া ইংরাজকে নাস্তানাবুদ করেন। তাঁহার সাধারণ জ্ঞান ছিল খুবই প্রখর। হায়দর কখনও বিপদের সময় উপস্থিত বুদ্ধি হারাইতেন না। ঘোর বিপদের সময়ও তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করিতেন। কূটনীতিতে তিনি প্রায় ইংরাজের সমকক্ষ ছিলেন। ইংরাজের বিরুদ্ধে শক্তি জোট গঠন এবং হায়দরের ফরাসী সাহায্য লাভ ইহা প্রমাণ করে। তিনি পাঁচটি প্রচলিত ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারিতেন।

ডাঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ হায়দর আলিকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী শাসকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হায়দরের শত্রু আর্কটের নবাব মহম্মদ আলি তাঁহার তুজুক-ই-ওয়ালাজা গ্রন্থে হায়দরের ঘোর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই মত পক্ষপাত দুষ্ট। হায়দর স্বৈরাচারী হইলেও প্রজা-পীড়ক ছিলেন না। তিনি ধর্ম-সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহার হিন্দু প্রজাগণকে তিনি নির্যাতন করিতেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তিনি বহু শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁহার রাজস্ব নীতি ছিল উত্তম। হায়দর আলির যোগ্যতার বড় প্রমাণ এই যে, তাঁহার জীবিতকালে ইংরাজ শক্তি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে স্বস্তিবোধ করে নাই। যে যুগে মহম্মদ আলি, নিজাম ও রঘুনাথ রাও প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কেরা ইংরাজের বশংবদ হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সেই যুগে হায়দর ছিলেন ইহার এক বিরাট ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী লোক। তবে হায়দরের কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের পরিবেশের অভাব হায়দরের আমলে ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯২ খ্রীঃ (Third Anglo Mysore War): ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪ খ্রীঃ) কোম্পানীর স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। একথা আগেই বলা হইয়াছে। এই সন্ধির দ্বারা কোম্পানীর পক্ষে টিপুর শক্তি খর্ব করা সম্ভব হয় নাই। এই সন্ধির পরেও টিপু দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ শক্তির পথের কাঁটা হইয়া থাকেন। এই কারণে কোম্পানীর পরিচালক সমিতি ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির সমালোচনা করেন। ফলে টিপুর সহিত কোম্পানীর বিরোধ জিয়াইয়া থাকে। এদিকে পিটের ভারত শাসন আইন পাশ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আদেশ দেয় যে, আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোন কারণে কোম্পানী ভারতীয় রাজাগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না। ফলে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ভাঙিয়া কোম্পানীর পক্ষে আবার টিপুকে আক্রমণ করায় আইনগত বাধা দেখা দেয়।

কোম্পানীর আক্রমণ নীতি: কর্ণওয়ালিস কর্তৃক এই নীতি ভঙ্গ

লর্ড কর্ণওয়ালিস বড়লাট নিযুক্ত হইয়া টিপুর কাজকর্মের দিকে কড়া নজর দেন। কর্ণওয়ালিস ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফেরৎ সেনাপতি। আমেরিকার যুদ্ধে ফরাসীরা কিভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের সাহায্য করিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন। ইংরাজকে ধ্বংস করিবার জন্য টিপু ফরাসী ও তুর্কী শক্তির সাহায্য পাইবার

চেষ্টা করেন, একথা কর্ণওয়ালিস জানিতেন। টিপু যদি ফ্রান্স হইতে সাহায্য পাইতেন, তবে এই সূত্রে ফরাসীরা ভারতে ঢুকিতে পারিত। টিপুর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি কর্ণওয়ালিসের আদপেই পছন্দ ছিল না। কারণ তিনি জানিতেন যে টিপু সুযোগ পাইলেই কোম্পানীর রাজ্য আক্রমণ করিবেন। এজন্য কর্ণওয়ালিস পাকে প্রকারে টিপুকে ধ্বংস করিবার সংকল্প নেন।

টিপুর ফরাসী ও তুর্কী সাহায্য লাভের চেষ্টা

কোম্পানী ১৭৮৮ খ্রীঃ নিজামের নিকট হইতে গুন্টুর জেলা লাভ করে। ইহার বিনিময়ে কোম্পানী নিজামকে মসুলিপটমের সন্ধি দ্বারা বালাঘাট জেলা দিতে স্বীকার করে। এদিকে কোম্পানী ইহার আগে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা (১৭৮৪ খ্রীঃ) বালাঘাট জেলা টিপুকে ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এই জায়গা এখন মসুলিপটমের সন্ধি দ্বারা নিজামকে দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে টিপু ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিভঙ্গের জন্য বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। টিপুর বিরুদ্ধে এই পরস্পর বিরোধী কাজ কর্ণওয়ালিস ইচ্ছা করিয়া করেন।

গুন্টুর সমস্যা

মসুলিপটমের সন্ধির পর কর্ণওয়ালিস নিজামের সহিত একটি মিত্র জোট গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি নিজামকে একটি পত্র দ্বারা কাহারা এই মিত্র জোটে থাকিবে তাহা জানান। এই তালিকায় নিজাম ও মারাঠার নাম থাকিলেও টিপুর নাম বাদ দেওয়া হয়। ইহার অর্থ হইল যে, কর্ণওয়ালিস টিপুর সহিত মিত্রতা রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কর্ণওয়ালিসের এই নীতি ছিল দুরভিসন্ধিমূলক। কারণ ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা তিনি টিপুকে মিত্র হিসাবে স্বীকার করেন। এই সন্ধি নাকচের নোটিশ না দিয়া তিনি গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন। ইহা দ্বারা কর্ণওয়ালিস রাজনৈতিক সততা রক্ষা করেন নাই।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের টিপু বিরোধী মিত্রতা জোট গঠন

কর্ণওয়ালিসের এই পত্রের কথা টিপু তাঁহার গোপন দূত মারফৎ জানিতে পারেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি চালাইতেছেন। টিপু ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ইংরাজের আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। ইহাতে কর্ণওয়ালিস ঘোষণা করেন যে ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিয়া টিপু ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ভাঙিয়াছেন। ফলে তিনি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

টিপু কর্তৃক ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ; তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

অধিকাংশ ঐতিহাসিক তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের জন্য কর্ণওয়ালিসকেই দায়ী সাব্যস্ত করেন। ত্রিবাঙ্কুর প্রসঙ্গ ছিল যুদ্ধ ঘোষণার জন্য কর্ণওয়ালিসের একটি অজুহাত মাত্র। ডাঃ মহিবুল হাসানের মতে টিপু ত্রিবাঙ্কুরের সহিত গোলমাল মিটাইয়া দেওয়ার জন্য কর্ণওয়ালিসকে অনুরোধ করিলে কর্ণওয়ালিস তাহাতে কান দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কর্ণওয়ালিস নিজাম ও মারাঠার সহিত টিপু বিরোধী জোট গড়িয়া নিজেই ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ভাঙেন। তিনি ঠাণ্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিতভাবে একটি স্বীকৃত সন্ধিকে নস্যাৎ

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের জন্য কর্ণওয়ালিসের দায়িত্ব

করার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয়তঃ, বালাঘাট জেলা নিজামকে দিয়া কর্ণওয়ালিস টিপুর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেন। চতুর্থতঃ, কর্ণওয়ালিস পিটের ভারত শাসন আইনের অনাক্রমণ নীতিকেও অগ্রাহ্য করেন। পিটের ভারত শাসন আইনে কোম্পানীকে কোন অনাক্রমণমূলক যুদ্ধ না করিতে বলা হয়। টিপুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া কর্ণওয়ালিস এই আইন লঙ্ঘন করেন। সুতরাং লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই যুদ্ধ ছিল নিছক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

মারাঠা, নিজাম ও ইংরাজ সেনা একযোগে মহীশূর আক্রমণ করিলে টিপু দুই বৎসর কাল বীরত্বসহ বাধা দেন। কর্ণওয়ালিস নিজে ইংরাজ সেনা পরিচালনা করিয়া টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিলে বাধ্য হইয়া টিপু ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি

শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি (১৭৯২ খ্রীঃ) অনুসারে (১) টিপু তাঁহার রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরাজকে ছাড়িয়া দেন। (২) যুদ্ধ বাবদ প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। (৩) টিপুর ছাড়িয়া দেওয়া রাজ্যের কিছু অংশ মারাঠাগণকে দেওয়া হয়, বাকী অংশ কোম্পানী গ্রহণ করে। (৪) সন্ধির জামিনস্বরূপ টিপুর দুই কিশোর পুত্রকে কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধির ফলে মহীশূর খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। কোম্পানী দক্ষিণ ভারতে বিরাট প্রতিপত্তি লাভ করে।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯৯ খ্রীঃ (Fourth Anglo-Mysore war) : শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধির দ্বারা মহীশূরের অঙ্গচ্ছেদ করা হইলেও, মহীশূরের ব্যাঘ্র টিপু তখনও তাঁহার নষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাইয়া যান। ফরাসী বীর

টিপুর ফরাসী সাহায্য লাভের চেষ্টা : মরিশাসে দুত প্রেরণ

নেপোলিয়নের আক্রমণে ইওরোপ মহাদেশে ইংরাজের দুর্দশার খবর তিনি রাখিতেন। সুতরাং ইংরাজের পক্ষে ফরাসী সহায়তা লাভের জন্য ভারত মহাসাগরে ফরাসী ঘাঁটি মরিশাস দ্বীপে তিনি দূত পাঠান। মরিশাসের ফরাসী গভর্ণর ম্যালারটিক টিপুকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিতে না পারিলেও একটি ঘোষণার দ্বারা ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকগণকে টিপুর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে অনুমতি দেন। মরিশাস হইতে অল্প সংখ্যক ফরাসী স্বেচ্ছাসেনা টিপুর পক্ষে যোগ দিতে মহীশূরে আসে। টিপু বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী ফরাসী সরকারের সহিত মিত্রতার নিদর্শন-স্বরূপ মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে "Tree of Liberty" বা স্বাধীনতার স্মারক স্থাপন করেন। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ ছিল "Liberty" বা স্বাধীনতা। টিপু তাহা স্মরণ করিবার জন্য এই স্মারক স্থাপন করেন। এছাড়া টিপু বিপ্লবী জ্যাকোবিন দলের সদস্য পদ পান। কয়েকজন ফরাসী জ্যাকোবিন তাঁহার দরবারে হাজির হয়। টিপু ইংরাজের বিরুদ্ধে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের ইসলামীয় শক্তির সহায়তাও চান। কিন্তু ইহাতে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হন নাই।

বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি টিপুকে ইংরাজের "প্রধান চিরশত্রু" (Great ancient enemy) বলিয়া গণ্য করিতেন। টিপুর ফরাসী সাহায্য লাভের চেষ্টাকে কোম্পানীর স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিতেন। তিনি

ভুলিয়া যান যে স্বাধীন নৃপতি হিসাবে টিপুর যে কোন রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার ছিল। ইহাতে ইংরাজের কিছু বলিবার ছিল না। ওয়েলেসলি আইন মান্য করিয়া চলিবার লোক ছিলেন না। সুতরাং ফরাসী মিত্রতা চাহিবার জন্য তিনি টিপুর কৈফিয়ৎ তলব করেন। টিপুর উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় ওয়েলেসলি টিপুর স্বাধীনতা হরণের সিদ্ধান্ত নেন। ঐতিহাসিক জেমস মিল ও ডাঃ মহিবুল হাসানের মতে টিপুর সহিত ফরাসীগণের সম্পর্ক ছিল অকিঞ্চিৎকর। ইহার দ্বারা ইংরাজের ক্ষতির সম্ভাবনা তেমন ছিল না। কিন্তু ইহা লইয়া ওয়েলেসলি বাড়াবাড়ি করেন।

ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী নীতি

ওয়েলেসলি নিজাম ও মারাঠার সহিত ত্রিশক্তি চুক্তি স্থাপন করিয়া টিপুকে কোম্পানীর সহিত বশ্যতামূলক মৈত্রী গ্রহণের দাবী জানান। টিপু এই প্রস্তাব নাকচ করিলে ইংরাজ ও মিত্র সেনাদল মহীশূর আক্রমণ করে। সদাশির ও মলভেলীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া টিপু রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার জন্য প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। টিপুর মৃত্যুর সহিত মহীশূরের স্বাধীন নবাবীর পতন হয়। ওয়েলেসলি মহীশূর রাজ্যকে তিন ভাগ করিয়া এক অংশ নিজামকে, অপর অংশ কোম্পানীর আশ্রিত হিসাবে মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশকে দেন। অবশিষ্ট অংশ কোম্পানী অধিকার করে।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ: টিপুর পতন

টিপুর কৃতিত্ব ও পতনের কারণ (Estimate of Tipu and causes of his downfall): অষ্টাদশ শতকের ভারত ইতিহাসে টিপু সুলতান তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় রাজাগণ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারেন। মারাঠা পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও, হায়দরাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব যখন বিনা যুদ্ধে কোম্পানীর দেওয়া স্বাধীনতার শিকল গলায় পরেন, তখন টিপু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরণ লড়াই চালান। নিজাম ও পেশবা বশ্যতামূলক সন্ধি স্বাক্ষর করিলেও টিপু বটবৃক্ষের ন্যায় একাই ইংরাজ আক্রমণের ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। অধিকন্তু অদূরদর্শী মারাঠা ও নিজাম ইংরাজের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্তু টিপু ইহাতে দমেন নাই। টিপুর আন্তর্জাতিক রাজনীতির জ্ঞান সমসাময়িক সকল ভারতীয় রাজা অপেক্ষা উন্নত ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাজ বিরোধী শক্তি যথা—ফ্রান্স ও তুরস্কের তিনি সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন। তৎকালীন আর কোন ভারতীয় রাজা টিপুর ন্যায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ইংরাজের উন্নত রণকৌশল লক্ষ্য করিয়া তিনি মহীশূরের সামরিক বাহিনীকে আধুনিক ইওরোপীয় কায়দায় লড়াই করিতে শিক্ষা দেন।

টিপুর স্বাধীনতা প্রেরণা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জ্ঞান



টিপু সুলতান

টিপু ইংরাজের গুপ্ত শত্রুতার কথা ভালভাবে বুঝিতেন। মুখে সন্ধি স্থাপন করিয়া কাজে তাহা ভঙ্গ করার ইংরাজ কূটনীতি তিনি ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি ইংরাজ সম্পর্কে সতর্ক থাকিতেন। এক কথায় অন্যান্য ভারতীয় রাজার ন্যায় তিনি অসহায়ভাবে ইংরাজের হাতে মার খান নাই।

যোদ্ধা ও সেনাপতি হিসাবে টিপু তাঁহার পিতার ন্যায় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। হায়দর ছিলেন রণকৌশলে অতিশয় দক্ষ। টিপু ছিলেন মহীশূরের বাঘের ন্যায় সাহসী ও মারমুখী, কিন্তু যুদ্ধকৌশলে তিনি কম দক্ষ ছিলেন। হায়দর আক্রমণমুখী রণনীতির দ্বারা ইংরাজকে ঘায়েল করেন। টিপু আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালাইয়া ভুল করেন। কেহ কেহ বলেন, যে "হায়দর সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন; টিপু সাম্রাজ্য নষ্ট করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন।"[১] এই উক্তি সু-প্রযুক্ত নহে। মাদ্রাজের সন্ধির পরেও হায়দর ইংরাজের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তিনি দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ অসমাপ্ত রাখিয়া যান। তিনি জীবিত থাকিলে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ভারতের সকল দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ না করিয়া ইংরাজ ক্ষান্ত হয় নাই। সুতরাং ইংরাজের হাত হইতে মহীশূরের একক স্বাধীনতা রক্ষা করা টিপুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় শক্তি যথা—মারাঠা ও নিজাম প্রভৃতি আগাগোড়া মহীশূরের বিরোধিতা করে। ইংরাজ ইহার সুযোগ নেয়। টিপুর পরাজয় ও পতন প্রায় অনিবার্য ছিল। কারণ ওয়েলেসলির বশ্যতামূলক নীতি ভারতীয় কোন শক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব রাখিতে দেয় নাই। নিজাম প্রভৃতি বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেও টিপু বিনা যুদ্ধে বশ্যতা অপেক্ষা, যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টাকে শ্রেয় মনে করেন। টিপুর পরাজয় ছিল এক মহান ও গৌরবজনক বিফলতার স্বাক্ষর মাত্র।

টিপুর কৃতিত্ব: পতনের কারণ

ইংরাজ লেখক বাওরিং, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি টিপুর বিরুদ্ধে নৃশংসতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির অভিযোগ করিয়াছেন। ইহা তথ্যসহ নহে। আধুনিক গবেষকগণের মতে টিপু অকারণে নিষ্ঠুরতা দেখান নাই। যে সকল হিন্দু ও অন্যান্য প্রজা তাঁহার শত্রুতা করিত তাহাদের তিনি ধর্মান্তর করেন ও তাহাদের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। ইহা রাজনৈতিক প্রয়োজনে করিতে হয়। টিপুর শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব নীতি অন্যান্য দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা উন্নত ছিল।

টিপুর শাসন নীতি

———

১. "Haidar was born to create an empire and Tipu to lose it"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার : মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

(Growth of Indian Empire : Rise and Disintegration of Maratha Empire)

প্রথম মাধব রাও : তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের (১৭৬১ খ্রীঃ) পর মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান (Madhab Rao I : Revival of the Marathas after the Third Battle of Panipat) : তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) কিভাবে আফগান সুলতান আহমদ শাহ আবদালীর হস্তে মারাঠা শক্তির পতন ঘটে তাহা প্রথম অধ্যায়ে (বিস্তৃত বিবরণ পৃঃ ৯ দেখ) আলোচনা করা হইয়াছে। পেশবা বালাজী বাজীরাও পানিপথের পরাজয়ের পর ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র প্রথম মাধব রাও মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে পেশবার গদীতে বসেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে পানিপথের যুদ্ধের ক্ষতির ধাক্কা সামলাইয়া নেন। মাধবরাও পুনরায় নষ্ট মারাঠা শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন।

প্রথম মাধব রাও

প্রথম মাধব রাও পেশবার গদীতে বসিলেও তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও পেশবা পদ লাভ করিতে ব্যগ্র ছিলেন। আপাততঃ তিনি তাঁহার কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্র পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের রাজ-প্রতিনিধির পদ পান। ইতিমধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম মারাঠার গৃহ-বিবাদের সুযোগ লইয়া রাজ্য বিস্তারের আশায় মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন। রাক্ষসভুবনের যুদ্ধে নিজাম আলি মারাঠাদের হাতে পরাজিত হন। কিন্তু নিজামকে হাতে রাখিবার জন্য এবং মাধব রাওয়ের বিরুদ্ধে তাঁহাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের আশায় রঘুনাথ রাও তাঁহার সহিত খুবই উদার শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। এবিষয়ে তিনি মাধব রাওয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। কিশোর পেশবা প্রথম মাধব রাও ইহাতে ক্ষুব্ধ হন।

নিজামের শক্তি খর্ব রাক্ষসভুবনের যুদ্ধ

পেশবা প্রথম মাধব রাও ইহার পর তাঁহার প্রতিবেশী মহীশূরের হায়দর আলির প্রতি দৃষ্টি দেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠার পরাজয়ের সুযোগ লইয়া হায়দর আলি মারাঠা সাম্রাজ্যের একাংশ গ্রাস করিয়াছিলেন। মাধব রাও হায়দরকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ১৭৬৪ খ্রীঃ দুইবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু রঘুনাথ রাওয়ের হস্তক্ষেপে হায়দরের সহিত উদার শর্তে সন্ধি স্থাপন করা হয়। রঘুনাথ রাওয়ের কু-উদ্দেশ্য বুঝিয়া পেশবা মাধব রাও তাঁহাকে রাজ-প্রতিনিধির পদ হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার গতিবিধির উপর নজর রাখেন। পেশবা মাধব রাও এইবার নিজে হায়দরের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে হায়দারকে পর্যুদস্ত করিয়া পেশবা তাঁহার শক্তি চূর্ণ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু এই সময় পেশবা নিদারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে

মারাঠা-মহীশূর যুদ্ধ : দক্ষিণ ভারতে মারাঠা আধিপত্য স্থাপন

হায়দর কোন রকমে রক্ষা পান। ফলে হায়দর আলিকে উদার শর্তে সন্ধি দেওয়া হয়। তবে মাধব রাওয়ের দক্ষতায় দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণের নিরংকুশ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। পেশবা মাধব রাও হায়দর আলির ক্ষমতা সংকোচন করিবার ফলে হায়দরের পক্ষে মারাঠা শক্তির মূল ক্ষমতা ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই।

উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির পুনঃস্থাপন ; মাধব রাওয়ের মৃত্যু

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের বিপর্যয়ের পর পেশবা মাধব রাও উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য পুনরুদ্ধারের মানসে মহাদজী সিন্ধিয়া প্রভৃতি সেনাপতির নেতৃত্বে অভিযান পাঠান। ফলে উত্তর ভারতের মালব, বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মারাঠা আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয়। রাজপুত রাজাগণ ও জাঠগণ পুনরায় মারাঠাগণকে চৌথ কর দিতে বাধ্য হয়। মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমকে মারাঠাগণ ইংরাজ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করিয়া নিজ হাতে নেয়। দিল্লীতে পুনরায় মারাঠা সেনাদল প্রবেশ করে। কিন্তু মারাঠা শক্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইবার আগেই পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের অকাল-মৃত্যুর ফলে (১৭৭২ খ্রীঃ) ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। ঐতিহাসিক গ্র্যাণ্ট ডাফ এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, "পানিপথের যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষা পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের অকাল-মৃত্যু মারাঠা জাতির পক্ষে অধিক ক্ষতিকারক ছিল।"[1] পেশবা মাধব রাও মারাঠা নষ্ট শক্তি যেরূপ দ্রুতবেগে উদ্ধার করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে এই কথা মনে হয় যে, তিনি জীবিত থাকিলে মারাঠাগণ এক প্রবল শক্তিতে পরিণত হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর অপদার্থ লোকেরা পেশবার গদীতে বসায় মারাঠা শক্তির দ্রুত পতন ঘটে।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও সলবাইয়ের সন্ধি, ১৭৭৬-৮২ খ্রীঃ (First Anglo-Maratha war and the Treaty of Salbye): মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইলে উদীয়মান ভারতীয় শক্তিগুলির মধ্যে মারাঠাগণই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে। ইতিমধ্যে মারাঠাদের সহিত আফগানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ইহার ফলে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আফগান আবদালীর নিকট মারাঠাদের পরাজয় ঘটে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠার সাময়িক পতনের সুযোগে বাংলায় ও কর্ণাটকে ইংরাজ শক্তি দৃঢ়ভাবে নিজ ক্ষমতা স্থাপন করে। এদিকে পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা নেতা পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠাগণ উত্তর ভারতে দ্রুত ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। ইহাতে ইংরাজ শক্তি শংকা বোধ করে। উত্তর ভারতে মারাঠার আক্রমণ হইতে বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবের সহিত বেনারসের সন্ধি স্থাপন করেন। ইংরাজ ও মারাঠা উভয় শক্তিরই আকাংখা ছিল ভারতে একাধিপত্য স্থাপন। ফলে ইংরাজের সহিত মারাঠার সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

মারাঠা শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ইংরাজের আতংক

১. "The plains of Panipath were not more fatal to the Maratha Empire than the early end of this excellent prince"—Grant Duff.

এদিকে পেশবার গদী লইয়া মারাঠা নেতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে মারাঠাগণ তাহাদের নবোদিত ক্ষমতাকে দৃঢ় করিতে ব্যর্থ হয়। পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও (১৭৭২ খ্রীঃ) পেশবার গদীতে বসেন। নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নিজে পেশবার গদী পাইবার জন্য আকাংখা পোষণ করিতেন। তাঁহারই চক্রান্তে গুপ্ত-ঘাতকেরা কিশোর পেশবা নারায়ণ রাওকে হত্যা করেন। নিহত নারায়ণ রাওয়ের কোন উত্তরাধিকারী আপাততঃ না থাকায় তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও পেশবার গদীতে বসেন। নব নিযুক্ত পেশবা রঘুনাথ রাও সমরদক্ষ লোক হইলেও পুনা দরবারের মারাঠা নেতাগণ তাঁহাকে ঘোর অপছন্দ করিত।

নারায়ণ রাওয়ের হত্যা, রঘুনাথ রাওয়ের পেশবা পদ লাভ

ইতিমধ্যে সদ্য নিহত পেশবা নারায়ণ রাওয়ের পত্নী গঙ্গাবাঈ এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। পুনা দরবারের নেতাগণ, যথা, নানা ফড়নবীশ, মহাদজী সিন্ধিয়া প্রভৃতি কালবিলম্ব না করিয়া এই বালককে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করেন। শিবাজীর বংশধর ছত্রপতির নিকট হইতে এই বালককে পেশবা হিসাবে অনুমোদন নেওয়া হয়। এই বালকের নাম হয় দ্বিতীয় মাধব রাও। পুনা দরবারের সভাপণ্ডিত রাম শাস্ত্রী তদন্ত করিয়া রঘুনাথ রাওকে পেশবা নারায়ণ রাওয়ের হত্যার জন্য দায়ী করেন। ফলে রঘুনাথ রাও পেশবার গদী হইতে পদচ্যুত হন।

মাধব রাও নারায়ণকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা; রাঘোবার পদচ্যুতি

রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা অত্যন্ত উচ্চাকাংখী লোক ছিলেন। তিনি গদীচ্যুত হইয়া ইহা পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। পুনায় ইংরাজ প্রতিনিধি রঘুনাথ রাওকে সিংহাসন লাভে সাহায্যের আশ্বাস দেন। এদিকে বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মারাঠা গৃহ-বিবাদের সুযোগে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বোম্বাইয়ের পার্শ্ববর্তী সলসেট দখলের জন্য ব্যগ্র ছিল। সুতরাং বোম্বাই কর্তৃপক্ষ রঘুনাথ রাওয়ের সহিত ১৭৭৫ খ্রীঃ সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধি অনুসারে রঘুনাথ রাও সলসেট ও বেসিন নামক দুইটি স্থান ইংরাজকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন। সুরাট ও ব্রোচের রাজস্বও কোম্পানীকে তিনি দিতে রাজী হন। ইহার বিনিময়ে বোম্বাই কর্তৃপক্ষ রঘুনাথকে পেশবার গদীতে বসাইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এজন্য কোম্পানী রঘুনাথকে ২৫০০ ইংরাজ সৈন্য সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করে। এই ইংরাজ সৈন্যের খরচ রঘুনাথ বহন করিতে অঙ্গীকার দেন। মোট কথা সুরাটের সন্ধির দ্বারা ইংরাজ শক্তি পুনা দরবারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়।

রঘুনাথ রাওয়ের ইংরাজ মিত্রতা গ্রহণ; সুরাটের সন্ধি

সুরাটের সন্ধি দ্বারা পুনার মারাঠা কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরাজের যুদ্ধের সূচনা হয়। বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণের বা দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের অভিভাবক হিসাবে নানা ফড়নবীশ এই সন্ধি মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মাধব রাও নারায়ণের পক্ষ লইয়া ১২ জন মারাঠা প্রধান বার ভাইয়ের সমিতি গঠন করে। ইহাতে নানা, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি মারাঠা প্রধান-গণ ছিলেন। ইঁহারা সুরাটের সন্ধি নাকচ করিয়া ইংরাজ সেনাকে বাধা দিতে সিদ্ধান্ত

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ: আরাসের যুদ্ধ

নেন। ইংরাজ সেনাদল পুনার দিকে আগাইয়া আরাসের (Arras) যুদ্ধে পুনা ও মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত করে। ইহার ফলে রঘুনাথ পেশবার গদীতে ইংরাজের আশ্রয় পুষ্ট হইয়া বসেন।

এদিকে রেগুলেটিং এ্যাক্ট নামক আইন অনুসারে বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের কলিকাতাস্থিত গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের বিনা অনুমোদনে সন্ধি করিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং কলিকাতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না লইয়া বোম্বাই কর্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধি করায় ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধিকে "বে আইনী, অবিবেচনা-প্রসূত ও অনুমোদনহীন" (Impolitik, Unjust and Unauthorised) বলিয়া নাকচ করিয়া দেন। ইহার পর কর্ণেল আপটনকে পুনায় পাঠাইয়া ওয়ারেন হেস্টিংস পুনা কর্তৃপক্ষের সহিত পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা (১) ইংরাজগণ রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করে, (২) রঘুনাথকে পেশবার গদীর বদলে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়, (৩) কোম্পানী সলসেট দ্বীপ পায় এবং যুদ্ধের দরুন পুনার দরবার হইতে খরচ পায়। এদিকে বোম্বাই কর্তৃপক্ষ কলিকাতা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে বিরক্ত হইয়া বিলাতে পুরন্দরের সন্ধির বিরুদ্ধে আপীল করে। আপীলের বিচারে বিলাতের পরিচালক সভা শেষ পর্যন্ত পুরন্দরের সন্ধিকে বাতিল করিয়া সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিলে ওয়ারেন হেস্টিংস পুনরায় রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ পুনরায় প্রবল বেগে আরম্ভ হয়।

কলিকাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুরাটের সন্ধি নাকচ : পুরন্দরের সন্ধি

কূটবুদ্ধি নানা ফড়নবীশ ইংরাজ শক্তিকে ঘায়েল করিবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে মহীশূরের হায়দর আলির সহিত পুনা সরকারের মিত্রতা স্থাপন করেন। ফলে মারাঠা ও মহীশূর বাহিনী একযোগে ইংরাজকে আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে ইংরাজ সৈন্য পুনার দিকে আগাইলে, মারাঠা সেনাপতি মহাদজী সিন্ধিয়া তাহাদের তেলেগাঁও নামক স্থানে ঘিরিয়া ফেলেন। তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ওয়াদগাঁওয়ের অপমানজনক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ

ওয়ারেন হেস্টিংস এই অপমানজনক সন্ধিকে নাকচ করিয়া দেন। তিনি সেনাপতি গডার্ডের সাহায্যে গুজরাট আক্রমণ করিয়া মারাঠা সামন্ত ফতে সিং গাইকোয়াডের সহিত ইংরাজের মিত্রতা স্থাপন করেন। ইহার দ্বারা পুনা দরবারকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মারাঠাগণ ইহাতে না দমিয়া বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকে। ইংরাজ শক্তি ক্রমে এই দীর্ঘ যুদ্ধে দুর্বল হইয়া পড়ে। ওয়ারেন হেস্টিংস পুনা দরবারের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য মহাদজী সিন্ধিয়াকে অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত মহাদজী সিন্ধিয়ার হস্তক্ষেপে সলবাইয়ের সন্ধি দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়।

ইংরাজগণের পাল্টা আক্রমণ : সন্ধি স্থাপন

সলবাইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা (১) ইংরাজ শক্তি মাধব রাও নারায়ণকে আইনসঙ্গত পেশবা হিসাবে স্বীকার করে। (২) রঘুনাথকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) ইংরাজগণ সলসেট দ্বীপ পায়। (৪) এছাড়া ইংরাজগণ থানা প্রভৃতি বোম্বাই সংলগ্ন অঞ্চল পায়। (৫) যুদ্ধের সময় সিন্ধিয়ার অধিকৃত রাজ্য ইংরাজেরা ফিরাইয়া দেয়। (৬) সিন্ধিয়া সলবাইয়ের সন্ধির জামিন থাকেন।

সলবাইয়ের সন্ধি, ১৭৮২ খ্রীঃ

সলবাইয়ের সন্ধি দ্বারা মারাঠা ও ইংরাজের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বনাশা মারাঠা যুদ্ধের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহীশূরের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক মনে করেন যে সলবাইয়ের সন্ধির দ্বারা ইংরাজেরা মারাঠাগণকে ঘায়েল করিয়া ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সলবাইয়ের সন্ধি দ্বারা ইংরাজের পক্ষে মারাঠা শক্তি ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। ইংরাজের এই যুদ্ধে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের মতে কোম্পানী মারাঠা শিকারের উপর ফণা দিয়া দংশন করে কিন্তু তাহাতে মারাঠাগণের তেমন কোন কিছু ক্ষতি হয় নাই। ঐতিহাসিক সরদেশাইয়ের মতে সলবাইয়ের সন্ধি ছিল ইংরাজের কূটনৈতিক ব্যর্থতার স্বাক্ষর। মারাঠাগণকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজকে আরও অনেক-দিন অপেক্ষা করিতে হয়।

নানা ফড়নবীশের কৃতিত্ব (Achievements of Nana Fadnis) : তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা ইতিহাসে যে কয়েকজন নেতার উদয় হয় নানা ফড়নবীশ তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানা ফড়নবীশের আসল নাম ছিল বালাজী জনার্দন। তিনি পেশবার দপ্তরে অর্থ-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর কাজ করার জন্য ফড়নবীশ বলিয়া পরিচিত হন। পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের আমলে নানা পুনা দরবারের একজন প্রধান কর্মচারী হিসাবে স্থান পান। পেশবা নারায়ণ রাওয়ের হত্যার পর, ষড়যন্ত্রকারী রঘুনাথকে হঠাইয়া নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্রকে পেশবার পদে স্থাপন ছিল নানার অন্যতম কৃতিত্ব। তিনিই বার ভাইয়ের সমিতি গড়িয়া রঘুনাথ রাওয়ের হাত হইতে বালক পেশবাকে রক্ষার আয়োজন করেন। ক্রমে বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণের অভিভাবক-রূপে, নানা ফড়নবীশ সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেন।

নানার উন্নতি লাভ



নানা ফড়নবীশ

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নানা মহীশূর, নিজাম ও মারাঠা লইয়া ইংরাজ বিরোধী ত্রিশক্তি চুক্তি গড়িয়া তাঁহার কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর নানা দক্ষিণ ভারতে মহীশূর ও নিজাম প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পর্যুদস্ত করেন। দক্ষিণ ভারতে মারাঠা প্রাধান্য স্থাপিত হয়। উত্তর ভারতে মহাদজী সিন্ধিয়ার সাফল্যকে নানা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল

নানার কূটনৈতিক দক্ষতা

যে সিন্ধিয়া পেশবার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া উত্তর ভারতে স্বাধীন শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন। এই আশঙ্কাবশতঃ তিনি রাজপুত যুদ্ধের সময় মারাঠা সেনাপতি হোলকারকে সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। এইভাবে তিনি সিন্ধিয়াকে জব্দ করার চেষ্টা করেন। মোট কথা নানা তাঁহার ক্ষমতা লাভের বাধাস্বরূপ সিন্ধিয়াকে গণ্য করিতেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তিকে মজবুত করিলেও, উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তারের জন্য নানা ফড়নবীশ কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টির পরিচয় দেন নাই।

নানা ছিলেন খুব উচ্চাকাংখী ও ধূর্ত লোক। তাঁহার কূটনৈতিক দক্ষতার জন্য তাহাকে "মহারাষ্ট্রের ম্যাকিয়াভেলী" বলা হয়। বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণকে নিজের হাতের মুঠায় রাখিয়া নানা পেশবা দপ্তরের সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণ নানার কঠোর নিয়ন্ত্রণে বিরক্ত হইয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার ফলে পেশবার শূন্য গদিতে রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও বসেন। ইহার পর নানার ভাগ্যরবি অস্তমিত হয়। শেষ জীবনে তিনি অপমান ও হতাশার মধ্যে কাটান। ১৮০০ খ্রীঃ এই বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ফলে পুনা দরবারের "শেষ বিজ্ঞতম ব্যক্তির" (Last great wiseman) আসন শূন্য হয়।

নানার উচ্চাকাংখা ও পতন

মহাদজী সিন্ধিয়ার কৃতিত্ব (Achievements of Mahadaji Sindhia) ঃ অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ও সমরবিশারদ হিসাবে মহাদজী সিন্ধিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দত্তাজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহাদজী সিন্ধিয়া এই বংশের নেতৃত্ব পান.। মহাদজী ছিলেন খুবই বাস্তববুদ্ধিধর লোক। তাঁহার সমরকুশলতা ছিল খুবই সাফল্যপূর্ণ। পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের আদেশে তিনি নর্মদা পার হইয়া উত্তর ভারতে মারাঠার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য আসেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা এবং মুঘল দরবারের ওমরাহগণের দলাদলির সুযোগ লইয়া তিনি দ্রুত মারাঠা আধিপত্য ফিরাইয়া আনেন। ১৭৮৪ খ্রীঃ তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট ভকিল-ই-মুতালিকত উপাধি পান এবং বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে বাদশাহী কর আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন। বাদশাহের ছায়ায় তিনি দ্রুত মারাঠা কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন।

উত্তর ভারতে মহাদজীর আধিপত্য স্থাপন


মহাদজী সিন্ধিয়া

রাজপুতানার জয়পুরে তিনি বাদশাহের তরফে কর আদায়ের জন্য অভিযান চালাইলে রাজপুত ও আফগান সেনাপতি গোলাম কাদির তাঁহাকে যুগ্মভাবে বাধা দেন। টুঙ্গার যুদ্ধে মহাদজীর বাহিনী ইহাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়। মহাদজী পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করেন। এই বিপর্যয়ের সময় তিনি পুনা হইতে

রাজপুতানা জয় ও বিরোধী আফগান শক্তির ধ্বংস সাধন

সাহায্য চাহিলে, নানা মহাদজীর বিপদের সুযোগ লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে হোলকারকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহাদজী ইহাতে না দমিয়া পাল্টা আক্রমণে গোলাম কাদির, ইসমাইল বেগ প্রভৃতি আফগান সর্দারকে নিহত করেন। দিল্লী ও উত্তর ভারতে তিনি নিজ ক্ষমতা পুনঃস্থাপন করেন। ইহা দ্বারা মহাদজীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাকে বেড়া জালে ফেলিয়া মহাদজী তাঁহার রণ-পাণ্ডিত্য দেখান। তবে ইংরাজদের উন্নত রণকৌশলের মূল্য তিনি বুঝিতে পারেন। পাশ্চাত্য রণকৌশল আয়ত্ব না করিলে ভারতীয়গণের স্বাধীনতা ইংরাজদের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। এজন্য তিনি পেরণ (Perron), ডি বইন (de' Boigne) প্রভৃতি ফরাসী সেনাপতির দ্বারা তাঁহার সেনাদলকে তালিম দেন। তিনি মারাঠাদের পুরাতন পন্থার যুদ্ধকৌশল ত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতের ছত্রী, রাজপুত ও বিহারীদের লইয়া কামান সজ্জিত ভারী পদাতিক সেনা গড়েন। ইংরাজেরা মহাদজীর কার্যকলাপ খুবই ভয়ের চক্ষে দেখিত। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর ফলে (১৭৯৪ খৃঃ) মহাদজীর স্বপ্ন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। মহাদজীকে এইজন্য ঐতিহাসিকেরা "মহারাষ্ট্রের শেষতম শ্রেষ্ঠ নায়ক" (Last great chieftain) বলিয়া অভিহিত করেন।

মহাদজীর সামরিক সংগঠন

মহাদজীর রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি নানা ফড়নবীশ অপেক্ষা কম ছিল না। নানা কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতে মারাঠা আধিপত্যের কথা ভাবেন। উত্তর ভারতে মারাঠা কর্তৃত্ব স্থাপন না করিলে দক্ষিণে ক্ষমতা টিকিবে না ইহা নানা বুঝিতেন না। মহাদজী সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। মহাদজী ও নানা ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। মহাদজীর অকাল বিয়োগে নানা পেশবা দরবারে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হন।

কৃতিত্ব

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ : বেসিনের সন্ধি : পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও (Second Anglo-Maratha War : Treaty of Bassien : Baji Rao II) : অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে মারাঠা রাষ্ট্রমণ্ডলের ভাঙন আরম্ভ হয়। মহাদজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ ও নানা ফড়নবীশের ন্যায় অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞগণের মৃত্যুর ফলে মারাঠা রাষ্ট্রে উপযুক্ত নেতার অভাব দেখা দেয়। নবীন নায়কেরা, যথা, পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও, দৌলতরাও সিন্ধিয়া, যশোবন্ত হোলকার প্রভৃতি ছিলেন অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাঁহাদের নেতৃত্বে মারাঠা রাষ্ট্রমণ্ডল দ্রুত ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলে। ১৮০০ খৃঃ নানার মৃত্যু হইলে মারাঠা দরবারের শেষ প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতার তিরোধান হয়। ইহার পর নাবিকহীন নৌকার মত মারাঠা রাষ্ট্রতরণী লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ শক্তি মারাঠাদের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নেয়।

মহারাষ্ট্রের প্রবীণ নেতাগণের মৃত্যু, নবীন নেতাগণের অপরিণামদর্শিতা

পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন খুবই নীচ প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন অপদার্থ, ক্ষমতালোভী ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। নবীন বয়স্ক দুই সামন্ত যথা, যশোবন্ত

রাও হোলকার ও দৌলত রাও সিন্ধিয়ার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে তিনি ইন্ধন দেন। তিনি সিন্ধিয়ার পক্ষ লইয়া হোলকারের বিরোধিতা করেন। তিনি হোলকারের বৈমাত্র ভ্রাতাকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া হত্যা করিলে হোলকার ক্রুদ্ধ হইয়া পেশবার রাজধানী পুনা আক্রমণ করেন। পুনার সন্নিকটে এক যুদ্ধে পেশবা ও সিন্ধিয়ার মিলিত সেনাদলকে যশোবন্ত রাও হোলকার পরাস্ত করিয়া পুনা দখল করেন।[১] জয়লাভের পর হোলকার পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওকে গদীচ্যুত করিয়া অমৃত রাও নামক এক ব্যক্তিকে পেশবার গদীতে বসান। রাজ্যহারা দ্বিতীয় বাজীরাও এই আঘাতে মতিভ্রষ্ট হইয়া হোলকারের বিরুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য লইতে মনস্থ করেন। ইংরাজের হস্তক্ষেপ মারাঠা স্বাধীনতার পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক হইতে পারে তাহা তিনি ভুলিয়া যান। পুনার ইংরাজ প্রতিনিধি ইংরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য তাঁহাকে গোপনে উৎসাহ দেন। ফলে ইংরাজের আশ্রয় পাইবার আশায় দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিনে চলিয়া যান।

দ্বিতীয় বাজীরাও ও হোলকারের যুদ্ধ ঃ বাজীরাওয়ের বেসিনে পলায়ন

এদিকে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের প্রতিজ্ঞা লইয়া বশ্যতামূলক মিত্রতা নামক এক সন্ধিপত্র গঠন করেন। ভারতের রাজন্যমণ্ডলীকে এই সন্ধির জালে বাঁধিয়া তিনি তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ইংরাজের অধীনস্থ সামন্তে পরিণত করার পরিকল্পনা করেন। গদীচ্যুত পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও তাঁহার সিংহাসন লাভের জন্য ইংরাজের সাহায্য চাহিলে মারাঠা রাষ্ট্রমণ্ডলের উপর বশ্যতামূলক সন্ধি চাপাইবার অসাধারণ সুযোগ ইংরাজের নিকট উপস্থিত হয়। বড়লাট ওয়েলেসলির নির্দেশে বোম্বাই কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সহিত বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) নামক এক সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি আসলে ছিল বশ্যতামূলক মিত্রতা লাভের উপর গঠিত। ইহা স্বাক্ষর করার ফলে বাজীরাও মারাঠার স্বাধীনতা বিকাইয়া দেন। বেসিনের সন্ধি দ্বারা—(১) ইংরাজেরা বাজীরাওকে পুনরায় পেশবা পদে স্থাপন করিতে অঙ্গীকার দেয়। (২) পেশবা বাজীরাওয়ের সাহায্যের জন্য ছয় হাজার ইংরাজ সেনাকে তাঁহার রাজ্যে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) পেশবা এই সেনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহার রাজ্যের একাংশ ইংরাজকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করেন। (৪) কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে পেশবা অন্য কোন শক্তির সহিত মিত্রতা বা সন্ধি না করিতে অঙ্গীকার দেন। ইহার ফলে পেশবার স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার লোপ পায়। (৫) পেশবা কোম্পানীর অনুমতি ছাড়া কোন ইওরোপীয় বা শ্বেতাঙ্গকে তাঁহার সেনাদলে না রাখিতে রাজী হন। ইহার অর্থ হইল যে, পেশবা স্বাধীনভাবে নিজ সামরিক শক্তি গঠন করিবার অধিকার হারান। (৬) নিজাম, গাইকোয়াড় প্রভৃতি শক্তির সহিত পেশবার বিরোধ দেখা দিলে ইংরাজের মধ্যস্থতায় তাহা মিটমাট করিতে পেশবা স্বীকৃতি দেন।

বেসিনের সন্ধি, ১৮০২ খ্রীঃ

---

১. P. Spear—Oxford History of India. P. 585.

ভারত ইতিহাসে বেসিনের সন্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ডসের মতে "বেসিনের সন্ধি দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।"[১] (British empire in India became the British empire of India)। এই সন্ধি দ্বারা ওয়েলেসলি ইংরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই সন্ধির দ্বারা তিনি মারাঠা রাষ্ট্রমণ্ডলকে কোম্পানীর অধীনে আনিয়া, পেশবার বৈদেশিক নীতিকে কোম্পানীর হাতে লইয়া এবং ইংরাজের সেনা পেশবার রাজ্যে রাখিয়া পেশবা ও অন্যান্য সামন্তগণের ক্ষমতা ধ্বংস করার আয়োজন করেন।

বেসিনের সন্ধির গুরুত্ব

বেসিনের সর্বনাশা সন্ধি মারাঠা জাতির স্বাধীনতা ধ্বংস করিবার উপক্রম করিলে সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি মারাঠা সামন্তগণ এই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সিন্ধিয়ার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ হোলকার আপাততঃ নিরপেক্ষ থাকেন। পেশবা বাজীরাও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সিন্ধিয়া ও ভোঁসলেকে ইংরাজের বিরুদ্ধে গোপনে উৎসাহ দেন।

মারাঠা নেতাগণের দ্বারা বেসিনের সন্ধি অমান্য

ওয়েলেসলি পুনার ইংরাজ দূত মারফৎ মারাঠা নেতাগণের গতিবিধির উপর নজর রাখিতেন। মারাঠা শক্তির সহিত যুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া তিনি উত্তর ভারতে যুদ্ধ চালনার দায়িত্ব সেনাপতি লর্ড লেককে এবং দক্ষিণ ভারতে এই দায়িত্ব সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলিকে দেন। আর্থার ওয়েলেসলির সুপরিকল্পিত আক্রমণে অসইয়ের (Assye) যুদ্ধে (১৮০৩ খ্রীঃ) সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হন। ভোঁসলে ইহার পর যুদ্ধত্যাগ করিয়া কোম্পানীর সহিত দেওগাঁওয়ের বশ্যতামূলক সন্ধি স্থাপন করেন এবং নিজ রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেন। দৌলতরাও সিন্ধিয়া উত্তর ভারতে তাঁহার আধুনিক কায়দায় শিক্ষিত সেনাদল লইয়া লড়াই করেন। কিন্তু সিন্ধিয়ার নিযুক্ত ফরাসী সেনাপতি পেরণ ও বরকুইনের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং তাঁহার পুরাতন ধরণের ভারী কামানগুলির অকার্যকারিতায় প্রতাপগঞ্জ ও লাসওয়ারির যুদ্ধে তিনি ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেকের নিকট পরাজিত হন। পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া কোম্পানীর সহিত বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতি অনুযায়ী সুর্যি অর্জুনগাঁওয়ের সন্ধি (১৮০৩ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা সিন্ধিয়া তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেন। সিন্ধিয়া বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতির অন্যান্য শর্তগুলিও মানিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের উপর হইতে মারাঠা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া নেন। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক ব্রিটিশ বাহিনী লইয়া গর্বিত পদক্ষেপে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া অন্ধ ও বৃদ্ধ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমকে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে আনেন। ইহার ফলে বাদশাহের নাম লইয়া কোম্পানীই আসল মালিকে পরিণত হয়। অন্ধ বাদশাহ ইংরাজের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও দেওগাঁও, সুর্যি অর্জুনগাঁওয়ের সন্ধি

১. "The Treaty......gave the Company the empire of India in contradistinction to the British empire in India."—Cambridge History of India. Vol. V.

যশোবন্ত হোলকার এতদিন নিরপেক্ষ থাকিবার পর নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। তিনি দেখেন যে, কোম্পানী সমগ্র মারাঠা জাতির স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং ভরতপুরের রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তিনি মারাঠা অশ্বারোহী দল লইয়া ঝড়ের ন্যায় ইংরাজের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ চালান। হোলকার ইংরাজ কামানের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালান। লর্ড লেক ভরতপুর দুর্গ অধিকার করিতে যাইয়া বিতাড়িত হন। অবশেষে লর্ড লেক দিগের (Dig) যুদ্ধে হোলকারকে পরাজিত করিলে ভরতপুরের রাজা যুদ্ধত্যাগ করিয়া ইংরাজের মৈত্রী গ্রহণ করেন। হোলকার মিত্রহীন হইয়া পড়েন। লর্ড লেক হোলকারের পিছু লইয়া তাঁহার সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। হোলকার ইংরাজের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতা চাহিলে তিনি অদূরদর্শীর ন্যায় মুখ ফিরাইয়া নেন। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়েলেসলি স্বদেশে ফিরিয়া যান। পরবর্তী গভর্ণর স্যার জর্জ বার্লো ১৮০৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া শান্তি স্থাপন করেন। সিন্ধিয়া ও হোলকারকে তাঁহাদের রাজ্যের কিছু অংশ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। হোলকারের সহিত রাজপুরঘাটের সন্ধি স্থাপিত হয়। পেশবার সহিত বেসিনের সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে মারাঠা শক্তির প্রায় পতন ঘটে।

হোলকারের যুদ্ধ ঘোষণা : লর্ড লেকের জয়লাভ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে শান্তিচুক্তি

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পতন

(Third Anglo-Maratha war and the final fall of the Marathas) : বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও দেখেন যে বেসিনের সন্ধির মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া কোম্পানী তাঁহার সকল ক্ষমতা গ্রাস করিতেছে। পেশবার মন্ত্রী ত্রিম্বকজী ডিংলে ছিলেন খুব বিচক্ষণ লোক। তিনি পেশবাকে কোম্পানীর হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি মারাঠা সামন্তগণের সহিত গোপন চক্রান্ত করেন। কিন্তু পুনা দরবারের ইংরাজ রেসিডেণ্ট এলফিনষ্টোন ত্রিম্বকজীর কার্যকলাপের উপর সতর্ক নজর রাখেন।

দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা

বরোদার গাইকোয়াড় ছিলেন পেশবার সামন্ত। বরোদার গাইকোয়াড়ের পেশবার দরবারে দেয় কর বাকি পড়ায় পেশবার সহিত গাইকোয়াড়ের গোলমাল বাধে। বেসিনের সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল যে পেশবার সহিত তাঁহার সামন্তগণের বিরোধ দেখা দিলে কোম্পানীর মধ্যস্থতা গ্রহণে উভয়পক্ষ বাধ্য থাকিবে। এই শর্ত অনুসারে গাইকোয়াড়ের সহিত গোলমাল মিটাইতে কোম্পানীর মধ্যস্থতা করার অধিকার বর্তায়। গাইকোয়াড়ের মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী ছিলেন কোম্পানীর বিশ্বস্ত লোক। পেশবার সহিত গোলমাল মিটাইবার জন্য তিনি পুনায় আসেন। কোম্পানী তাঁহার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়।[১] কিন্তু পুনায় আসিবার পর তিনি হঠাৎ আততায়ীর হাতে নিহত হন। সম্ভবতঃ ত্রিম্বকজী তাঁহার হত্যার চক্রান্তের সহিত জড়িত ছিলেন। ঐতিহাসিক

গঙ্গাধর শাস্ত্রী হত্যা

১. Sardesai—New History of the Marathas. Vol. III.

ডাঃ পি. সি. গুপ্তের মতে বরোদার গাইকোয়াড় ইংরাজের পোষ্য এই দুর্ধর্ষ মন্ত্রীর হাত হইতে তাঁহার মুক্তির আশায় তাঁহার হত্যার ষড়যন্ত্র করেন এবং পুনায় তাঁহার হত্যার ব্যবস্থা করা হয়।[১]

ইংরাজ কর্তৃক ত্রিম্বকজীকে বন্দী করন; ত্রিম্বকজীর পলায়ন

যাহা হউক শাস্ত্রী হত্যার দায়ে ইংরাজ রেসিডেণ্ট এলফিলষ্টোন ত্রিম্বকজীকে দায়ী করেন এবং পেশবাকে তাঁহার মন্ত্রী ত্রিম্বকজীকে ইংরাজের হাতে দিতে বাধ্য করেন। ইংরাজেরা ত্রিম্বকজীকে বোম্বাইয়ে বন্দী করিয়া রাখিলে পেশবার চক্রান্তে তিনি পলাইতে সক্ষম হন। কোম্পানী ত্রিম্বকজীকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য বারবার পেশবাকে চাপ দিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকন্তু কোম্পানীর দুর্ব্যবহারের জন্য পেশবা বাজীরাও ক্রুদ্ধ হন।

পুনার সন্ধি: পিণ্ডারী ও মারাঠা শক্তি ধ্বংসে লর্ড হেষ্টিংসের চেষ্টা

এদিকে বড়লাট লর্ড হেস্টিংস পিণ্ডারী নামে লুঠেরা ও দসুদলকে দমনের জন্য এক রণ পরিকল্পনা করেন। লর্ড হেস্টিংস জানিতেন যে পিণ্ডারীগণকে মারাঠা সর্দার সিন্ধিয়া ও হোলকার প্রভৃতি সমর্থন করিতেন। সুতরাং ইংরাজের সহিত পিণ্ডারীগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই সকল মারাঠা সর্দার ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়িতে পারেন। যাহাতে পেশবা বাজীরাও এই যুদ্ধে ইংরাজের বিরুদ্ধে না যান এজন্য লর্ড হেস্টিংস পেশবার পদ লোপ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের উপর পুনার সন্ধি (১৮১৭ খ্রীঃ) চাপাইয়া দেন। এই সন্ধি অনুসারে পেশবা পদ লুপ্ত হয়। পেশবা বাজীরাও ইংরাজের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। ইহার পর লর্ড হেস্টিংস সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি নেতাগণকে কঠোর শর্তে সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ: মারাঠা শক্তির পতন

লর্ড হেস্টিংসের এই জবরদস্তী নীতির ফলে পেশবা ও মারাঠা নেতাগণ জ্বলিয়া উঠেন। পেশবার নির্দেশে পুনার ইংরাজ রেসিডেন্সি অগ্নিদগ্ধ করা হয়। হোলকার ও ভোঁসলে পেশবার পক্ষ লইয়া অস্ত্র ধরেন। ফলে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু সীতাবলদির যুদ্ধে ভোঁসলে ইংরাজ সেনার হাতে পরাস্ত হন। মাহিদপুরের যুদ্ধে হোলকারও পরাজিত হন। পেশবার সেনাপতি বাপু গোখলে কোরেগাঁও ও অষ্টির যুদ্ধে ইংরাজের নিকট পরাস্ত হইলে মারাঠার শেষ আশার প্রদীপ নিভিয়া যায়। মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটে।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফল: কোম্পানীর সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে (১) পেশবা পদ স্থায়ীভাবে লুপ্ত হয়। পেশবার রাজ্য কোম্পানী অধিকার করে। (২) হোলকার কোম্পানীর বশ্যতা-মূলক মিত্রে পরিণত হন। (৩) রাজপুতানা অঞ্চল হোলকারের হাত হইতে কোম্পানীর হাতে আসে। (৪) আপ্পা সাহেব ভোঁসলের গদি হইতে বিতাড়িত হন। ভোঁসলের রাজ্যাংশ কোম্পানী অধিকার করে। ভোঁসলের রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ কোম্পানীর অনুগত

১. Dr. P. C. Gupta—Baji Rao II.

ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। (৫) পেশবার রাজ্যের কিছু অংশ শিবাজীর বংশধরকে কোম্পানীর আশ্রিতভাবে দেওয়া হয়। কোম্পানী ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা (Paramount Power) লাভ করে।

মারাঠা শক্তির পতনের কারণ (Causes of the Maratha downfall)ঃ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তি তরুণ গরুড়ের ন্যায় ক্ষুধার আবেগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজের সহিত শক্তির দ্বন্দ্বে মারাঠা শক্তি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়। মারাঠা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার গ্রাণ্ট ডাফ মন্তব্য করিয়াছেন যে, "মারাঠার বিরুদ্ধে ইংরাজের দ্রুত জয়লাভ ও যুদ্ধের দ্রুত অবসান সমগ্র ভারতবর্ষকে বিস্মিত করে।"[১] মারাঠা শক্তির পতন আকস্মিক ছিল না। মারাঠা শক্তির পতনের পথ দীর্ঘদিন ধরিয়া রচিত হইয়াছিল।

পেশবাগণের প্রতিভা ও নেতৃত্বের অভাব

মারাঠা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব শাসকগণের ব্যক্তিগত প্রতিভার উপর নির্ভরশীল ছিল। শিবাজী, পেশবা প্রথম বাজীরাও, পেশবা মাধব রাও, মহাদজী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশ প্রভৃতি প্রতিভাবান লোকেরাই মারাঠা সাম্রাজ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। ১৮০০ খ্রীঃ পর এই সকল প্রতিভাধর লোকের অভাব হইলে মারাঠা রাষ্ট্র নাবিকহীন নৌকার মত টাল খাইয়া পড়ে।

মারাঠার নবীন নেতাগণের অযোগ্যতা

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে মহারাষ্ট্রে যে নূতন নেতৃত্ব দেখা দেয় তাহা ছিল অনেক নীচু মানের। পূর্ববর্তী নেতাগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেন। কিন্তু পরবর্তী নেতাগণ ছিলেন ইহার বিপরীত। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর, অপদার্থ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও ক্ষমতাপ্রিয় লোক। ঐতিহাসিক সরদেশাইয়ের মতে পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওই মারাঠা শক্তির পতনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন। তিনি বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া মারাঠার গৃহবিবাদে ইংরাজ হস্তক্ষেপের পথ তৈয়ারী করেন। তিনি মারাঠা সামন্তগণের মধ্যে বিবাদকে প্রশমিত না করিয়া তাহাতে ইন্ধন দেন। এছাড়া নবীন নেতা দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্তরাও হোলকার প্রভৃতি ছিলেন জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন। প্রবাদ আছে যে, রোম নগরী যখন আগুনে পুড়িতেছিল তখন রোম সম্রাট নীরো আগুন নিভাইবার চেষ্টা না করিয়া বেহালা বাজান। তেমনই মহারাষ্ট্রে ইংরাজের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়াও বাজীরাও, সিন্ধিয়া, হোলকার আত্মকলহে মত্ত থাকেন।

পেশবা পদে উত্তরাধিকারের গোলাযোগ

পেশবা পদের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ মারাঠা রাষ্ট্রের পতন ডাকিয়া আনে। রঘুনাথ রাওয়ের সহিত নারায়ণ রাওয়ের দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সহিত অমৃত রাওয়ের পেশবা পদ লইয়া দ্বন্দ্ব ইহার উদাহরণ। ইংরাজ শক্তি এই অন্তর্বিরোধের সুযোগ নেয় এবং কোন একটি পক্ষকে সমর্থন করিয়া মারাঠা গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে।

---

১. "The rapidity of the conquest and the speedy termination of the war surprised all India."—Grant Duff.

অষ্টাদশ শতকে রাষ্ট্র কোন আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। রাষ্ট্রকে ধরিয়া রাখিতে হইলে এবং জনসাধারণের আনুগত্য পাইতে হইলে আদর্শবাদ দরকার। পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা পেশবাগণ হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর আদর্শ ত্যাগ করেন। তাঁহারা উত্তর ভারতের হিন্দুগণের নিকট বলপূর্বক চৌথ আদায় করিলে হিন্দুগণের মারাঠা সাম্রাজ্য সম্পর্কে মোহ ভঙ্গ হয়। রাজপুত রাজাগণ মারাঠা শক্তির শোষণমূলক চরিত্র বুঝিয়া ফেলেন। উত্তরের আফগান প্রভৃতি শক্তিগুলি আগাগোড়া মারাঠাদের বিরোধী ছিল। মারাঠাগণ জবরদস্তির দ্বারা কর আদায় করিলে তাহাদের শাসনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা নষ্ট হয়। এইভাবে মারাঠাগণ জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলে।

আদর্শবাদের অভাব

মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ। অনুর্বর ও পর্বতসংকুল মহারাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদ সীমিত থাকায়, বিশাল সেনাদল ও রাষ্ট্রের খরচ নির্বাহের জন্য মারাঠা সরকারকে একপ্রকার জবরদস্তি কর, যথা, চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিতে হইত। চৌথ ও সরদেশমুখী নামক কর মহারাষ্ট্রের প্রজাদের নিকট আদায় না করিয়া অন্য রাজ্যে আক্রমণের হুমকি দিয়া আদায় করা হইত। এজন্য এই কর ছিল খুবই অপ্রিয়। অন্য রাজ্য হইতে এই কর আদায় করা সর্বদা সম্ভব হইত না। ফলে মারাঠা রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। অনিয়মিত রাজস্বের উপর কোন রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারে না। মারাঠা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য বাণিজ্য ও শিল্প গঠনের কোন চেষ্টা মারাঠা সরকার করে নাই। ইহা ছিল ঘোর অদূরদর্শিতার পরিচয়।

দুর্বল অর্থনীতি

মারাঠগণ প্রধানতঃ অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় লড়াই করিত। অশ্বারোহী মারাঠা বর্গী ও শিলাদার সেনাদল ছিল মারাঠার সামরিক মেরুদণ্ড। অষ্টাদশ শতকে সিন্ধিয়া প্রভৃতি নেতাগণ মারাঠার জাতীয় রণকৌশল ত্যাগ করিয়া ইওরোপীয় পদ্ধতিতে ভারী পদাতিক সেনা ও কামান দ্বারা নূতন লড়াইয়ের কায়দা চালু করেন। কিন্তু এই নূতন যুদ্ধের কৌশল মারাঠাগণ কোনদিনই ভালভাবে আয়ত্ব করিতে পারে নাই। সিন্ধিয়ার কামানগুলি ছিল ভারী। ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরাজের সহিত সংঘর্ষের সময় মারাঠা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা সেনাদলের ফরাসী সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে। তৃতীয়তঃ, সেনাদলে পূর্ব ভারতীয় ছত্রী সেনা ঢুকাইলে মারাঠা সেনাদলের জাতীয়তাবাদী চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়। চতুর্থতঃ, মারাঠাগণ নৌবাহিনীর দিকে নজর না দেওয়ায় ইংরাজের সামুদ্রিক আধিপত্য ও বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

সামরিক দুর্বলতা: গেরিলা যুদ্ধ ত্যাগ

মারাঠা রাষ্ট্রে জায়গীর ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন এবং সামন্ত প্রথা মারাঠা সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট করে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের জায়গারদারগণ প্রায়ই পেশবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। তাছাড়া প্রতিবেশী নিজাম ও মহীশূর ছিল মহারাষ্ট্রের শত্রু। ইংরাজ মারাঠার বিরুদ্ধে ইহাদের কাজে লাগায়।

জায়গীর প্রথার কুফল

সর্বশেষে লর্ড ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংসের কূটনীতি ও রণকৌশল, সেনাপতি

আর্থার ওয়েলেসলি ও লর্ড লেকের দক্ষতা, ইংরাজদের ঘোড়ায় টানা দ্রুতগামী ও দূরপাল্লার কামান মারাঠা শক্তির পতন ত্বরান্বিত করে। ভারতে তখন ইংরাজ শক্তি যেরূপ অনিবার্য গতিতে বিস্তৃত হইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে পুরাতন ও জীর্ণ শাসনব্যবস্থা, অচল অর্থনীতি ও গৃহবিবাদ লইয়া মারাঠাগণের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব ছিল না।

ইংরাজের উন্নত সামরিক নীতি ও কূটবুদ্ধি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেপাল ও ব্রহ্ম যুদ্ধ

(Nepal and Burma Wars)

নেপাল যুদ্ধ, ১৮১৪-১৮১৬ খ্রীঃ (The Nepal War) : ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে কোম্পানীর শাসনকর্তাগণ ভারতের প্রতিবেশী সীমান্ত রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার কাজে হাত দেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নেপাল, ব্রহ্ম প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করিয়া ভারত সীমান্ত সুরক্ষিত করা ছিল তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া রাজ্য বিস্তার করাও ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়া ব্রিটিশ সীমান্ত নীতি পরিচালিত হয়।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের হিন্দুরাজ্য নেপালের সীমানা, উত্তর বাংলার তিস্তা অঞ্চল হইতে পাঞ্জাবের শতদ্রু নদ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ মাইল দীর্ঘ হইয়া বিস্তৃত। নেপালের গুর্খা শাসকগণ ভারত সীমান্তের কোন কোন স্থানে হামলা চালাইলে এবং কর আদায় করিলে বড়লাট লর্ড হেস্টিংস নেপাল দরবারকে এই সকল অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বলেন। নেপাল দরবার ইহাতে রাজী না হইলে ১৮১৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ বাধে। ইংরাজ সেনা নেপালের দিকে আগাইলে গুর্খা সেনাপতি অমর সিং থাপা ও বল বাহাদুর সিং কাসাঙ্গার যুদ্ধে বহু ইংরাজ সেনাসহ পাঁচ জন ইংরাজ সেনাপতিকে নিহত করেন। পরে ইংরাজ সেনাপতি ডেভিড অক্টারলোনী মকানপুরের যুদ্ধে গুর্খাগণকে পরাজিত করেন।

ইঙ্গ-নেপাল বিরোধ

১৮১৬ খ্রীঃ সগৌলির সন্ধি দ্বারা নেপাল যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির বলে কুমায়ুণ, গাড়োয়াল ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ইংরাজ রাষ্ট্রদূত থাকিবার ব্যবস্থা হয়। গুর্খাগণ সিকিমের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দেয়। সিমলা, মুসৌরী, আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতি পার্বত্য শহরগুলি ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। নেপাল-ভারত সীমান্ত চিহ্নিত করার ব্যবস্থা হয়।

সগৌলির সন্ধি

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১৮২৪-২৬ খ্রীঃ (First Anglo-Burmese War) : লর্ড হেস্টিংস ভারতের পূর্ব সীমান্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকেও নজর দেন।

তিনি ভারতের উপকূল রক্ষা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংরাজের বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ১৮১৯ খ্রীঃ মালয়ের অন্তর্গত সিঙ্গাপুর বন্দর দখল করেন। সিঙ্গাপুরে ইংরাজেরা একটি শক্তিশালী নৌ ঘাঁটি স্থাপন করে।

ভারতবর্ষ কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় এবং মালয়ের সিঙ্গাপুর কোম্পানীর দখলে আসায় স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের দৃষ্টি ভারতের পূর্ব-সীমান্তের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের দিকে পড়ে। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ও ব্রহ্মের মূল্যবান সেগুন কাঠ প্রভৃতি কাঁচামাল হাত করিবার জন্য ইংরাজ ব্রহ্মের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দেয়। তাছাড়া আরাকান ও মণিপুর অঞ্চলের আধিপত্য লইয়া ব্রহ্মের রাজার সহিত কোম্পানীর বিরোধ দেখা দেয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি

অষ্টাদশ শতকে ব্রহ্মরাজ আলংপায়া মণিপুর জয় করেন। ইহার পর ব্রহ্মরাজ বোডোপায়া আরাকান জয় করেন। ব্রহ্ম সরকার ভারত সীমান্তের মণিপুর ও আরাকান অঞ্চল অধিকার করিলে কোম্পানী ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ফলে ইঙ্গ-ব্রহ্ম সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে আরাকানের পথ দিয়া বর্মী সেনা পূর্ববাংলার চট্টগ্রামে ঢুকিবার চেষ্টা করে। বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট সীমান্ত সমস্যা মিটাইবার জন্য ব্রহ্মরাজের নিকট দূত পাঠাইলে বর্মীগণ এই দূতকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ইতিমধ্যে বর্মী সেনা (১৮২১-২২ খ্রীঃ) আসাম আক্রমণ করিয়া উহার একাংশ অধিকার করে। ব্রহ্মরাজ বোডোপায়া শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলা অধিকারের চেষ্টাও করেন। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের উপর দাবী জানান।

ব্রহ্ম সেনার আসাম, মণিপুর আক্রমণ

ইংরাজেরা ব্রহ্মরাজের আগ্রাসী নীতিকে ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে ব্রহ্ম সরকার ইহাতে বাধা দেন। ইহার ফলে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ১৮২৪ খ্রীঃ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের দায়িত্ব কেবলমাত্র ব্রহ্মরাজের ছিল না। ইংরাজ বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য ব্রহ্মে প্রবেশের চেষ্টা করে। ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করার জন্য এই বণিকেরা ইংরাজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইহার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে কোন অজুহাত দেখাইয়া ব্রহ্ম আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে বর্মী সেনা আসাম, আরাকান, ইরাবতী অঞ্চলে ইংরাজ বাহিনীর দ্বারা পরাস্ত হয়। অবশেষে ডোনাবুরের যুদ্ধে ব্রহ্ম সেনাপতি মহাবান্দুলা ইংরাজ সেনার দ্বারা নিহত হইলে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান হয়। ইয়ান্দাবুর সন্ধি (১৮৬২ খ্রীঃ) দ্বারা (১) ব্রহ্মরাজ আসাম, কাছাড়, মণিপুর ও জয়ন্তিয়ার উপর দাবী ছাড়িয়া দেন। (২) আরাকান ও তেনাসেরিমও ইংরাজের হস্তগত হয়। (৩) ব্রহ্মরাজ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক কোটি টাকা কোম্পানীকে দেন। (৪) ব্রহ্মে ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখার ব্যবস্থা হয়।

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ : ইয়ান্দাবুর সন্ধি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১৮৫২ খ্রীঃ (Second Anglo-Burmese War) : ইয়ান্দাবুর সন্ধির সুযোগ লইয়া ইংরাজ বণিকেরা দক্ষিণ ব্রহ্মে বাণিজ্য

বিস্তারের চেষ্টা করে। ইংরাজ বণিকদের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মদেশকে শোষণ করা। এজন্য তাহারা ব্রহ্ম সরকারের বিরোধিতায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এদিকে ব্রহ্মের কাঁচামাল একচেটিয়া দখল করিবার জন্য এই বিদেশী বণিকেরা মরিয়া হইয়া উঠে। ফলে স্থানীয় অধিবাসীগণের সহিত ইংরাজ বণিকদের বিবাদ বাধে। ইংরাজ বণিকেরা বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর নিকট দাবী জানায় ব্রহ্ম সরকারকে শায়েস্তা করিয়া তাহাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে। লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ইংরাজ জাতির স্বার্থকে সর্বদা বড় করিয়া দেখিতেন। সুতরাং তিনি স্থির করেন যে ব্রহ্মদেশকে বিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আনিয়া বিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবেন। তিনি কমোডোর ল্যাম্বার্ট নামক এক নৌ সেনাপতিকে ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠাইয়া ব্রহ্মে ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্যের সুবিধা দিবার দাবী করেন। সেনাপতি ল্যাম্বার্টের উদ্ধত আচরণ ও ব্রহ্ম রণতরী অধিকার, বর্মী সেনাগণ বরদাস্ত করিতে পারে নাই। ফলে তাহারা সেনাপতি ল্যাম্বার্টকে বহিস্কার করে। বিটিশ দূত সেনাপতি ল্যাম্বার্টকে অপমানজনকভাবে বহিস্কারের অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনা দক্ষিণ ব্রহ্ম অর্থাৎ পেগু ও প্রোম অধিকার করে। ব্রহ্মরাজ মিণ্ডন দক্ষিণ ব্রহ্মের উপর বিটিশ অধিকার স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে নারাজ হইলে ডালহৌসী বলপূর্বক দক্ষিণ ব্রহ্ম অধিকার করেন। ইংরাজেরা দক্ষিণ ব্রহ্ম অধিকার করার ফলে উত্তর ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। উত্তর ব্রহ্ম তখনও স্বাধীনভাবে ব্রহ্ম রাজের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে। ১৮৫৩ খ্রীঃ ব্রহ্ম সরকার পেগু ফেরৎ চাহিলে ডালহৌসী বলেন যে "যতদিন সূর্য তেজ বিকীরণ করিবে ততদিন এই স্থান ব্রহ্মরাজকে ফেরৎ দেওয়া হইবে না।"

ইংরাজ বণিকের সহিত ব্রহ্ম সরকারের সংঘর্ষ : লর্ড ডালহৌসীর আক্রমণ নীতি

তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ও ব্রহ্মের পতন, ১৮৮৫-৮৬ খ্রীঃ (Third Anglo-Burmese War) : দক্ষিণ ব্রহ্ম অধিকার করার পর ইংরাজ শক্তি স্বভাবতই অবশিষ্ট ব্রহ্মদেশ বিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য ইংরাজের অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টা করে। ব্রহ্মরাজ বিপদ বুঝিয়া ইংরাজের গায়ে পড়িয়া ঝগড়া এড়াইয়া চলার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মরাজ এই কথা উপলব্ধি করেন যে যদি তিনি নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারেন তবে বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁহাকে ধ্বংস করিবে। এই সকল কথা ভাবিয়া ব্রহ্মরাজ থিব ইন্দোচীনে (ভিয়েৎনাম) ফরাসী শক্তির সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। তাঁহার আশা ছিল যে ফরাসী শক্তির সাহায্যে তিনি ইংরাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। ব্রহ্মরাজ ফরাসী মিত্রতা গ্রহণ করায় ইংরাজগণ ব্রহ্মে ফরাসী হস্তক্ষেপের আশংকা করে। বড়লাট লর্ড ডাফরিন ব্রহ্ম আক্রমণের জন্য কয়েকটি অজুহাত খুঁজিয়া বাহির করেন। ব্রহ্মরাজার দরবারে ব্রহ্মের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কাউতাও (kotow) প্রথা বা পায়ের জুতা খুলিয়া

তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ : ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লোপ

নতজানু হইয়া অভিবাদন করিতে হইত। ইংরাজ রাজদূত ইহা অপমানজনক মনে করেন। তিনি যুদ্ধের কারণ হিসাবে ইহা ব্যবহার করেন। তাছাড়া একটি বৃটিশ কোম্পানী ব্রহ্ম সরকারের আইন অগ্রাহ্য করিলে ব্রহ্ম সরকার এই কোম্পানীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করে। বড়লাট লর্ড ডাফরিন এই অজুহাত দেখান যে ব্রহ্ম সরকার ইংরাজদের সার্বভৌম ক্ষমতার অমর্যাদা করিয়াছেন। তিনি এই অজুহাতে ব্রহ্ম আক্রমণ করেন। তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মরাজ থিব আত্মসমর্পণ করেন। সমগ্র ব্রহ্মদেশ (১৮২৬ খ্রীঃ) ইংরাজের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিখ শক্তির উত্থান ও পতন
(Rise and Fall of Sikh Power)

শিখ জাতির উত্থান (The Rise of the Sikh Power): মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে শিখ জাতি গুরু নানকের আদর্শ এবং গুরু তেগ বাহাদুর ও গুরু গোবিন্দের সংগঠনের প্রভাবে নবতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। শিখ জাতি মুঘলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্র হইয়া উঠে। শিখ জাতির বিদ্রোহ মুঘল বাদশাহগণের পক্ষে দমন করা সহজসাধ্য ছিল না। ইতিমধ্যে আফগানিস্থানের বাদশাহ আহমদ শাহ আবদালী ভারত আক্রমণ করিলে মুঘল শক্তি খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে শিখগণ দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আবদালী ভারত ত্যাগ করিলে শিখগণ ১৭৬৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে পাঞ্জাবে স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপিত হয়। শিখগণ স্বাধীনতা লাভের পর ১২টি মিসল বা দলে বিভক্ত হইয়া পাঞ্জাব শাসন করিতে থাকে।

পাঞ্জাবে শিখগণের স্বাধীনতা ঘোষণা

যদিও ধর্ম ও সামাজিক দিক হইতে শিখ মিসলগুলি ঐক্যবদ্ধ ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে মিসলগুলির মধ্যে ক্ষমতা লাভের জন্য জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শেষ পর্যন্ত সুকারচাকিয়া মিসলের অধিপতি রঞ্জিৎ সিংহ অন্য সকল মিসলগুলিকে নিজ অধীনস্থ করিয়া পাঞ্জাবে অখিল জাতীয় শিখ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এইভাবে রঞ্জিৎ সিংহ শিখ জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন।

মিসল যুগ ও রঞ্জিৎ সিংহের জাতীয় নীতি

রঞ্জিৎ সিংহ ও শিখ জাতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন, ১৭৮০—১৮৩৯ খ্রীঃ (Ranjit Singh and establishment of Sikh National monarchy): অষ্টাদশ শতকের ভারত ইতিহাসে যে সকল প্রতিভাবান রাষ্ট্র নায়কের নাম পাওয়া যায়, পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ প্রতিভা। এই যুগের ইতিহাসে হায়দর আলি, সফদর জং, প্রথম বাজীরাও, মহাদজী সিন্ধিয়ার পাশাপাশি রঞ্জিৎ সিংহ নিঃসন্দেহে স্থান পাইতে পারেন।

রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীঃ সুকারচাকিয়া মিসলের নেতা মহা সিংহের গৃহে জন্মলাভ করেন। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে রঞ্জিতের পিতৃ বিয়োগ হয়। বাল্য কালে পিতৃহীন হইবার ফলে রঞ্জিৎ শিক্ষা-দীক্ষা লাভের কোন সুযোগ পান নাই। কিন্তু বিধিদত্ত প্রতিভার জোরে তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করেন।

রঞ্জিতের বাল্যজীবন ও কৃতিত্ব

আফগানিস্থানের শাসনকর্তা জামান শাহ ১৭৯৮ খ্রীঃ ভারত আক্রমণ করিলে রঞ্জিৎ তাঁহার সহায়তা করিয়া লাহোর অধিকার করেন। লাহোর অধিকারের পর রঞ্জিৎ "Blood and Iron" বা যুদ্ধ-বিগ্রহ নীতির দ্বারা পাঞ্জাবকে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাজ্যে পরিণত করার সংকল্প নেন। তিনি ১৮০৫ খ্রীঃ শিখ তীর্থস্থান অমৃতসর অধিকার করেন। ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীঃ মধ্যে তিনি সকল শিখ মিসলগুলিকে নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া জাতীয় শিখ সাম্রাজ্য গঠন করেন। শতদ্রু নদের পশ্চিম তীরের সকল অঞ্চল তাঁহার কর্তৃত্বে আসে।

পাঞ্জাব জয় ও শিখ জাতীয় রাজ্য স্থাপন

রঞ্জিৎ এইবার শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দেন। শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ শিখ রাজ্যগুলির সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যদি এই রাজ্যগুলি স্বাধীন থাকিত তবে রঞ্জিতের অখিল শিখ সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। অপর দিকে এই রাজ্যগুলি যদি ইংরাজের হাতে পড়িত তবে রঞ্জিতের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। শতদ্রুর পূর্বতীরের শিখ রাজ্যগুলির দিকে ইংরাজ শক্তি দিল্লী হইতে লোভাতুর দৃষ্টি দিতেছিল। রঞ্জিৎ ইহা বুঝিয়া শতদ্রু অতিক্রম করিয়া শিখ রাজ্যগুলিকে গ্রাস করার জন্য দ্রুত চেষ্টা চালান। তিনি এই অঞ্চলে তিনবার অভিযান পাঠান এবং লুধিয়ানা অধিকার করেন। শতদ্রু তীরের শিখ রাজ্যগুলির অধিপতিগণ রঞ্জিতের বশ্যতা স্বীকার করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহাদের নেতা সাহেব সিং রঞ্জিতের বিরুদ্ধে কোম্পানীর সাহায্য ভিক্ষা করেন।

পূর্ব শতদ্রু রাজ্য জয়ের চেষ্টা



রঞ্জিৎ সিংহ

এদিকে বড়লাট লর্ড মিণ্টো শতদ্রু রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করার সংকল্প নেন। তিনি চার্লস মেটকাফকে দূত হিসাবে লাহোরে পাঠাইয়া রঞ্জিতকে শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ত্যাগ করিতে বলেন। এই সময় রাশিয়ার জারের সহযোগিতায় নেপোলিয়নের ভারত আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যদি নেপোলিয়ন উপরোক্ত পথে ভারতে আসিতেন তবে তাঁহাকে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া আসিতে হইত। সুতরাং দিল্লীর

ইংরাজের বাধাদান রঞ্জিতের পশ্চাদপসরণ

ইংরাজ শক্তি পাঞ্জাবের শিখ শক্তিকে হাতে রাখা দরকার মনে করে। এই কারণে লর্ড মিণ্টো ইংরাজের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতা সন্ধি চান। ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের আক্রমণের ভীতি দূর হয়। মেটকাফের দৌতও বিফল হয়। লর্ড মিণ্টো সুযোগ বুঝিয়া শতদ্রু তীরের রাজ্যগুলির বিষয়ে রঞ্জিৎ সিংহের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার নীতি নেন। সেনাপতি অক্টারলোনী ইংরাজ সেনা সহ লুধিয়ানা পর্যন্ত অগ্রসর হইলে রঞ্জিৎ সিংহ ইংরাজের সহিত বাধাদানের সাহস হারাইয়া ফেলেন। তিনি অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা ইংরাজের সহিত শান্তি স্থাপন করেন।

অমৃতসরের সন্ধি ১৮০৯ খ্রী:

অমৃতসরের সন্ধির (১৮০৯ খ্রীঃ) দ্বারা (১) শতদ্রু নদী ইংরাজ ও রঞ্জিতের সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমানারূপে চিহ্নিত হয়। (২) রঞ্জিৎ শতদ্রুর পূর্বতীরের শিখ রাজ্যের উপর দাবী ছাড়িয়া দিয়া অখিল শিখ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বিসর্জন দেন। (৩) ইহার পর তিনি কোম্পানীর সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলেন।

কাশ্মীর মুলতান জয়; সিন্ধুজয়ে ইংরাজের বিরোধিতা

অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা শতদ্রুর পূর্বদিকে রঞ্জিতের রাজ্য বিস্তার বন্ধ হইলেও, তিনি কাংড়া, মুলতান, কাশ্মীর, পেশোয়ার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বৃহৎ অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রঞ্জিৎ উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্যের সহিত সমুদ্রের সংযোগ নাই। এই অভাব পূরণের জন্য তিনি সিন্ধু দেশ অধিকারের চেষ্টা করিলে ইংরাজের কূটনৈতিক বাধা পান। ইংরাজের বিরোধিতায় তিনি সিন্ধু জয়ের আশা ত্যাগ করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যবিস্তার

আফগানিস্থানের সিংহাসন লইয়া সিংহাসনের দাবীদারগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রঞ্জিৎ গতিচ্যুত সুলতান শাহ সুজার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোহিনূর মণি অধিকার করেন। এদিকে আফগানিস্থানের নবাব দোস্ত মহম্মদ ইংরাজকে অগ্রাহ্য করিয়া রাশিয়ার প্রতি অধিক মিত্রতা দেখাইলে ভারতীয় ইংরাজ শক্তি তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য ইংরাজ সরকার রঞ্জিৎ সিংহের ও শাহ সুজার সহিত ত্রিশক্তি মিত্রতা চুক্তি (১৮৩৮ খ্রীঃ) স্থাপন করে। এই চুক্তির দ্বারা বিটিশ ও রঞ্জিত একযোগে আফগান আমীর দোস্ত মহম্মদকে আক্রমণ করার ব্যবস্থা করা হয়। রঞ্জিৎ এই চুক্তির সুযোগ লইয়া আফগানিস্থানের কিছু অংশ দখল করেন। আফগান যুদ্ধ ছিল রঞ্জিতের শেষতম সাফল্য। ১৮৩৯ খ্রীঃ রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু হয়

রঞ্জিৎ সিংহ সামন্ততান্ত্রিক শিখ মিসলগুলিকে একত্র করিয়া একটি জাতীয় শিখ রাষ্ট্রে পরিণত বরেন। এজন্য তাঁহাকে শিবাজীর সহিত তুলনা করা যায়। শিবাজীর যেরূপ মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন, রঞ্জিত সেইরূপ শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। বিজেতারূপে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও সংগঠকরূপে কম কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দেন নাই। তাঁহার শাসনব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল। তিনি যোগ্যতা অনুযায়ী জাতিধর্ম নির্বিশেষে কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। দেওয়ান মোকাম চাঁদ প্রভৃতি হিন্দু ও কাজী আজিমুদ্দীন প্রভৃতি মুসলমান তাঁহার

রঞ্জিতের শাসনব্যবস্থা

মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে কাজ করিতেন। রঞ্জিতের শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক হইলেও উহা ছিল উদারনৈতিক স্বৈরতন্ত্র। রঞ্জিৎ সিংহ ছিলেন একাধারে আইন, বিচার, শাসন প্রভৃতি সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন না। প্রজা কল্যাণ, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা তাঁহার রাজত্বকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তিনি হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতির আনুগত্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্ব ব্যবস্থাও উন্নত ছিল। কৃষক ও বণিকেরা তাঁহার নিকট ন্যায্য ব্যবহার পাইত।

রঞ্জিৎ সিংহের সামরিক দক্ষতা ও সেনা সংগঠন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরাসী পর্যটক জেকুই মোঁ তাঁহাকে "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন"[১] নাম দিয়াছেন। তিনি যে খালসা সেনাদল গড়েন তাহাকে অলিভার ক্রমওয়েলের "আয়রন সাইড" বাহিনীর সহিত তুলনা করা যায়। খালসা বাহিনীকে শিখ ধর্মীয় আদর্শের সহিত সামরিক শৃংখলায় দীক্ষা দিয়া এক দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত করা হয়। রঞ্জিৎ সিংহ ফরাসী সেনাপতি ভেঞ্চুরা, আলার্ড প্রভৃতির সাহায্যে শিখ সেনাদলের আধুনিকীকরণ করেন। পাশ্চাত্য যুদ্ধ কৌশলের উৎকর্ষ সম্পর্কে রঞ্জিত অজ্ঞ ছিলেন না। তবে তিনি মারাঠা সিন্ধিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ করেন। পাশ্চাত্য রীতি গ্রহণ করিয়া তিনি জাতীয় যুদ্ধ রীতিকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি বিশেষ যত্ন লইয়া শিখ অশ্বারোহী বাহিনীকে সজ্জিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি উপদলে বিভক্ত শিখ শক্তিকে এক ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তিরূপে এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্দীপ্ত করেন।

সামরিক সংগঠন

রঞ্জিতের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কয়েকটি দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, তাঁহার সাম্রাজ্য কেবলমাত্র তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভার উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁহার কার্যকে চালাইবার জন্য যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্যে যেমন ভাঙন দেখা যায়, রঞ্জিতের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে শিখ সাম্রাজ্যে সেইরূপ ভাঙন দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, রঞ্জিৎ খালসা সেনাদলকে শিখ দরবারের অসামরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে আনিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে রঞ্জিতের মৃত্যুর পর খালসা বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রভূত গোলযোগ সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ, রঞ্জিৎ সিংহ অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি ইংরাজ শক্তির সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য এই সন্ধি করিলেও পরিণামে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কারণ ইংরাজ শক্তি ভারতে স্বাধীন পাঞ্জাবের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত থাকিতে দেয় নাই। রঞ্জিৎ ইহা জানিতেন বলিয়াই মন্তব্য করেন, "সব লাল হো জায়েগা"। অর্থাৎ ভারতের সকল মানচিত্র লাল রং-এ রঞ্জিত হইবে। তিনি নিজ জীবনকালে ইংরাজ শক্তির সহিত মোকাবিলা করিতে সাহস না করায় তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণকে এই বিপজ্জনক দায়িত্ব লইতে হয়। ইহার ফলে শিখ শক্তির পতন ঘটে। ডাঃ এন. কে. সিংহের মতে জার্মান রাষ্ট্রনেতা বিসমার্ক যে সকল সন্ধি করিতেন তাহার ফলে জার্মানী সাহস ও অপর

রঞ্জিতের নীতির ত্রুটি : শিখ শক্তির পতনে তাঁহার দায়িত্ব

১. "Bonaparte in miniature."

পক্ষ ঘোড়ায় পরিণত হইত। লর্ড মিণ্টো অমৃতসরের সন্ধির দ্বারা রঞ্জিৎ সিংহকে অশ্ব ও ব্রিটিশ শক্তিকে অশ্বচালকে পরিণত করেন। রঞ্জিৎ সিংহ ইহা পুরা উপলব্ধি করেন নাই।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ (First Anglo-Sikh war) ঃ রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর (১৮৩৯ খ্রীঃ) পর তাঁহার পুত্র খড়গ সিংহ শিখ সিংহাসনে বসেন। অহিফেন-সেবী, অপদার্থ খড়গ সিংহকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা নওনেহাল সিংহ ১৮৪০ খ্রীঃ সিংহাসন অধিকার করেন। নওনেহালের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া রঞ্জিতের পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। এই সুযোগে খালসা বাহিনীর অন্যতম নায়ক লাল সিংহ রঞ্জিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসান। দলীপের মাতা রানী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। লাল সিংহ ঝিন্দনের সাহায্যে সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন। এইভাবে শিখ দরবারে ক্ষমতার লড়াই আরম্ভ হয়। ইংরাজ শক্তি ইহার সুযোগ নেয়।

শিখজাতির উত্তরাধিকারের গোলযোগ

কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন যে, প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের জন্য শিখ দরবারই দায়ী ছিল। কারণ খালসাগণকে রানী ঝিন্দন ও তাঁহার মন্ত্রীগণ সামলাইতে না পারায় তাহারা ইংরাজকে আক্রমণ করে। এই মত তথ্যানির্ভর নহে। শিখ দরবারে ক্ষমতার লড়াই ইংরাজেরা তীক্ষ্ম চোখে লক্ষ্য করিতেছিল। শিখ দরবারের দুর্বলতার সুযোগে ইংরাজ পাঞ্জাব দখল করিবার জন্য প্রস্তুতি চালায়। বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৪০ খ্রীঃ মন্তব্য করেন যে "শিখ শক্তি ধ্বংস করিয়া পাঞ্জাব জয়ের জন্য কোম্পানীর সেনা ও কর্মচারীগণ অধীর হইয়া পড়িয়াছে"। লর্ড এলেনবরা ১৮৪৩ খ্রীঃ বলেন যে "পাঞ্জাব অধিকার আসন্ন"। সুতরাং কোম্পানীই প্রথমাবধি পাঞ্জাব আক্রমণের চেষ্টায় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট হইয়া শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরে ইংরাজ সেনার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সামরিক কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেন। ইংরাজ শক্তি শতদ্রুর উপর পুল তৈয়ারী আরম্ভ করে। নদীর অপর পার হইতে শিখগণ ইহা লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হয়। এদিকে শিখ দরবারে ইংরাজ রেসিডেণ্ট ব্রডফুটের গর্বিত চালচলন ও শিখদের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার শিখ সেনাগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। এইভাবে যুদ্ধের জন্য পরিস্থিতি তৈয়ারী হয়।

ইংরাজের আক্রমণ নীতি

এদিকে খালসাগণের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রানী ঝিন্দন তাহাদের উদ্যমকে শতদ্রুর অপর পারে শিখ রাজ্য উদ্ধারে লাগাইয়া দেন। খালসাগণ শতদ্রু পার হইলে, লর্ড হার্ডিঞ্জ অমৃতসরের সন্ধিভঙ্গের জন্য শিখ দরবারকে দায়ী করিয়া যুদ্ধের ঘোষণা দেন। ইহার ফলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শিখ সেনাদল মুদকী, আলিওয়াল ও ফিরোজ শার যুদ্ধে বিপুল পরাক্রমে লড়িয়াও শিখ সেনাপতি লাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় ও ইংরাজ সেনাপতি স্যার হিউ গফের রণকৌশলের জন্য পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

লাহোরের সন্ধি (১৮৪৬ খ্রীঃ) দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। (১) কোম্পানী শিখ দরবারের নিকট হইতে কাশ্মীর ও জলন্ধর দোয়াব পায়। (২) লাহোর দরবার কোম্পানীকে যুদ্ধের দরুন প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। (৩) লাহোর দরবারে শিখ নেতার সংখ্যা হ্রাস করা হয়। (৪) লাহোরে ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মোটকথা এই সন্ধির দ্বারা ইংরাজ শক্তি লাহোর দরবারের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়া দেয়। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে শিখ শক্তির পতনের প্রথম ধাপ রচিত হয়।

লাহোরের সন্ধি ১৮৪৬ খ্রীঃ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৮—৪৯ খ্রীঃ (Second Anglo-Sikh war)ঃ লাহোরের সন্ধির (১৮৪৬ খ্রীঃ) দ্বারা ইঙ্গ-শিখ বিরোধের পাকাপাকিভাবে সমাধান হয় নাই। কোম্পানী এই সন্ধিকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করিয়া শিখশক্তি ধ্বংসের চেষ্টা করে। কোম্পানী লাহোরের সন্ধির শর্তগুলির মনগড়া ব্যাখ্যা করিলে, খালসাগণ ইংরাজের মতলব বুঝিতে পারে। ফলে খালসাগণ ইংরাজকে হঠাইতে সংকল্প নেয়। এদিকে লাহোর দরবারে নিযুক্ত ইংরাজ রেসিডেণ্ট জন লরেন্স শিখ নেতাগণকে পদে পদে এমনই বিব্রত করেন যে তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে। লাহোরের সন্ধির দ্বারা শিখগণ ইংরাজকে কাশ্মীর ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। শিখ দরবার এই শর্ত পালনে টালবাহানা করিলে ইংরাজ সেনা বলপূর্বক কাশ্মীর দখল করে। ইহার পর ইংরাজ শক্তি গুলাব সিংহ নামক এক ডোগরা রাজপুতকে কাশ্মীর বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহাতে শিখ নেতাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। শিখনেতা লাল সিংহ ইংরাজের বিরোধিতা করায় ইংরাজ রেসিডেণ্ট লরেন্স তাঁহাকে লাহোর দরবার হইতে বিতাড়িত করেন। লর্ড লরেন্স স্বাধীনতাকামী ও দেশপ্রেমিক শিখনেতাগণকে ক্রমে দরবার হইতে বিতাড়ন করেন। তিনি ইংরাজের হাতের লোকদের শিখ দরবারে বসাইয়া শিখ শাসনব্যবস্থাকে ইংরাজের নিয়ন্ত্রণে আনিবার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শিখ নেতাগণ প্রমাদ গনে। লাহোরের সন্ধির অন্যতম শর্ত এই ছিল যে সন্ধি স্বাক্ষরের পর ইংরাজ সেনা পাঞ্জাব হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু ইংরাজ সেনাদল লাহোর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পাঞ্জাব হইতে সরিয়া যাইতে টালবাহানা করে। ইহার ফলে শিখগণের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। এই অবস্থায় রানী ঝিন্দন দরবারের শাসনকার্যে ইংরাজের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে রেসিডেণ্ট তাঁহাকে বন্দী করিয়া চুনার দুর্গে রাখেন। রাজামাতার অপমানে খালসা সেনাদল ক্ষেপিয়া যায়।

ইংরাজের আক্রমণ নীতি : দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

মুলতানের শাসনকর্তা মুলরাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার সহিত শিখনেতা শের সিংহ ও আফগান সর্দারেরাও যোগ দেন। মুলরাজের বিদ্রোহ ক্রমে খালসাগণকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে শিখদের সহিত ইংরাজের বিরোধ দেখা দেয়।

মুলরাজের বিদ্রোহ

লর্ড ডালহৌসী তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুযায়ী পাঞ্জাব দখলের চেষ্টায় ছিলেন। মুলরাজের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া তিনি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পান। তিনি

এক ঘোষণার দ্বারা বলেন যে শিখগণ অতীত অভিজ্ঞতা ভুলিয়া ইংরাজকে আক্রমণ করিয়াছে। এজন্য তিনি শিখশক্তিকে ধ্বংস করার সংকল্প নেন। ডালহৌসী যুদ্ধের জন্য শিখগণকে দায়ী করিলেও, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা যথা মিল ও কানিংহাম প্রভৃতি এই যুদ্ধের জন্য ইংরাজের আগ্রাসী নীতিকে দায়ী করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
শিখ শক্তির পতন

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে খালসা সেনাদল বিপুল বিক্রমে লড়িয়া চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। খালসাগণের বীরত্ব ইংরাজ সেনাপতিগণের ভূয়সী প্রশংসা পায়। ইংরাজ শক্তি জয়লাভ করার পর ডালহৌসী শিখ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া সমগ্র পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শিখ রাজা দলীপ সিংহ ইংরাজের আশ্রয়ে বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। খালসা বাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পাঞ্জাব অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থান স্পর্শ করে। ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবে ইংরাজকে আফগান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে যদি পাঞ্জাবকে মিত্র রাজ্য হিসাবে বজায় রাখা হইত তবে হয়ত ইংরাজকে আফগান সমস্যা লইয়া এত বিব্রত হইতে হইত না। সুতরাং লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব অধিকার করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দেন ইহা মনে করার কোন কারণ নাই।

শিখ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Sikh downfall)ঃ পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ যে সাম্রাজ্য নিজ হাতে স্থাপন করেন তাঁহার জীবিতকালেই তাহাতে ধ্বংসের বীজ দেখা দেয়। রঞ্জিৎ সিংহ যে বিশাল বাহিনী (প্রায় ৪০ হাজার সেনা) গঠন করেন, তাহাকে তিনি প্রথম দিকে নগদ বেতন দিলেও শেষের দিকে বেতন বাকি পড়ে। রঞ্জিতের সেনাদলের ব্যয় তাঁহার রাজস্ব অপেক্ষা বেশী হইলে এই ব্যয় নির্বাহ করা দুস্কর হইয়া পড়ে। ফলে জায়গীর দ্বারা বেতন পরিশোধের চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে সেনাদলে শৃংখলা নষ্ট হইয়া যায়। রঞ্জিৎ সিংহ খালসা বাহিনী গঠন করিলেও তাঁহার অবর্তমানে এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার মত কোন নেতা সৃষ্টি করেন নাই। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর খালসা সেনা উচ্ছৃংখল হইয়া উঠে। ইহারা দরবারের রাজনীতিতে হাত দিবার চেষ্টা করে এবং নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রঞ্জিৎ ইংরাজের চক্রান্তে শতদ্রুর পূর্ব-তীরের রাজ্য অধিকার করিতে ব্যর্থ হন। অমৃতসরের সন্ধির দ্বারা ইংরাজ তাঁহার হাত বাঁধিয়া ফেলে। রঞ্জিৎ বুঝিতে পারেন যে ভারতে একচ্ছত্র ক্ষমতা পাইবার পর ইংরাজ স্বাধীন শিখ শক্তিকে সহ্য করিবে না। সুতরাং ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। রঞ্জিৎ নিজ জীবদ্দশায় এই যুদ্ধ এড়াইয়া গিয়া মহা ভুল করেন। তাঁহার দুর্বল বংশধরের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব ছিল না। রঞ্জিতের উত্তরাধিকারীগণ ছিল অযোগ্য ও কলহপরায়ণ। ইহাদের দুর্বলতার সুযোগে শিখ সর্দারগণ ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত করে। শিখ সর্দারগণের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা শিখগণের পতন ত্বরান্বিত করে। অপরদিকে

রঞ্জিৎ সিংহের
নীতির ফল

পরবর্তী শিখ নেতাগণের অপদার্থতা

ইংরাজ শক্তির কূটনৈতিক দক্ষতা ও উন্নত সামরিক শক্তির সহিত শিখগণের আঁটিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সিন্ধু বিজয়
(Conquest of Sind)

পাঞ্জাব সীমান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইলে স্বভাবতই ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি সিন্ধু দেশের দিকে পড়ে। আলেকজাণ্ডার বার্ণেস সিন্ধুনদ ধরিয়া নদীপথে উজানে পাঞ্জাবের দিকে ১৮৩১ খ্রীঃ যাত্রা করেন। এদিকে মাহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ সিন্ধু বিজয়ের পরিকল্পনা করিলে, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক কর্ণেল পটিঞ্জারকে পাঠাইয়া সিন্ধু দেশের আমীরগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। লর্ড অকল্যাণ্ড আফগান যুদ্ধের সময় সিন্ধু দেশে ইংরাজের সামরিক ঘাঁটি বসান এবং আমীরগণকে ইংরাজের রক্ষণাধীনে আনেন। এদিকে লর্ড নেপিয়ার নামক ইংরাজ সেনাপতি সিন্ধু দেশে ব্রিটিশ আধিপত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপনের চেষ্টা করিলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। লর্ড নেপিয়ার সিন্ধুর আমীরগণকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অধীনতায় আনিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে সিন্ধুর আমীরগণ ক্ষেপিয়া যান। এমতাবস্থায় সিন্ধু যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বড়লাট লর্ড এলেনবরা মিয়ানী দাবোর যুদ্ধে আমীরগণকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার : লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতি
(Expansion of the British Empire : Annexations of Dalhousie)

লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্বত্ব-বিলোপ নীতি

(Annexation of Lord Dalhousie and the Doctrine of Lapse) : ভারতে যে সকল ইংরাজ বড়লাট সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদের মধ্যে প্রধান বলা যায়। স্যার রিচার্ড টেম্পলের মতে "ভারতে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর সমতুল্য কেহ ছিলেন না"।[১] ডালহৌসী সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইনেস (Innes) মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ডালহৌসীর পূর্ববর্তী ইংরাজ শাসকগণ সম্ভবপর হইলে রাজ্য দখল বা লড়াই এড়াইতে চাহিতেন, কিন্তু ডালহৌসী সর্বদা রাজ্য দখলের সুযোগ খুঁজিয়া বাহির করিতেন।" তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য লর্ড ডালহৌসীকে লর্ড ওয়েলেসলির সহিত তুলনা করা যায়। ডালহৌসী মনে করিতেন যে ভারতীয় রাজাগণের শাসন ব্যবস্থা যুগের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইংরাজের আলোকপ্রাপ্ত শাসনে এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে আনা তিনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ভারতীয়গণ ইংরাজ শাসন পছন্দ করিবে কিনা ইহা বিবেচনা করিতে লর্ড ডালহৌসী তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের জন্য আদৌ রাজী ছিলেন না। সুতরাং আইনের মার প্যাঁচ অথবা বল প্রয়োগ যে কোন উপায়ে তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করিবার সংকল্প নেন।

ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি

লর্ড ডালহৌসী সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনটি নীতি নেন, যথা—যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয়, কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য গ্রাস এবং স্বত্ব-বিলোপ নীতি।

(১) যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য জয় নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের দ্বারা পাঞ্জাব অধিকার করেন (বিশদ বিবরণ চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১২৯ দেখ)। পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতানের শাসনকর্তা মুলরাজের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া লর্ড ডালহৌসী লাহোরের সন্ধিভঙ্গের জন্য শিখ দরবারকে দায়ী করেন। তিনি শিখ দরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে খালসা সেনাকে পরাজিত করেন। পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (২) ডালহৌসী ব্রহ্মের দিকেও নজর দেন। ইংরাজ বণিকগণের প্রতি খারাপ ব্যবহার ও ইংরাজ দূত কমোডোর ল্যাম্বার্টের প্রতি অপমান জনক ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি ব্রহ্ম আক্রমণ করেন। ফলে দক্ষিণ ব্রহ্ম বা পেগু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এছাড়া আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলও ইংরাজ অধিকারে আসে (বিশদ বিবরণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃঃ ১২৩ দেখ)। (৩) সিকিমের রাজা কর্তৃক ইংরাজ কর্মচারীগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করার অজুহাতে তিনি হিমালয় সংলগ্ন সিকিমের একাংশ দখল করেন।

যুদ্ধ দ্বারা সাম্রাজ্য জয়: শিখ ও ব্রহ্ম যুদ্ধ

কুশাসনের অজুহাতে ডালহৌসী বশ্যতামূলক মিত্রতাভুক্ত রাজ্যগুলির কয়েকটিকে অধিকার করেন। এই রাজ্যগুলির অধিকারের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসী যুক্তি দেখান যে প্রজাগণকে ইংরাজের উন্নত এবং আলোক প্রাপ্ত শাসনের আওতায় আনা তাঁহার কর্তব্য। অযোধ্যা রাজ্য দীর্ঘকাল ইংরাজের বশ্যতামূলক মিত্রতার অধীন ছিল। বশ্যতামূলক চুক্তি অনুযায়ী ইংরাজ সেনাদলের

কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য গ্রহণ

---

১. "As an imperial administrator, Dalhousie has never been surpassed and seldom squalled by any illustrious men whom England had sent forth to govern India."—Sir R. Temple.

ব্যয় নির্বাহের জন্য অযোধ্যার নবাবগণ ইংরাজ সরকারে প্রভূত অর্থ আদায় দিতেন। কিন্তু ইংরাজ সরকারের অর্থের দাবী উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে। এদিকে অযোধ্যার নবাব নিজ বিলাস-ব্যসনের খরচ ও কোম্পানীকে বাড়তি টাকা যোগাড়ের জন্য প্রজার উপর শোষণ চালান। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি ছিলেন অকর্মণ্য। তিনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় ও মজলিসী লোক। কোম্পানীর দাবী মিটাইয়া প্রজার মঙ্গল করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। সুতরাং তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় গোলোযোগ দেখা দেয়। লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অজুহাতে নবাব ওয়াজিদ আলিকে গদীচ্যুত করিয়া অযোধ্যা রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এছাড়া ডালহৌসী হায়দরাবাদের নিজামের নিকট বশ্যতা-মূলক মিত্রতা অনুযায়ী কোম্পানীর নিকট দেয় অর্থের দাবী করেন। নিজাম বকেয়া টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় তিনি নিজামের রাজ্যভুক্ত বেরার প্রদেশ অধিকার করেন।

লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের তৃতীয় পন্থা ছিল স্বত্ব-বিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse)। এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা তিনি বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। হিন্দু আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকিলে সেই ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হিসাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিত।

স্বত্ব-বিলোপ নীতি

হিন্দু আইনে দত্তক পুত্র তাঁহার দত্তক পিতার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। হিন্দু রাজাগণও উত্তরাধিকারী হিসাবে পুত্র সন্তান না থাকিলে এই প্রথা অনুযায়ী দত্তক গ্রহণ করিতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় রাজাগণের দত্তক গ্রহণ প্রথা নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবিতেছিলেন। ইংলণ্ডের পরিচালক সভা ১৮৩৪ খ্রীঃ দেশীয় রাজাগণের দত্তক গ্রহণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। লর্ড ডালহৌসী বড়লাট হইলে দত্তক গ্রহণ প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কোম্পানীর রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন, যথা—(১) কোম্পানীর দ্বারা স্থাপিত দেশীয় রাজ্য ; (২) কোম্পানীর অধীনস্থ করদ রাজ্য ; (৩) স্বাধীন দেশীয় রাজ্য। লর্ড ডালহৌসী নির্দেশ দেন যে প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ-বংশের কোন স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকিলে সিংহাসনে এই রাজবংশের স্বত্ব লোপ পাইবে। দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া এই বংশের অধিকার রক্ষা করা চলিবে না। উত্তরাধি-কারী না থাকায় এই বংশের স্বত্ব লোপ পাইয়া কোম্পানীতে এই স্বত্ব বর্তাইবে। কারণ মুঘল সম্রাটের উত্তরাধিকারী হিসাবে কোম্পানী হইল ভারতের সার্বভৌম শক্তি। সুতরাং কোন রাজবংশের উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহা সার্বভৌম শক্তির হাতে যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ করদ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণ করিতে হইলে কোম্পানীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া দত্তক গ্রহণ করা চলিবে না। যদি কোম্পানীর অনুমতি না পাওয়া যায় তবে এই বংশের স্বত্ব লোপ পাইয়া কোম্পানীতে বর্তাইবে। তৃতীয়তঃ, স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণে কোম্পানীর কোন আপত্তি থাকিবে না। এই নির্দেশনামার নাম হইল স্বত্ববিলোপ আইন (Doctrine of Lapse)। স্বত্ববিলোপ আইনের সমর্থনে ডালহৌসী আরও বলেন যে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থা যেহেতু

দুর্নীতিপূর্ণ সেহেতু শাসক রাজবংশের উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই সুযোগে সেই রাজ্যটিকে কোম্পানীর সুশাসনের আওতায় আনা কর্তব্য।

এই স্বত্ব-বিলোপ আইনের বলে লর্ড ডালহৌসী সাতারা, জৈৎপুর, সম্বলপুর, উদয়-পুর, ঝাঁসি, ভগৎ, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকায় এই রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করেন। এছাড়া স্বত্ব-বিলোপ আইন দ্বারা তিনি উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজবংশের ভাতা প্রদান বন্ধ করেন। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তক পুত্র নানাসাহেবের পেশবা উপাধি ও পেশবার ভাতা বন্ধ করা হয়। কর্ণাটের নবাবের উত্তরাধিকারী না থাকায় এবং তাঞ্জোরের রাজারও উত্তরাধিকারী না থাকায় উভয় দেশের রাজপদ লোপ ও ভাতা বন্ধ করা হয়।

স্বত্ব-বিলোপ আইন প্রয়োগ

লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপ নীতির বহু ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ, স্বত্ব-বিলোপ আইন দ্বারা তিনি হিন্দু সমাজের দত্তক পুত্র গ্রহণের বহু পুরাতন প্রথাকে রদ করেন। ইহার ফলে লোকে অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বত্ব-বিলোপ আইন কেবলমাত্র হিন্দু রাজাগণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। মুসলিম শাসকগণের উপর উহা প্রযুক্ত হইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, স্বত্ব-বিলোপ নীতি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। পরে বিলাতের পরিচালক সভা স্বত্ব-বিলোপের অপ-প্রয়োগ দেখিয়া অনেকগুলি রাজ্য ফিরাইয়া দেন। চতুর্থতঃ, উদয়পুর রাজ্য কোম্পানীর সৃষ্ট ছিল না, ভগতের ক্ষেত্রেও আইনের অপ-প্রয়োগ হয়। এজন্য পরিচালক সভা এই রাজ্যগুলি ফিরাইয়া দেয়। পঞ্চমতঃ, ডালহৌসী স্বত্ব-বিলোপ আইনের নির্বিচার প্রয়োগ এবং তাঁহার নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করেন। এই বিদ্রোহে রাজ্যহারা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ও নানাসাহেব নেতৃত্ব দেন। ষষ্ঠতঃ, অযোধ্যা অধিকার করিয়া ডালহৌসী একটি অনুগত ও বশম্বদ রাজবংশের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা দেখান। অযোধ্যা অধিকার করিলে ইহার বেকার সিপাহী ও কর্মচারীগণ অন্য কাজ না পাইয়া ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে যোগ দেয়। স্যার হেনরী লরেন্স মন্তব্য করিয়াছেন যে, "অযোধ্যা প্রদেশে ইংরাজের হস্তক্ষেপ অযোধ্যা নবাবের দরবার ও অযোধ্যার প্রজাগণের ঘোর বিরাগের কারণ হয় এবং ইংরাজের সুনামকে কলঙ্কিত করে।"[১] এইভাবে ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করে।

স্বত্ব-বিলোপ নীতির সমালোচনা

১, "The British interference with that province has been as prejudicial to the court and people as it has been disgraceful to the British name." Sir Henry Lawrence.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার : বশ্যতামূলক মিত্রতা হইতে সর্বভৌমত্ব লাভ

(Establishment of the British Indian Empire : From the Subsidiary Alliance to Paramountcy)

বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতি : লর্ড ওয়েলেসলি (Subsidiary Alliance and Lord Wellesley) : ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলার দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সমমর্যাদা লাভের চেষ্টা করে। কোম্পানী দাবী করে যে ভারতের নিজাম, অযোধ্যার নবাব, পুনার পেশবার মত কোম্পানীও একটি ভারতীয় শক্তি হিসাবে স্থান পাইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা ও মহীশূর যাহাতে কোম্পানীর রাজ্যকে আক্রমণ না করে এজন্য ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যার নবাব, নিজাম প্রভৃতির সহিত চুক্তি করিয়া আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করেন। স্যার উইলিয়াম লি ওয়ার্ণার এই নীতিকে "বেড়া জাল নীতি" বা Ring fence theory বলিয়াছেন।

সমমর্যাদা লাভের নীতি

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ) ভারতে বড়লাট নিযুক্ত হইলে কোম্পানীর দেশীয় রাজ্য নীতিতে এক বড় রকমের পরিবর্তন হয়। ওয়েলেসলি ছিলেন ক্ষমতাপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ভারতীয় রাজা ও তাঁহাদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি মনে করিতেন যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর উন্নত শাসন ব্যবস্থায় আনা উচিত। ভারতবাসীরা কোম্পানীর শাসন পছন্দ করিবে কিনা ইহা লইয়া তিনি মাথা ঘামাইতেন না। এদিকে ফরাসী বীর নেপোলিয়ন মিশর হইতে ভারত আক্রমণের তোড়জোড় করায় লর্ড ওয়েলেসলি আশঙ্কিত হন। তিনি আশঙ্কা করেন যে ভারতীয় রাজাগণ, বিশেষতঃ, টিপু সুলতান ইংরাজের বিরুদ্ধে ফরাসীগণের সহিত যোগ দিবে। এদিকে দৌলতারাও সিন্ধিয়া প্রভৃতি রাজাগণ ফরাসী সেনাপতিগণের সহযোগিতায় ইওরোপীয় কায়দায় শিক্ষিত ভারতীয় বাহিনী গড়িয়া তুলিলে ওয়েলেসলি চিন্তিত হন। তিনি আশঙ্কা করেন যে সুশিক্ষিত ভারতীয় সেনা কোম্পানীকে ঘায়েল করিয়া ফেলিবে।

বশ্যতামূলক নীতি গ্রহণের কারণ

উপরোক্ত দিক বিবেচনা করিয়া লর্ড ওয়েলেসলি সিদ্ধান্ত নেন যে ভারতের অন্যান্য দেশীয় শক্তির সহিত সমান মর্যাদায় থাকিয়া কোম্পানীর লাভ নাই। দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর রক্ষিত বা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করিয়া কোম্পানীকে ভারতের প্রধান বা মুখ্য শক্তির আসনে বসাইতে হইবে। ভারতের সকল রাজাদের উপর

প্যারামাউণ্ট (Paramount) বা অধিরাজ শক্তিরূপে স্থাপিত হইয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিলে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবে। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে কোম্পানীর বিরোধিতা অথবা ফরাসীগণের সহিত যোগদান করা সম্ভব হইবে না।

কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপনের নীতি

ওয়েলেসলি তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে রূপায়িত করিবার জন্য যে সন্ধি-পত্রের খসড়া তৈয়ারী করেন তাহার নাম ছিল বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতি (Subsidiary Alliance)। এই সন্ধির শর্ত ছিল এইরূপ—(১) ভারতীয় রাজাগণকে কোম্পানীর সহিত বশ্যতামূলক মিত্রতা স্থাপনের জন্য আহবান জানান হইবে। (২) এই মিত্রতা যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহারা কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে অপর কোন শক্তির সহিত মিত্রতা স্থাপন বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে পারিবেন না। (৩) মিত্র রাজ্যে ইংরাজ সৈন্য ছাড়া আর কোন ইওরোপীয় নাগরিককে কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে ঢুকিতে দেওয়া যাইবে না। (৪) মিত্র রাজ্যকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষার দায়িত্ব কোম্পানী গ্রহণ করিবে। (৫) প্রতি মিত্ররাজ্যে একদল ইংরাজ সেনা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকিবে। (৬) এই সেনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য মিত্র রাজা নগদ অর্থ অথবা রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দিবেন। (৭) মিত্র রাজ্যে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবেন। (৮) কোম্পানী মিত্র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না।



লর্ড ওয়েলেসলি

বশ্যতামূলক সন্ধির শর্ত

ওয়েলেসলি ভারতীয় রাজাগণকে বশ্যতামূলক সন্ধি গ্রহণের আহবান জানাইলে (১) হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম ইহা গ্রহণ করেন। হায়দরাবাদের সন্ধির ফলে কোম্পানী নিজামের রক্ষার ভার নেয় এবং ইহার বিনিময়ে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ অঞ্চল লাভ করে। (২) অযোধ্যার নবাবও এই সন্ধি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ওয়ারেন হেস্টিংস বেনারসের সন্ধি দ্বারা অযোধ্যার নবাবের অনেক ক্ষমতা হরণ করিয়াছিলেন। এখন ওয়েলেসলি পুনরায় নবাবের উপর চাপ দিলে নবাব খাঁচায় আটকান পাখীর ন্যায় ডানা ঝটপট করিয়া শেষ পর্যন্ত বশ্যতামূলক সন্ধি গ্রহণ করেন। ইহার বিনিময়ে রোহিলখণ্ড, দোয়াব ও গোরক্ষপুরের উর্বর অঞ্চল কোম্পানী লাভ করে। (৩) পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করিয়া ইংরাজের সহিত বশ্যতামূলক স্থাপন গ্রহণ করেন। (বিশদ বিবরণ ১১৫-১১৬ পৃঃ দেখ) (৪) বরোদার গাইকোয়াড়ও এই সন্ধি মানিয়া নেন। (৫) মারাঠা সর্দার সিন্ধিয়া, ভোঁসলে ও হোলকার বেসিনের সন্ধি অস্বীকার করিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত হন। (বিশদ বিবরণ পূর্বে পৃঃ ১১৬ দেখ)।

বশ্যতামূলক মিত্রতার প্রয়োগ

ভোঁসলে দেওগাঁওয়ের সন্ধি ও সিন্ধিয়া সুর্যিঅর্জুন গাঁওয়ের বশ্যতামূলক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। ইহার ফলে তাঁহারা কোম্পানীর আশ্রিত রাজায় পরিণত হন। হোলকার শেষ পর্যন্ত রাজপুরঘাটের সন্ধি স্থাপন করেন। (৬) রাজপুতানার যোধপুর ও জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যও বশ্যতামূলক সন্ধিতে স্বাক্ষর করে। (৭) আর্কটের মৃত নবাব মহম্মদ আলির পুত্র ইংরাজের বিরুদ্ধে টিপুর সহিত যোগদানের অভিযোগে বশ্যতামূলক সন্ধি গ্রহণে বাধ্য হন। (৮) লর্ড লেক দিল্লী প্রবেশ করিয়া মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমকে মারাঠা রক্ষণাধীন হইতে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে আনিয়া বাদশাহের উপর কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করেন। (৯) মহীশূরের সুলতান টিপু বশ্যতামূলক মিত্রতা সন্ধি অগ্রাহ্য করিলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হন। মহীশূরের পুরাতন হিন্দু রাজবংশ কোম্পানীর আশ্রিত হিসাবে মহীশূরের সিংহাসনে স্থাপিত হয়। (বিশদ বিবরণ ১০৬ পৃঃ দেখ)। এইভাবে বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতি দ্বারা লর্ড ওয়েলেসলি জনেক কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকের মতে "ভারতের অভ্যন্তরস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।"[১]

লর্ড মিণ্টোর নিরপেক্ষতা নীতি

লর্ড ওয়েলেসলির পর স্যার জর্জ বার্লো বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি লর্ড ওয়েলেসলির বশ্যতামূলক মৈত্রীনীতি ত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ইহার পর লর্ড মিণ্টোও দেশীয় রাজ্যের সহিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়া চলেন।

লর্ড হেস্টিংসের সার্বভৌমত্ব নীতি

লর্ড হেস্টিংস ১৮১৩ খ্রীঃ বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করিলে কোম্পানীর রাজ্য বিস্তার নীতিতে পুনরায় জোয়ার আসে। তিনি ভারতে আসিয়া লর্ড ওয়েলেসলির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিকে সম্পূর্ণ করার সংকল্প নেন। লর্ড হেস্টিংস লক্ষ্য করেন যে, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি ফসিলের ন্যায় প্রস্তরীভূত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ইহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। ওয়েলেসলির নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর অধিরাজত্বের অধীনে (Paramountcy) আনার তিনি সংকল্প নেন। এই উদ্দেশ্যে হেস্টিংস পুনার সন্ধি দ্বারা মারাঠা পেশবার পদ লোপ করেন। পেশবা ইংরাজের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটে। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর লর্ড হেস্টিংস ভারতীয় রাজাগণের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করেন তাহাতে কোম্পানী অধিরাজ (Paramount) হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং ভারতীয় রাজাগণ কোম্পানীর অধীনস্থ রাজ্য হিসাবে পরিণত হয়। মুঘল সম্রাটের কাজ আইনতঃ বর্তমানে থাকিলেও তিনি বিষহীন ঢোঁড়া সাপের মত নির্জীব হইয়া থাকেন। তাঁহার সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় এবং তিনি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় মুঘল সম্রাটের অধিরাজত্বের বাস্তব দাবী লোপ পায়। মুঘল সম্রাটের স্থলে কোম্পানীই অধিরাজত্ব গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক লয়ার্ডের মতে "ব্রিটিশ

১. "The British Empire in India became the British Empire of India." (C. H, I. Vol. V).

সরকার সুজারিন বা অধিরাজ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।"[১] এইভাবে লর্ড হেস্টিংস কোম্পানীর অধীনে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে আনেন। ভারতীয় রাজাদের বৈদেশিক নীতি, আত্মরক্ষা ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। ইংরাজ রেসিডেণ্টগণ দরবারে বসিয়া রাজাগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন।

লর্ড হেস্টিংস কোম্পানীকে ভারতে প্যারামাউণ্ট বা অধিরাজ শক্তিতে পরিণত করিবার পর, লর্ড ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন। এইভাবে ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌম শক্তিরূপে উদিত হয়।

লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি

দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপনের ফলাফল (Effects of the British supremacy on the Indian States) ঃ উপরের আলোচনায় কিভাবে ভারতে কোম্পানীর সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর অধীনে আনার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির কি অবস্থা হয় তাহা এখন আলোচনা করা হইবে। কোম্পানী সার্বভৌম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাইবার পর ভারতে পাঁচ শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য দেখা যায়। যথা, (১) নিজাম ও সিন্ধিয়া প্রভৃতি শক্তির অধীনে অর্ধ স্বাধীন রাজ্য। (২) অযোধ্যার নবাবের বশ্যতামূলক রাজ্য। ইহার আভ্যন্তরীণ শাসন নবাবের অধীনেই থাকে। (৩) ইংরাজের সহিত সন্ধির দ্বারা স্থাপিত রাজ্য যথা মহীশূর ও রাজপুত রাজ্যগুলি। (৪) ক্ষুদ্র রাজ্য যথা কাথিওয়াড়, টংক, ঝাঁসী প্রভৃতি। (৫) কোম্পানীর সনদের বলে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য।

পাঁচ শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য

কোম্পানীর অধিরাজত্বের আওতায় আসিবার পর এই সকল রাজ্যগুলির বৈদেশিক সম্পর্ক কোম্পানীই নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহৎ রাজ্যগুলিতে কোম্পানীর সেনা বশ্যতামূলক সন্ধি অনুযায়ী অবস্থান করায় এই রাজ্যগুলির পক্ষে কোম্পানীর বিরোধিতা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোম্পানী সাধারণতঃ হাত না দিলেও, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ দেখা দিলে কোম্পানী হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। এই সূত্র ধরিয়া কোম্পানী কার্যতঃ আশ্রিত রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে।

বৈদেশিক সম্পর্ক লোপ ও আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসন লাভ

বশ্যতামূলক মিত্রতা ও অধিরাজত্বের আওতায় থাকিয়া ও দায়িত্বহীন নিরাপত্তা ভোগ করিয়া দেশীয় রাজবংশগুলি ক্রমশঃ অযোগ্য ও অকর্মন্য লোকে পূর্ণ হইয়া যায়। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ভয় না থাকায় রাজবংশগুলি তাহাদের পুরাতন সামরিক দক্ষতা হারাইয়া ফেলে। তাছাড়া কোম্পানীর সেনা বা শাসন বিভাগের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত না হইবার ফলে দেশীয় রাজা ও অভিজাতগণ শাসনকার্য চালাইবার দক্ষতা হারাইয়া ফেলে। আকবর ও ঔরঙ্গজেবের আমলে দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়া তাহাদের পূর্বপুরুষগণ

দায়িত্বহীন নিরাপত্তা ও যোগ্যতার অবনতি

১. Cambridge History of India. Vol. V.

যে যোগ্যতার পরিচয় দেন তাহা কোম্পানীর আমলে নষ্ট হয়। ফলে রাজ্য রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বশ্যতামূলক মিত্রতার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সর্বনাশ ঘটে। ইংরাজ সেনাদলের সর্বনাশা খরচ যোগাইতে দেশীয় রাজ্যগুলি নিঃস্ব হইয়া যায়। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে কোম্পানী সুযোগ বুঝিয়া বকেয়া অর্থ বাবদ মিত্র রাজ্যের রাজ্যাংশ গ্রাস করে। কোম্পানী মাঝে মাঝে ইংরাজ সৈন্য-সংখ্যা বাড়াইয়া মিত্র রাজাগণের নিকট অধিক অর্থ দাবী করে। এই অর্থ দিতে অপারগ হইলে মিত্র রাজ্যের অংশ অধিকার করা হয়। বশ্যতামূলক মিত্রতার কর মিটাইতে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য হয় ঋণে ডুবিয়া যায় অথবা প্রজা শোষণ করিয়া কোম্পানীকে টাকা দিতে বাধ্য হয়।

অর্থনৈতিক শোষণ

এদিকে দেশীয় রাজাগণ নিজেদের বিলাসিতার খরচ ও কোম্পানীর দেয় অর্থ মিটাইবার জন্য প্রজাবর্গকে যথেচ্ছ শোষণ করিতে বাধ্য হয়। ইহার সুযোগ লইয়া কোম্পানী দেশীয় রাজাগণের বিরুদ্ধে কুশাসনের অজুহাতে পুরাতন রাজাকে অপসারিত করিয়া নূতন রাজা বসাইয়া দেয় অথবা সমগ্র রাজ্যটি কোম্পানীর শাসনে আনে। লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্য এইভাবেই কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। উত্তরাধিকারের গোলযোগের অজুহাতে কোম্পানী ১৮২৬ খ্রীঃ ভরতপুর, কুশাসনের অজুহাতে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক ১৮৩৯ খ্রীঃ মহীশূর, ১৮৩৪ খ্রীঃ কুর্গে হস্তক্ষেপ করে। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রয়োগের সময় কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে তাহা প্রয়োগ করেন। এইভাবে কোম্পানীর মিত্রতা সন্ধির অধীনে দেশীয় রাজ্যগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয় পায়।

কুশাসন ও অন্যান্য অজুহাতে দেশীয় রাজ্যের শাসনে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

(Reaction to British Policy of Expansion)

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ (Discontent against Company's Rule) : পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে সমগ্র ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজিয়া কোম্পানীর শাসন মানিয়া লইয়াছিল ইহা মনে করার কোন কারণ নাই। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ ইংরাজ

সেনার বিরুদ্ধে ভারতের মানুষেরা মাঝে মাঝে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালায়। যদিও তাহাদের কামান, বন্দুক ছিল না, তথাপি বুকে সাহস ও বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা লইয়া তাহারা আগাইয়া আসে। মুঘল যুগে ভারতের সম্পদ ভারতেই থাকিত। তাহা বাহিরে চলিয়া যাইত না। ভারতীয় শিল্পী, কারিগর ও মেহনতী লোকেরা কাপড়, মসলিন প্রভৃতি জিনিষ ইওরোপীয়গণকে বিক্রয় করিয়া দুপয়সা রোজগার করিত। কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের পুরাতন অর্থনীতি একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। ভারতীয় মাল খুবই কমদামে কিনিয়া কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীরা বিলাতে চালান দেয়। ইওরোপের বাজারে সেই মাল উঁচু দামে বিক্রয় করিয়া তাহারা প্রচুর মুনাফা লোটে। এদিকে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরগণ ইংরাজ বণিকদের নিকট মালের নায্য দামের বদলে কমদামে মাল বেচিতে বাধ্য হয়। লোকসানের ভয়ে মাল তৈয়ারী না করিলে সওদাগরী কারখানায় তাহাদের বেত্রাঘাত ও দৈহিক নির্যাতন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইতিমধ্যে বিলাতে কারখানায় যন্ত্রের দ্বারা সস্তায় মাল তৈয়ারী আরম্ভ হইলে কোম্পানী ভারতের কারিগরগণের নিকট মাল কেনা বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতীয় কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া যায়। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি শিল্প শহরগুলি জঙ্গলে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, বিলাতের কলে তৈয়ারী সস্তা মাল ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলে। লোকে সস্তা বিলাতী কাপড়, কাঁচের চুড়ি ও অন্যান্য মাল কিনিতে থাকে। ভারতীয় কারিগরদের হাতে তৈয়ারী মাল বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের অর্থ বিলাতী মালের দরুণ বিলাতে চালান যাইতে থাকে। ভারতীয় লক্ষ্মী দরিদ্র ও হতশ্রী হইয়া পথের ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। চতুর্থতঃ, কোম্পানী সরকারী চাকুরীগুলিতে শ্বেতাঙ্গ নিয়োগ করায় ভারতীয়গণের চাকুরী লাভের আশায় ছাই পড়ে। পঞ্চমতঃ, কোম্পানীর শাসিত অঞ্চলে জমির উপর কর বাড়ান হইলে অত্যধিক খাজনার চাপে চাষী ও মজুরেরা ধুঁকিতে থাকে। ইহার ফলে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর লোকের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠে। স্বাধীনতাকামী লোকেরা এই শোষণ মূলক ব্যবস্থাকে মানিয়া না লইয়া বিদ্রোহের দ্বারা ইংরাজ শাসনকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহকে ইহার চরম পরিণতি বলা যায়।

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ (Risings against British rule)ঃ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ভারতীয়গণের প্রতিরোধকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা (১) দেশীয় রাজন্যগণের প্রতিরোধ, (২) স্থানীয় জমিদার ও সাধারণ লোকের প্রতিরোধ। দেশীয় রাজন্যগণের সহিত যথা মারাঠা, মহীশূর প্রভৃতির সহিত ইংরাজের যুদ্ধের কাহিনী চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। (৯৯ পৃঃ হইতে দেখ) এই অধ্যায়ে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের কাহিনী আলোচনা করা হইতেছে।

(১) ১৭৯৪ খ্রীঃ মেদিনীপুরের তমলুক, হিজলীর লবণ গোলার কর্মী মালঙ্গীরা কোম্পানীর কর্মচারীগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই চালায়। ১৭৮২ খ্রীঃ

কোম্পানীর আমলাদার দেবী সিংহের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দিনাজপুরে এক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৯৯ খ্রীঃ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কৃষক, জমিদার, পাইক এবং আদিবাসী চুয়ারগণ এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং সন্নিহিত ধলভূম ও বীরভূম অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে। কোম্পানীর সেনাদল বলপ্রয়োগে এই বিদ্রোহ দমাইয়া ফেলে।

(২) ১৭৬০-১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কোম্পানীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। সন্ন্যাসীগণকে নিছক ডাকাত বলিয়া কোন কোন ইংরাজ লেখক চিত্রিত করিলেও ইহাদের পুরাপুরি ডাকাত মনে করিবার কারণ নাই। ইহাদের সংগঠন শক্তির এবং ইহাদের ডাকে ২০।৩০ হাজার লোকের একত্র সমাবেশ হইতে বুঝা যায় যে, সন্ন্যাসীদের পশ্চাতে জন সমর্থন ছিল। সন্ন্যাসীগণ সাধারণ কৃষকের স্বার্থরক্ষা করিবার চেষ্টা করে। তাহারা ইংরাজের অপশাসনের প্রতিবাদী ছিল একথা সাধারণভাবে বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে স্বামী সত্যানন্দের দেশপ্রেম এবং দেবী চৌধুরাণীতে ভবানী পাঠকের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা একেবারেই কাল্পনিক বলিয়া মনে করা যায় না। মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণীর কাহিনীর কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

(৩) পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পদচ্যুত মন্ত্রী ত্রিম্বকজী ডিংলের নেতৃত্বে পশ্চিমঘাট ও খান্দেশের আদিবাসী ভীলগণ ১৮১৮ খ্রীঃ, ১৮২৫ খ্রীঃ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শিউরাম নামক এক ব্যক্তি ভীলগণকে সশস্ত্র নেতৃত্ব দেয়। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এই বিদ্রোহে সমর্থন জানায়। বহু রক্তপাতের পর ইংরাজ সেনা ভীল বিদ্রোহ দমন করে। কচ্ছের রাজা ভারমল ইংরাজের বিরুদ্ধে (১৮১৯ খ্রীঃ, ১৮২৫ খ্রীঃ) বিদ্রোহ করিলে তাঁহার সমর্থনে কচ্ছ অঞ্চলে ব্যাপক গণ বিদ্রোহ ঘটে। কচ্ছবাসীগণ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের তীব্র অসন্তোষ জানায়। কিন্তু ইংরাজের সামরিক শক্তি এই বিদ্রোহ দমাইয়া ফেলে।

(৪) উত্তর প্রদেশের দোয়াব ও দিল্লী অঞ্চলের স্বাধীনতা-প্রিয় গুজার ও জাঠগণ ১৮২৪ খ্রীঃ ইংরাজের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। ব্রহ্ম যুদ্ধে ইংরাজ সেনার পরাজয়ের গুজব শুনিয়া তাহাদের সাহস বাড়িয়া যায়। সুরজমল নামে এক জাঠ বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। জাঠগণ দিল্লী অধিকার করার চেষ্টা করে। বহু ইংরাজ সেনার প্রাণহানির পর জাঠ বিদ্রোহ দমিত হয়।

(৫) কোলাপুর ও গঞ্জাম অঞ্চলে ইংরাজের শোষণমূলক ভূমি ও রাজস্ব আইন জনসাধারণের গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এছাড়া ইংরাজ প্রতিনিধি দাজী পণ্ডিত ইংরাজের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য বৈষম্যমূলক আইন চালু করিলে স্থানীয় বণিক ও গাদকারী সম্প্রদায়ের জীবিকা বিপন্ন হয়। ফলে গাদকারী বিদ্রোহ ১৮৪৫ খ্রীঃ দেখা দেয়। ইংরাজ সেনা বহু রক্তপাতের দ্বারা এই বিদ্রোহ দমাইয়া ফেলে। কোম্পানী গঞ্জামের জমিদার ধনঞ্জয় ভঞ্জের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিলে তিনি কোলাইডা দুর্গে আশ্রয় লইয়া বিদ্রোহের পতাকা তুলেন। পরে ইংরাজ সেনা কোলাইডা দুর্গ অধিকার করে।

(৬) ইংরাজ শাসন গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলে বিস্তৃত হইলে এই অঞ্চলের স্বাধীনতা-প্রিয় খাসিয়া অধিবাসীগণ ইহার প্রতিরোধ করে। তিরুত সিং ও বরমানিক নামে দুই নেতার অধীনে তাহারা নানকোলা অধিকার (১৮২৯ খ্রীঃ) করিয়া ইংরাজ ও তাহাদের তাঁবেদার বাঙালী কর্মচারীগণকে হত্যা করে। চার বৎসর পর বিদ্রোহের নেতা তিরুত সিং আত্মসমর্পন করিলে খাসি বিদ্রোহের অবসান হয়।

(৭) ছোটনাগপুর ও মানভূম অঞ্চলের হো, মুণ্ডা ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীগণ ইংরাজ কর্তৃক তাহাদের স্বাধীনতা হরণে ক্ষুব্ধ হয়। এই সকল আদিবাসীদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানী বহিরাগত কর্মচারী নিয়োগ করিলে স্থানীয় অসন্তোষ জ্বলিয়া উঠে। রাঁচী-হাজারিবাগ অঞ্চল লইয়া প্রায় ৪ হাজার বর্গমাইল স্থানে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। ইংরাজ সেনা বিদ্রোহীগণের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া ও অকথ্য অত্যাচার করিয়া বিদ্রোহ আপাততঃ দমন করে।

১৮৫৫ খ্রীঃ রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত অঞ্চলে পুনরায় সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্থানীয় বাঙালী ও বিহারী জমিদারগণের শোষণ ও অত্যাচার, বিহারী মহাজনদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের চড়া সুদের চাপে সাঁওতালগণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ইংরাজ সরকার অত্যাচারী জমিদারদের সমর্থন করায় সাঁওতালগণ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যায়। এদিকে ইংরাজ সেনা কোন কোন ক্ষেত্রে সাঁওতাল নারীর সম্মান নষ্ট করায় স্বাধীনতা-প্রিয় সাঁওতালগণ অপমানিত বোধ করে। সিধু ও কানু নামক দুই ভ্রাতার নেতৃত্বে সাঁওতালগণ ১৮৫৫ খ্রীঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা কোম্পানীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন সাঁওতাল-রাজ স্থাপন করে। তীর, ধনুক ও কুঠার লইয়া অসীম সাহসে লড়াই করিয়া ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে বহু সাঁওতাল প্রাণ দেয়। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সেনার হাতে সাঁওতালদের পরাজয় বরণ করিতে হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের অবসান ঘটে। বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্নার চরিত্র এই বিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত।

নীল বিদ্রোহ (Indigo Riots) : ইওরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর ভারতে তৈয়ারী কাঁচামালের চাহিদা ইওরোপের বাজারে বাড়ে। ফলে ইংরাজেরা ভারতে উৎপন্ন নীল ইওরোপের বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা পাইতে থাকে। ভারতে জমি কিনিয়া ব্যাপকভাবে নীলের চাষ করিবার পরিকল্পনা করে। ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন পাশ হইবার পর ইংলণ্ডের খামার মালিকেরা ভারতে আসিয়া জমি কিনিয়া চা ও নীলের চাষ করিবার অধিকার পায়। ফলে ইংলণ্ডের প্ল্যাণ্টার বা নীলকর ও চা-কর শ্রেণী ভারতে আসিয়া নীলের চাষে লাগিয়া পড়ে। এই সব নীলকরগণ ছিল খুবই বর্বর ও বন্য স্বভাবের লোক। ইহারা বাংলার চাষীকে ধান ও কলাই চাষ বন্ধ করিয়া সেই জমিতে নীলের চাষ দিতে বাধ্য করে। ফলে চাষীর খোরাকি ধান্য উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। জমিতে উৎপন্ন নীল ইচ্ছামত কম দাম দিয়া নীলকরগণ কিনিয়া নেয়। ফলে চাষীর ঘরে 'হা অন্ন' রব উঠে। দরিদ্র চাষী নীলের চাষে রাজী না হইলে পেয়াদা, লাঠিয়াল দিয়া তাহাকে মারধর ও নির্যাতন করা হয়। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নীল-

করগণের অত্যাচারের এক করুণ চিত্র আঁকিয়াছেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার তেজস্বী সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর সাহেবগণের বিরুদ্ধে কলম ধরেন।

বাংলার চাষীগণ নীলকরগণের জবরদস্তির বিরুদ্ধে (১৮৭৬ খ্রীঃ) প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করে। পোড়াগাছার জমিদার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, নড়াইলের রামরতন মল্লিক নীল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। বাংলার চাষী শত অত্যাচারেও নীল বুনিতে অস্বীকার করে। এজন্য তাহারা দলে দলে জেলে যাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রজাগণের অসহযোগের ফলে নীলের চাষ বন্ধ হয়। এইভাবে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণ প্রতিবাদ জানায়। (নীল বিদ্রোহের বিশদ বিবরণ ৮৮ পৃঃ দেখ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া : ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন

(Muslim reaction : Wahabi and Faraji Movement)

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিম সমাজের অসন্তোষ (Discontent of the Indian Muslims against British rule) : ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবলমাত্র ভারতীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায় নাই। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমানভাবে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের হাত হইতে ইংরাজেরা ক্ষমতা অধিকার করে। মুঘল বাদশাহের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া কোম্পানীর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হইলে মুসলিম শাসিত রাজ্যগুলির অধিকার কোম্পানীর হাতে চলিয়া গেলে মুসলিম কর্মচারী, সেনাপতি ও সেনাগণ বেকার হইয়া পড়ে। যাহারা এতকাল বিভিন্ন পদে ক্ষমতা ভোগ করিতেছিল হঠাৎ তাহারা পথে বসিয়া যায়। লর্ড কর্ণওয়ালিস উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করিলে মুসলিম অভিজাতগণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। এদিকে বিলাতী মালে বাজার ছাইয়া গেলে মুসলিম তাঁতি, রেশম শিল্পী ও কারিগর শ্রেণী বেকার হইয়া পড়ে। মুসলিম সমাজে দারিদ্র্যের করাল ছায়া বিস্তৃত হয়। এদিকে হিন্দুগণ ইংরাজী শিখিয়া সরকারী চাকুরীতে ঢুকিয়া পড়িলে মুসলিমগণ ইংরাজী না শেখার ফলে পিছাইয়া পড়ে। ফলে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ে হতাশা দেখা দেয়।

ইংরাজ শাসনের ফলে মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি

এই পটভূমিকায় ভারতীয় মুসলিম সমাজে দুই ধরণের আন্দোলন দেখা দেয়। প্রথমতঃ, এক শ্রেণীর মুসলিম নেতা বিশুদ্ধ ইসলামের আদর্শে মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবেন। ইহারা ভারত হইতে ইংরাজকে বিতাড়নের কথাও বলেন। দ্বিতীয়তঃ, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি অপর নেতাগণ মুসলিম সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আধুনিক যুগের ভাবধারা হইতে শক্তি গ্রহণের জন্য আহবান জানান। প্রথম আন্দোলনকে মুখ্যতঃ ওয়াহাবি আন্দোলন এবং দ্বিতীয় আন্দোলনকে আলিগড় আন্দোলন বলা হয়। আলিগড় আন্দোলনের কথা অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (১৯৯ পৃঃ দেখ)।

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া

ওয়াহাবি আন্দোলন (The Wahabi Movement): ইসলামের শুদ্ধির জন্য উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে এক আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত মুসলিম সন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩—৬২ খ্রীঃ)। তিনি এই মত প্রচার করেন যে, ভারতে মুসলিম সমাজের মধ্যে অনেক অনাচার ঢুকিয়াছে। ইসলামকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য তিনি এবং তাঁহার পুত্র আজিজ পবিত্র কোরাণের উর্দু অনুবাদ করেন। রায়বেরিলীর অধিবাসী সৈয়দ আহমদ সাধু আবদুল আজিজের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামের পরিশুদ্ধি আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হন। ইতিমধ্যে সৈয়দ আহমদ মক্কাতে হজ করিতে গিয়া আরব দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের ভাবধারার সহিত পরিচিত হন। আরব দেশে ইসলামের পরিশুদ্ধির জন্য আবদুল ওয়াহাবী নামে এক ব্যক্তি আন্দোলন গঠন করেন। সৈয়দ আহমদ ভারতে আবদুল ওয়াহাবীর অনুরূপ আন্দোলন গঠন করেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্তিত আন্দোলনকে ওয়াহাবি আন্দোলন বলা হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলনের উৎপত্তি

ওয়াহাবি আন্দোলন প্রথম দিকে ইসলামের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে আরম্ভ হইলেও ইহা শেষ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ ও তাঁহার অনুগামীদের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলাম বা ইসলামের পবিত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা।

সৈয়দ আহমদ

সৈয়দ আহমদকেই ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীতে ১৭৮৬ খ্রীঃ তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এই মত প্রচার করেন যে, ভারতীয় ইসলামীয় আদর্শের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করার ফলেই মুসলিম সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটিয়াছে। পয়গম্বরের বাণী অনুসরণ করিয়া ভারতীয় মুসলিমগণ যদি জীবন ধারণা গঠন করেন তবে ভারতীয় মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটিবে। ভারতে বিধর্মী ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ইহা দার-উল-হারব বা বিধর্মী শাসকের দেশে পরিণত হইয়াছে। এই কারণে প্রতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উচিত পবিত্র ইসলামের

সৈয়দ আহমদের উদ্দেশ্য ইংরাজ বিতাড়ন

আলোকে জীবন গঠন করা। তিনি বিদেশীগণকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষকে দার উল ইসলামে পরিণত করার জন্য মুসলিমগণকে আহ্বান করেন। দ্বিতীয়তঃ, সৈয়দ আহমদ বলেন যে, বণিক ইংরাজেরা ভারতের সম্পদ লুঠ করিয়া দেশকে ঝাঁঝরা করিয়া দিতেছে। ইহাদের বিতাড়িত না করিলে দেশবাসীগণের রক্ষা নাই।[১]

তিনি মারাঠা রাজা হিন্দুরাও ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাগণকে ওয়াহাবি আন্দোলন সমর্থন করার আহ্বান জানান। সৈয়দ আহমদের পরামর্শে বিলায়েৎ আলি ও এনায়েৎ আলি নামে তাঁহার দুই অনুচর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওয়াহাবি কেন্দ্র গঠন করেন। সৈয়দ আহমদ মুসলিম যুবকগণকে ওয়াহাবি সেনাদলে যোগ দেওয়ার ডাক দেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের ওয়াহাবি তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য বলেন। ওয়াহাবি সেনাদলকে ইওরোপীয় কায়দায় লড়াই করিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। হিজরত আদর্শ অনুযায়ী ওয়াহাবিগণ বিধর্মী ইংরাজ শাসিত ভারত ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটি হইতে যুদ্ধ করিয়া তাহারা ভারতকে ইংরাজের হাত হইতে মুক্ত করার সংকল্প নেয়। এই স্থানের পাঠান উপজাতিগণের সহায়তা লইয়া সৈয়দ আহমদ তাঁহার শক্তি দৃঢ় করেন এবং পেশোয়ার জয় করেন।

ওয়াহাবি সংগঠন

সৈয়দ আহমদ ও ওয়াহাবিগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামরিক শক্তি গঠন করিলে প্রতিবেশী পাঞ্জাবের শিখ সাম্রাজ্যের সহিত তাহাদের সংঘাত বাধে। ১৮৩১ খ্রীঃ বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ নিহত হন এবং ওয়াহাবিগণ পরাস্ত হয়।

শিখ যুদ্ধ

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগামী ওয়াহাবীগণ বিলায়েৎ ও এনায়েৎ আলি ভ্রাতাদ্বয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। ইহাদের সহিত মৌলভী নাসিরউদ্দিনও যোগ দেন। এদিকে ১৮৪৭ খ্রীঃ পাঞ্জাবে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে পাঞ্জাব হইতে ইংরাজ সেনার সুপরিকল্পিত আক্রমণে উত্তর-পশ্চিমের পাঠান অঞ্চলে ওয়াহাবি শক্তি ধ্বংস হয়। ইংরাজ সেনাপতি গারভক (General Garvock) লাল্লুর (Laloo) যুদ্ধে ওয়াহাবিগণের সামরিক শক্তি চূর্ণ করেন। এদিকে ইংরাজ পুলিশ ও গোয়েন্দাগণ ভারতের ভিতরে ওয়াহাবি সমর্থকগণকে ধরিয়া জেল অথবা প্রাণদণ্ড দেয়। ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন বিফল হয়।

ওয়াহাবি-ইংরাজ সংঘর্ষ
লাল্লুর যুদ্ধ

ওয়াহাবি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় কিনা ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মতভেদ দেখা যায়। ওয়াহাবি নেতা ডাঃ কুয়েমুদ্দিন আহমদের মতে ওয়াহাবি আন্দোলনকে ইংরাজ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বলা যায়। এই আন্দোলন কেবলমাত্র মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সৈয়দ আহমদের অনুরাগী ও সমর্থকগণের মধ্যে কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন ইহা মনে করার কোন কারণ নাই। ডাঃ কুয়েমুদ্দিন আহমদের মতে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার শ্যালক হিন্দুরাও ছিলেন সৈয়দ আহমদের সমর্থক। বোম্বাইয়ে ওয়াহাবিগণের সভায় হাজার হাজার হিন্দু

১. Quemmuddin Ahmad—The Wahabi Movement.

যোগ দেয়। ভারতের অভ্যন্তর হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওয়াহাবি কেন্দ্রে অর্থ সরবরাহ হিন্দু বণিক ও মহাজনগণই করে। সৈয়দ আহমদের চিঠিপত্রে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ ঐতিহাসিক হান্টার তাঁহার রচনায় ওয়াহাবি আন্দোলনকে হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনেক গবেষক এই মত অগ্রাহ্য করেন। তাঁহাদের মতে ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ। ইহা অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী হইতে পারে না। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও স্বীকার করেন যে, বহু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ওয়াহাবিগণের সমর্থক ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ভারত হইতে ইংরাজ বিতাড়ন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সন্নিহিত পাঞ্জাবের শিখগণ ওয়াহাবিগণের বিরোধিতা করায় ঘটনাচক্রে ওয়াহাবিগণ শিখ সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু ওয়াহাবিগণের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরাজের ধ্বংস সাধন। ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার অভিমত দিয়াছেন যে, যদিও ওয়াহাবিগণ ভারতব্যাপী সংগঠন করে এবং যদিও সাধারণ লোকে ইহাতে প্রেরণা পায় তবুও ইহাকে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না। তাঁহার মতে এই আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থলে কেবলমাত্র ইসলামীয় শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্য লইয়াই পরিচালিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সমান অধিকারের লক্ষ্য লইয়া এই আন্দোলন গড়িয়া উঠে নাই। ওয়াহাবি আন্দোলন গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত ছিল না। ডাঃ কুয়েমুদ্দিন আহমদ এই মতের বিরোধিতা করেন। তিনি সৈয়দ আহমদের একটি চিঠি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সৈয়দ আহমদের ইচ্ছা ছিল যে ইংরাজ ভারত ছাড়িলে হিন্দু ও মুসলিম বিভিন্ন রাজাগণের রাজ্য শর্ত সাপেক্ষে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। কুয়েমুদ্দিন আহমদের মতে ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতে একচ্ছত্র মুসলিম আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্য লইয়াছিল ইহা মনে করিবার কারণ নাই। ওয়াহাবি আন্দোলনের লক্ষ্য বা প্রকৃতি যাহা হউক না কেন, এই আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ে স্বাতন্ত্রতা বা বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। তবুও একথা সত্য যে, ওয়াহাবি আন্দোলন ইংরাজ শাসনের ভিতে ফাটল ধরাইয়া দেয়। ওয়াহাবি আন্দোলনের বিফলতার কারণ হিসাবে বলা যায় যে হিন্দু ও শিখগণ ইহার বিরোধী ছিল। ইংরাজ সরকারের উন্নত রণকৌশল ওয়াহাবি শক্তিকে চূর্ণ করিয়া দেয়।

ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতির মূল্যায়ন

ফরাজি আন্দোলন (Faraji Movement)ঃ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় ফরাজি আন্দোলন নামে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। ১৮১৮ খ্রীঃ হইতে ১৯০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত ফরাজি আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন প্রধানতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও হিন্দু কৃষকগণও ইহার সমর্থক ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। ফরিদপুরের মৌলভী হাজী শরিয়ৎ উল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার চারিত্রিক ও নৈতিক গুণের জন্য শ্রদ্ধা পাইতেন। হাজী শরিয়ৎ উল্লাহ ইসলামকে পবিত্র কোরাণের আদর্শ অনুযায়ী শুদ্ধ

শরিয়ৎ উল্লাহ ও জমিদার শ্রেণীর শোষণের প্রতিবাদ

করার কথা বলেন। তিনি 'ফরাজি' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'ফরাজি' শব্দটির অর্থ হইল 'ইসলামের পবিত্র আদর্শে বিশ্বাস'। হাজী শরিয়ৎ উল্লাহ এই সঙ্গে এক অর্থনৈতিক মত প্রচার করেন। তিনি বলেন যে ইংরাজের সমর্থন-পুষ্ট হইয়া জমিদার শ্রেণী দরিদ্র রায়তের রক্ত শোষণ করিতেছে। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ চাষী ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। সুতরাং কৃষকেরা শরিয়ৎ উল্লাহর কথায় বিশেষ প্রভাবিত হয়। বেকার তাঁতি ও কারিগরগণও তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া নেয়। শরিয়ৎ উল্লাহ বলেন যে, পবিত্র কোরাণের নির্দেশ মানিয়া চলিলে অবদমিত মুসলিম সম্প্রদায় পুনরায় নবজীবন লাভ করিবে। শরিয়ৎ উল্লাহ পরবর্তী সময়ে ওয়াহাবি আদর্শে প্রভাবিত হন।

দুদুমিঞা ও কৃষক আন্দোলন

শরিয়ৎ উল্লাহর পুত্র দুধুমিঞা (১৮১৯—৬০ খ্রীঃ) তাঁহার পিতার আদর্শকে আরও উগ্র রাজনৈতিক মতে পরিণত করেন। তিনি দরিদ্র কৃষকগণকে জমিদার ও নীলকরগণের শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। তিনি ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব বাংলাকে কয়েকটি হল্কা বা অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রতি হল্কায় একজন খলিফা নিয়োগ করা হয়। খলিফাগণ মুসলিম চাষীগণের মধ্যে দুধুমিঞার আদর্শ প্রচার করিয়া তাহাদের জাগাইবার দায়িত্ব পায়। তাহারা ফরাজি তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। দুধুমিঞা এই সময় প্রচার করেন যে, কেবলমাত্র জমিদারগণকেই শায়েস্তা করিলে চলিবে না। জমিদারদের খুঁটি হইল ইংরাজ সরকার। ইংরাজকে না হঠাইলে মুসলমানের মুক্তি আসিবে না। দুধুমিঞার নেতৃত্বে বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলিম চাষী সংঘবদ্ধ হয়। দুধুমিঞা ঘোষণা করেন যে, জমি হইল আল্লাহর সম্পত্তি। জমিদারগণ ইহার উপর বে-আইনী কর বসাইলে তাহাদের দণ্ডিত করা হইবে। দুধুমিঞা অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরগণকে বাধা দেন। জমিদার ও নীলকরগণের চাপে কোম্পানী দুধুমিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুর জেলে (১৮৫৭ খ্রীঃ) বন্দী করেন। মুক্তিলাভ করিবার পর তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুরে দুধুমিঞার ১৮৬০ খ্রীঃ মৃত্যু হয়। দুধুমিঞার আন্দোলন প্রধানতঃ ফরিদপুর ও পূর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। দুধুমিঞার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নোয়ামিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন কিছুকাল চলে। নোয়ামিঞা ইংরাজ বিরোধী নীতি ও জমিদার বিরোধী নীতি ত্যাগ করিয়া ধর্ম-সংস্কারের দিকে নজর দেন। ইহার ফলে ফরাজি আন্দোলনের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়।

তিতুমীর ও কৃষক আন্দোলন

তিতুমীর (১৭৮২—১৮৩১ খ্রীঃ)ঃ তিতুমীর বা তিতুমিঞা নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ফরাজি আন্দোলন গঠন করিয়া ইতিহাসে স্থায়ী নাম পাইয়াছেন। তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নাসির আলি। সর্বসাধারণে তিনি তিতুমীর নামেই পরিচিত। তিতুমীর ওয়াহাবিগণের ন্যায় ইসলাম ধর্মকে শুদ্ধ করার কথা বলিতেন। এছাড়া তিনি ফরাজিগণের ন্যায় দরিদ্র মুসলিম চাষীকে জমিদারদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার ব্রত নেন। তিতুমীরের আন্দোলনে ওয়াহাবি ও ফরাজি উভয় ধারার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি

বাংলার যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা জেলাগুলির দরিদ্র চাষী ও বেকার তাঁতিগণকে লইয়া তাঁহার আন্দোলন গঠন করেন।

অত্যাচারী জমিদার, নীলকরগণের বিরুদ্ধে দরিদ্র চাষীর পক্ষ লইয়া তিতুমীর দাঁড়ান। অত্যাচারী জমিদারদের তিনি বল প্রয়োগে শায়েস্তা করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি সমানভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর জমিদারদের শাস্তি দিতেন। মুসলিম বলিয়া অত্যাচারী জমিদারদের তিনি খাতির করিতেন না। কৃষ্ণ রায় নামে এক জমিদার "ঈশ্বর সেস" নামে অতিরিক্ত কর মুসলিম চাষীগণের উপর ধার্য করিলে তিতুমিঞার অনুচরগণ কৃষ্ণ রায়ের পাইক সেনার সহিত দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। বারাসত, এমন কি কলিকাতার উপকণ্ঠ অঞ্চলেও ফরাজিগণ হিন্দু, মুসলিম জমিদারগণের উপর হামলা চালায়। তিতুমীরের অনুচরেরা কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুগণের উপর অত্যাচারও করে। তবে প্রধানতঃ তাহাদের আক্রমণ জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। শেষ পর্যন্ত তিতুমীর ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। কারণ ইংরাজ সরকার তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া মনে করিত। ডাঃ প্রাণ চোপরার মতে ফরাজিগণ ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। তিতুমীর ২৪ পরগণার নারিকেলবেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা বানাইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। নারিকেলবেড়িয়ার যুদ্ধে ইংরাজ সেনার হাতে তিতুমীর প্রাণ দেন। বহু ফরাজি নিহত এবং বন্দী হয়।

ফরাজি বিদ্রোহ তিতুমীরের নেতৃত্ব

ঐতিহাসিক হাণ্টারের মতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ও দুধুমিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন ছিল একটি শ্রেণী সংগ্রাম। দরিদ্র, অবহেলিত কৃষকেরা ফরাজি আন্দোলনের মাধ্যমে শোষক জমিদার শ্রেণী ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষক কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তিনি ইহাকে "লাল প্রজাতন্ত্রী" (Red Republican) বা সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রী আন্দোলন বলিয়াছেন। ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীর মতে ইহা জমিদার শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে আরম্ভ হইলেও শেষের দিকে ইহা সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়।

ফরাজি বিদ্রোহের প্রকৃতি

ফরাজিগণ কৃষকের স্বার্থের কথা বলিলেও ইহার গোঁড়ামি হইতে মুক্ত ছিল না বলিয়া মনে করা যায়। এছাড়া ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ (১৭৭৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি ঘটে। ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, মজনু শাহ প্রভৃতি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে এই বিদ্রোহের কাল্পনিক বর্ণনা দেখা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহ : ইংরাজ শাসনের প্রতিক্রিয়া

(The Revolt of 1857 : Reactions to British Policy)

১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহের কারণ (Background of the Revolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীঃ লর্ড ক্যানিং যখন বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময় ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ সিপাহীগণের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেন। আবার অনেকে ইহাকে ইংরাজের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান বলিয়া মনে করেন। এই বিদ্রোহের কারণ কেবলমাত্র সিপাহীগণের অসন্তোষের মধ্যে না খুঁজিয়া সমকালীন ইতিহাসের মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

ভারতীয় জনসাধারণ কোনদিনই ভারতে ইংরাজ শাসন বিনা বাধায় মাথা নীচু করিয়া মানিয়া নেয় নাই। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মহীশূর, মারাঠা ও শিখগণ যেমন রাজশক্তি হিসাবে যুদ্ধ করিয়াছে, তেমনই ভারতের জনসাধারণও মাঝে মাঝে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকের মনে ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ ও শোষণের জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সুপ্ত অসন্তোষ ছিল। ১৭৫৭-১৮৫৮ খ্রীঃ মধ্যে এই কারণে ভীল, সাঁওতাল, খাসী, জাঠ ও ফরাজিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৮৫৭ খ্রীঃ আগে ভারতীয় সিপাহীগণও মাঝে মাঝে কোম্পানীর জবরদস্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীঃ ভেলোরে ভারতীয় সিপাহীগণ এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ করে। ভেলোরের হিন্দু সিপাহীগণকে বিশেষ ধরনে পাগড়ি বাঁধার, কপালে তিলক না আঁকিবার আদেশ দিলে তাহারা মনে করে যে, তাহাদের জাতি নাশের চক্রান্ত করা হইয়াছে। ফলে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কোম্পানী অমানুষিক নিষ্ঠুরতার দ্বারা ভেলোর সিপাহীগণের বিদ্রোহ দমন করে। ইহার পর ১৮২৭ খ্রীঃ সিপাহীগণ কালাপাণি বা সমুদ্র পার হইয়া ব্রহ্মদেশে যাইতে রাজী না হইয়া বারাকপুর ছাউনিতে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহীগণকে কামানের মুখে বাঁধিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের আগের ১৩ বৎসরের মধ্যে আরও ৪টি সেনা বিদ্রোহ ঘটে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, সামরিক ও অসামরিক সকল স্তরেই কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে একটি চাপা অসন্তোষ তুষের আগুনের মত জ্বলিতেছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ অভ্যুত্থান তাহারই পরিণতি মাত্র। কোম্পানীর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া স্যার চার্লস মেটকাফ মন্তব্য করেন যে, "ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা করুণ। এদেশে আমাদের শিকড় নাই। ঝড় আসিলে আমাদের উড়াইয়া দিবে।" কোম্পানীর বৈষম্যমূলক শাসন নীতির ফলে শাসিত ভারতবাসী ও শাসক ইংরাজগণের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া যায়।

ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে জনসাধারণ ও সিপাহীগণের অসন্তোষ

কোম্পানীর রাজ্য গ্রাস নীতির ফলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হন লর্ড ওয়েলেসলির আমল হইতে কোম্পানী নির্বিচারে রাজ্যগ্রাসের যে নীতি গ্রহণ করে লর্ড ডালহৌসীর আমলে তাহা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। ডালহৌসী প্রভৃতি ইংরাজ রাজ পুরুষেরা ভারতীয় প্রথা, ধর্ম ও সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সামরিক ক্ষমতাহীন ভারতীয় রাজাগণকে বিষহীন ঢোঁড়া সাপ মনে করিয়া তাঁহারা ইঁহাদের পায়ে মাড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা করেন। লর্ড ডালহৌসী স্বত্ত্ববিলোপ নীতি চালু করিয়া হিন্দু রাজাগণের দত্তক পুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। স্বত্ত্ববিলোপ আইন চালু করিয়া উত্তরাধিকারী হীন রাজ্যগুলিকে তিনি একে একে গ্রাস করিতে আরম্ভ করেন। স্বত্ত্ববিলোপ আইন অনুযায়ী সাতারা, জৈৎপুর, ভগৎ, ঝাঁসী প্রভৃতি রাজ্য কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ডালহৌসীর স্বত্ত্ববিলোপ নীতি দেশীয় রাজ্যগুলিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দেশীয় রাজাগণ আশঙ্কা করেন যে, স্বত্ত্ববিলোপের ছল করিয়া কোম্পানী ক্রমে তাঁহাদের সকলের রাজ্য কাড়িয়া লইবে। এদিকে রাজ্যহারা রাজাগণ ডালহৌসীর জবরদস্তির প্রতিবাদে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। রাজ্যহারা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেব ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা নেন। এ ছাড়া মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও ভারতের জনগণ তাঁহাকে মান্য করিত। মুঘল রাজবংশের শেষ প্রদীপ হিসাবে তাঁহাকে সম্মানার্হ মনে করিত। সাম্রাজ্যবাদী গর্বিত ইংরাজ সরকার মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের সম্রাট খেতাব লোপ করিয়া কোম্পানীকে ভারতে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে জাহির করার চেষ্টা করিলে মুসলিম সমাজ ও সাধারণ লোকের মনে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাছাড়া সম্রাট বাহাদুর শাহকে তাঁহার পিতৃ পুরুষের প্রসাদ হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য করায় লোকে কোম্পানীর উপর ক্ষেপিয়া যায়। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে তাহার বিস্ফোরণ দেখা দেয়।

কোম্পানীর রাজ্যগ্রাস নীতি : লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ত্ববিলোপ নীতির কুফল

বড়লাট লর্ড ডালহৌসী স্বত্ত্ববিলোপ আইন চালাইয়া দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিলে এই সকল রাজ্যহীন রাজ পরিবারের লোকজন, রাজদপ্তরের কর্মচারী, সেনাদল ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ জীবিক হীন হইয়া ঘোর দারিদ্রে পড়েন। এই সকল লোকেরা ছিলেন খুবই গর্বিত ও আত্মমর্যাদাশীল। কোম্পানী তাঁহাদের পথের ভিখারীতে পরিণত করার ফলে তাঁহারা কোম্পানীকে ক্ষমা করিতে রাজী ছিলেন না। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ দেখা দিলে ইঁহারা ইংরাজ শাসন উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহে যোগ দেন। লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অজুহাতে উত্তর প্রদেশ বা অযোধ্যার নবাবের গদী লোপ করিলে নবাবের আশ্রিত বহু কর্মচারী ও তাহাদের পরিজন দুর্দশায় পড়ে। অযোধ্যার নবাব সরকারের বেকার সেনাদল ও কর্মচারীগণ ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে বিশেষ ভূমিকা নেয়। অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানী গ্রাস করিলে ফৈজাবাদের বিখ্যাত মৌলভী আহমদ উল্লাহ কোম্পানীকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তিনি কোম্পানীর সিপাহীগণের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া দেন। কোম্পানীর নূতন রাজস্ব

অধিকৃত দেশীয় রাজ্যের বেকার কর্মচারী ও সেনাদলের প্রতিহিংসা গ্রহণ

নীতির চাপে অযোধ্যার তালুকদারগণও সর্বস্বান্ত হন। ইহারা এই বিদ্রোহে বিশেষভাবে নেতৃত্ব দেন। সরকারের বর্ধিত ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য করের চাপে অযোধ্যার সাধারণ প্রজার কষ্টের সীমা ছিল না। ইহারাও ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে যোগ দেয়।

এছাড়া ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অসন্তোষ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে কোম্পানী ভারত হইতে প্রচুর সোনা, রুপা ও মূল্যবান সম্পদ বিলাতে লইয়া যায়। ইহার ফলে দেশের সম্পদ কমিয়া যায়। ভারতে কোম্পানীর শাসন দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইলে ইংরাজের শোষণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। জমির রাজস্ব অত্যাধিক বাড়াইয়া দিলে দরিদ্র চাষীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের ভূমি সংস্কারের ফলে দরিদ্র রায়তশ্রেণী ধ্বংস হয়। এদিকে বিলাতী মালের চাপে কুটির শিল্প ধ্বংস হইবার ফলে শিল্পী ও কারিগরগণ বেকার ও অন্নহীন হইয়া পড়ে। লোকের অন্য কোন জীবিকা না থাকায় জমির উপর চাপ বাড়ে। গ্রামগুলি হতশ্রী ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। বিলাতী মালে ভারতের বাজার ছাইয়া গেলে এই মাল বিক্রয়ের মুনাফা ভারত হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। ইংলণ্ডের লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও ভারতীয়গণ দারিদ্রের পাঁকে ডুবিয়া থাকে। কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে উচ্চ সরকারী পদগুলিতে কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের নিয়ম চালু করায় ভারতীয়গণের উচ্চ চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। তাছাড়া ইংরাজী না শিখিলে সরকারী চাকুরী লাভ দুষ্কর হয়। ফার্সী ও সংস্কৃত জানা লোকেরা মর্যাদা হারাইয়া জীবিকাহীন হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সকল শ্রেণীর ভারতীয়গণের মধ্যে ইংরাজ শসান সম্পর্কে ঘৃণা দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক অসন্তোষ

সামাজিক দিক হইতে দেখা যায় যে, শাসক ইংরাজ রাজপুরুষগণ কালো চামড়ার ভারতীয় প্রজাগণের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপন না করিয়া তাহাদের ঘৃণা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকে। উদ্ধত ও গর্বিত ইংরাজ রাজপুরুষেরা 'নেটিভ' ও কালো চামড়ার ভারতীয়গণকে বর্বর বা অর্ধ সভ্য মনে করিত। তাহাদের এই গর্বিত আচরণের ফলে ভারতীয়গণ ইংরাজকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে শাসক ও শাসিতের ব্যবধান বাড়ে। আগ্রার একজন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট এমনই গর্বিত ছিলেন যে, তিনি ভারতীয়গণকে কোন ইংরাজ তাহাদের সামনে পড়িলে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিতে আদেশ দেন। ভারতবাসীগণের প্রতি এই তাচ্ছিল্য-পূর্ণ মনোভাবের দরুণ ভারতীয়গণের নিকট ইংরাজ শাসন অসহনীয় হইয়া উঠে। অধিকাংশ ভারতবাসীর মনে ইংরাজ শাসনের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবিশ্বাস দেখা দেয়। অনেকে মনে করে যে, ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান বানাইবার চেষ্টায় আছে। সতীদাহ নিবারণ, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি আইন চালু হইলে লোকে মনে করে যে, ভারতবাসীর ধর্ম ও সমাজকে ধ্বংসের জন্য এই সকল আইন রচনা করা হইয়াছে। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের নিন্দা করায় এবং ভারতীয়গণকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করায় ভারতবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত পড়ে। জনসাধারণ মনে করে যে, ইংরাজ

সামাজিক কারণ : ভারতবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার

সরকারের সহযোগিতায় মিশনারীগণ ভারতীয়গণের ধর্ম ও জাতি নাশ করিবার চেষ্টা চালাইতেছে। ইওরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে বিদ্রোহীগণ সহজে জয়লাভের প্রত্যাশা করে। এছাড়া এই সময়ে এক গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে ভারতে ইংরাজ শাসনের একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পতন আসন্ন।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভারতীয়দের মনে ইংরাজ শাসন সম্পর্কে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সিপাহীগণের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া তাহা জ্বলিয়া উঠে। কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহীগণের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া অসন্তোষ দানা বাঁধিতেছিল। ইংরাজ সেনা অপেক্ষা ভারতীয় সিপাহীগণকে কম বেতন ও খারাপ খাবার দেওয়া হইত। সিপাহীগণকে প্রতি মাসে মাত্র ৯ টাকা বেতন দেওয়া হইত। অথচ ইংরাজ সিপাহীগণকে ইহার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী মাহিনা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইত। ইংরাজ অফিসারেরা সিপাহীগণকে অপমানজনক গালি-গালাজ দিত। সিপাহী সেনাদের চাকুরীতে পদোন্নতির কোন আশা ছিল না। কারণ সামরিক বিভাগের সকল উচ্চ পদগুলিই শ্বেতাঙ্গগণের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। সিপাহীদের যোগ্যতার কোন দাম দেওয়া হইত না। মাঝে মাঝে ইংরাজ অফিসারগণ সিপাহীগণকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী কাজ করিতে আদেশ দিত। দূরদেশে সমুদ্র পার হইয়া ইংরাজের সাম্রাজ্য জয়ের জন্য তাহাদের যুদ্ধ করিতে পাঠান হইত। এই যুগে হিন্দু সমাজে সমুদ্র পার হওয়া নিষিদ্ধ কাজ ছিল। সুতরাং হিন্দু সিপাহীরা সমুদ্র পারে যুদ্ধ করিয়া ছুটিতে ঘরে ফিরিলে সমাজে তাহাদের জাতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বলা হইত। এইভাবে সিপাহীগণের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে।[১] অবশেষে নূতন এনফিল্ড বন্দুকের টোটা উপলক্ষ করিয়া তাহা বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই নূতন প্রচলিত এনফিল্ড রাইফেলের গুলি বন্দুকে ভরিবার সময় সিপাহীগণকে ইহার খোলসটি দাঁতে কাটিয়া তবে বন্দুকে ভরিতে হইত। গুলির খোলসগুলিকে নরম রাখিবার জন্য গরু ও শূকরের চর্বিতে ভিজাইয়া রাখা হইত।

সামরিক অসন্তোষ : এনফিল্ড বন্দুকের কার্তুজ

সিপাহীগণের মধ্যে গরু ও শূকরের চর্বির কথা জানাজানি হইলে জাতিনাশের ভয়ে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ ক্ষেপিয়া যায়। সিপাহীরা এই গুলি ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ করে। এই সময় কোম্পানীর সেনাদলে শ্বেতাঙ্গ সেনার সংখ্যা ছিল মোট সেনার শতকরা ১৯ ভাগ। অবশিষ্ট সেনা ছিল ভারতীয় সিপাহী। ইহার ফলে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সেনার পক্ষে বিদ্রোহী সিপাহীগণকে দাবাইয়া রাখা কষ্টকর হয়। তাছাড়া এই সময় অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ সেনাদের পাঞ্জাবে জড় করা হইয়াছিল। ইহার ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কেবলমাত্র ভারতীয় সিপাহী সেনা ছিল। ফলে সিপাহীদের পক্ষে ইংরাজ সেনার চোখ এড়াইয়া বিদ্রোহ করা সহজ হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ ২৯শে মার্চ কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক ব্রাহ্মণ সিপাহী প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরে আম্বালা ও মীরাটের ছাউনীতে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। পরে এই বিদ্রোহ দাবানলের ন্যায় সর্বত্র জলিয়া উঠে। এইভাবে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

১. British Paramountcy and Indian Renaissance—R. C. Majumdar.

বিদ্রোহের বিস্তৃতি (Spread of the Rising) ঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহ ২৯শে মার্চ কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে সিপাহীর বিদ্রোহ ও আত্মদানের দ্বারা সূচিত হয়। ব্যারাকপুরের পর আম্বালার ছাউনীতে সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেয়। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতিরা আম্বালার সিপাহীগণকে দ্রুত অস্ত্রহীন করিয়া ফেলেন। ইহার পর ২৪শে এপ্রিল মীরাটের সিপাহীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করে। মীরাটে কুচকাওয়াজের সময় ৮৫ জন ভারতীয় সিপাহী এনফিল্ড বন্দুকের টোটা ব্যবহার করিতে অসম্মত হইলে তাহাদের বন্দী করা হয়। ১০ই মে মীরাটের অন্যান্য সিপাহীরা বন্দী সহকর্মীদের মুক্ত করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বহু ইংরাজ অফিসার বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে প্রাণ দেয়। সিপাহীগণ "দিল্লী চলো" ধ্বনি তুলিয়া মীরাট হইতে দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হয়। মীরাটের পর দিল্লী, কানপুর, আলিগড়, লক্ষ্মৌ, ঝাঁসী, বিহার ও মহারাষ্ট্রেও বিদ্রোহ

সামরিক বিদ্রোহ



রাণী লক্ষ্মীবাঈ



বাহাদুর শাহ

বিস্তৃত হয়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে পশ্চিম বিহার হইতে পূর্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত সকল স্থানে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় কোন কোন স্থানে অসামরিক লোকেরা বিদ্রোহে অংশ নেয়।

অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও বিহারের কোন কোন স্থানে এই বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের আকৃতি ধরে। অযোধ্যার পদচ্যুত নবাবের সেনা, কর্মচারী, তালুকদার ও কৃষকেরা হাতিয়ার লইয়া সিপাহীদের সামিল হয়। ইতিমধ্যে স্বত্ব-বিলোপ আইনের ফলে রাজ্যচ্যুত রাজা ও জমিদারগণও এই বিদ্রোহে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের জগদীশপুরের কুনওয়ার সিং, কানপুরের নানাসাহেব, রোহিলখণ্ডের খান বাহদুর খান প্রভৃতি এই বিদ্রোহে যোগ দেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী অধিকার করিয়া বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা

গণবিদ্রোহ

হইতে জানা যায় যে, বাহাদুর শাহ হিন্দু শাস্ত্র ও ইসলামের শরিয়ৎ উল্লেখ করিয়া ভারতবাসীকে ইংরাজের সহিত মোকাবিলার জন্য ডাক দেন। এদিকে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, কানপুরে নানাসাহেব ও তাঁহার সহকারী তাঁতিয়া তোপী যুদ্ধে ইংরাজ সেনাদের নাজেহাল করেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ এই যুদ্ধে অপরিসীম সাংগঠনিক যোগ্যতা


নানা সাহেব


তাঁতিয়া তোপী

ও সাহস দেখান। ফৈজাবাদে মৌলভী আহমদ উল্লাহ এই বিদ্রোহে বিশেষ দক্ষতা দেখান।

বিদ্রোহীগণ প্রথমদিকে জয়লাভ করিলেও ক্রমে তাহারা সংগঠন ও একতার অভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহী সেনার মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় তাহাদের পক্ষে লক্ষ্য স্থির করিয়া সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা শক্ত হয়। এই সুযোগে লরেন্স, আউট্রাম, নীল, হিউরোজ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ সুপরিকল্পিতভাবে পাল্টা আক্রমণ চালান। মালয়, সিঙ্গাপুর হইতে বিদ্রোহ দমনের জন্য নূতন ইংরাজ সেনা আনা হয়। শিখ ও গুর্খা সেনাগণ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সহিত হাত মেলায়। বর্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি কিছু জমিদার ও বাঙালী রাজভক্ত কর্মচারীগণ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সহায়তা করেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত্রু সেনার হাতে প্রাণ দেন। সেনাপতি স্যার হিউ রোজ রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে "best and bravest" আখ্যা দেন। তাঁতিয়া তোপী ইংরাজের হাতে বন্দী হইয়া ফাঁসীতে প্রাণ দেন। নানাসাহেব নেপালে পলাইয়া নির্বাসনে মারা যান বলিয়া জানা যায়। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ইংরাজের হাতে বন্দী হইয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। এই স্থানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এইভাবে এক বৎসর চলিবার পর ১৮৫৮ খ্রীঃ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

ইংরাজ সেনার পাল্টা আক্রমণ

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের প্রকৃতি (Character of the Rising of 1857)ঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহের প্রকৃতি লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ

দেখা যায়। স্যার জন লরেন্স প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ ইহাকে "Mutiny" বা কেবলমাত্র সিপাহীগণের বিদ্রোহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র ঘটে নাই। সকল শ্রেণীর লোক এই বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। তাছাড়া বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন স্বীকৃত রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। কোন বৈদেশিক শক্তি এই যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। এই কারণে অনেক লেখক ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সামরিক অভ্যুত্থান বা সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া মনে করেন।

সামরিক বিদ্রোহ

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ বলা যায় না। তথ্য ও প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, সিপাহীগণ এই বিদ্রোহ প্রথমে আরম্ভ করিলেও শেষ পর্যন্ত অযোধ্যা ও বিহারের জনসাধারণ এই বিদ্রোহের সামিল হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের এক বৃহৎ অঞ্চল যথা পশ্চিমে বিহার হইতে পূর্বে পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ বর্গমাইল স্থান লইয়া এই বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। এই বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া বিদ্রোহের পশ্চাতে ব্যাপক জনসমর্থন ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এই অঞ্চলে কোম্পানীর শাসন লোপ পায়। রেভারেণ্ড লাল বিহারী দের পুস্তক হইতে জানা যায় যে সাময়িক ভাবে এই অঞ্চলে স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বাংলা ও মাদ্রাজে এই বিদ্রোহ দেখা না দিলেও এই অঞ্চলের জনগণ বিদ্রোহের সমর্থন করিতেন না ইহা মনে করা যায় না। সমকালীন চিন্তাবিদ ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ বলিয়াছেন যে "বাংলাদেশে বহু লোক ইংরাজ শাসনের অনুকূলে থাকিলেও অনেকে ইহার প্রতি অনুরক্ত ছিল না।" চতুর্থতঃ, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তালুকদারগণ এই বিদ্রোহে অংশ লইবার ফলে ইহাকে কেবলমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ বলা যায় না। পঞ্চমতঃ, কেবলমাত্র সিপাহীগণের অসন্তোষের জন্য এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল ইহা ঠিক নহে। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে গভীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ কাজ করে। সিপাহীগণ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করার ফলে তাহাদের মধ্যে বিদেশী শাসনমুক্ত স্বাধীন সরকার স্থাপনের আগ্রহ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

বৈদেশিক শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা

বীর সাভারকর প্রমুখ লেখকেরা ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে পুরাপুরি স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা সঙ্গত নয় বলিয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। স্বাধীনতার অর্থ যদি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা ধরা হয়, তবে ১৮৫৭ খ্রীঃ এইরূপ ব্যাপক চেতনা দেখা যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি নেতাগণের লক্ষ্য ছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অন্যায়ের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তৃতীয়তঃ, এই বিদ্রোহ সিপাহী-গণের অসন্তোষের ফলেই সিপাহী অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়। ইহাকে জাতীয় চেতনার স্ফুরণ বলা যায় না। চতুর্থতঃ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই বিদ্রোহ হইতে দূরে ছিল। পঞ্চমতঃ, শিখ ও গুর্খাগণ এই বিদ্রোহে অংশ নেয় নাই। পাঞ্জাব, বাংলা, দক্ষিণ

বীর সাভারকরের অভিমতের মূল্যায়ন

ভারত এই বিদ্রোহের বাহিরে ছিল। ষষ্ঠতঃ, গদীহারা রাজাগণ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ায় ইহাতে সামন্ততান্ত্রিক রূপ দেখা যায়। যদি সিপাহীগণের বিদ্রোহ সফল হইত তবে বাহাদুর শাহের অধীনে মুঘল শাসন ফিরিয়া আসিত। কিন্তু মধ্যযুগীয় মুঘল শাসনের সহিত আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনীতির ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন যোগ ছিল না। ফলে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সহিত মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার বিরোধ দেখা দিত।

১৯৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের একশত বৎসর পূর্ণ হইলে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত করেন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ১৮৫৭ নামক পুস্তকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ সামরিক বা সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে আরম্ভ হইলেও ক্রমে ইহা গণ বিদ্রোহের আকার ধরে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে ইহা গণবিদ্রোহের রূপ নেয়। ইংরাজ শাসনের প্রতি ঘৃণা ইহাতে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে এই বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় তাহা বিস্ময়কর। বারাণসী, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের কৃষকেরাও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ইহা জাতীয় অভ্যুত্থান না হইলেও বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করায় ইহার মধ্যে জাতীয় চেতনার অস্পষ্ট ভ্রূণ মূর্তি দেখা যায়। সমকালীন হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র ইহাকে "বিরাট বিপ্লব" (Great Revolution) আখ্যা দেন। কবি রঙ্গলাল ১৮৫৮ খ্রীঃ তাঁহার পদ্মিনী নাটকে রাজপুত কবির মুখে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" গান দিয়া ভারতবাসীর হৃদয় বেদনা প্রকাশ করেন। সর্বশেষে বলা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য সিপাহীগণের সশস্ত্র সংগ্রাম বিফল হইলেও স্বাধীনতা লাভের আদর্শ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই। ইহার পর ভারতবাসীর স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামের দায়িত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজ স্কন্ধে তুলিয়া নেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই অধিকার লাভের জন্য বল প্রয়োগের পথ ছাড়িয়া নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বাছিয়া নেয়।

সামরিক ও গণবিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Rising of 1857)ঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ প্রথম দিকে দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেও ক্রমে ইহার তেজ মন্দীভূত হয় এবং শেষে ইহা নিবিয়া যায়। সিপাহীদের আত্মদান, রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের আত্মোৎসর্গ বিফলতায় পর্যবসিত হয়। এই বিদ্রোহের বিফলতার জন্য বিশেষ কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এই বিদ্রোহকে সফল করিবার জন্য কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা সংগঠন ছিল না। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব প্রভৃতি স্থানীয় পরিকল্পনা লইয়া নিজ নিজ এলাকায় যুদ্ধ করেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার আগেই কার্তুজের ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ইহা হঠাৎ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীগণের মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় একটি কেন্দ্রীয় রণনীতি ও মূল লক্ষ্য লইয়া কাজ করা সম্ভব

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের বিফলতার কারণঃ সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের অভাব

হয় নাই। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চলিতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কলিকাতা হইতে দিল্লীর দিকে ইংরাজ সেনা আগাইলে বিহারের সিপাহীগণ সেই সেনার গতিরোধ না করিয়া দিল্লীর দিকে ছুটিয়া চলে। ফলে ইংরাজ বাহিনী সহজে দিল্লীতে উপনীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের সকল স্থানে বিদ্রোহ না ঘটায় শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হইতে ইংরাজ সেনা সরাইয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা বিদ্রোহ দমন করা সহজ হয়। তৃতীয়তঃ, বিদ্রোহীদের মধ্যে লক্ষ্যের স্থিরতা না থাকায় নেতাগণ পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে নানাসাহেবের উদ্দেশ্য ছিল পেশবা পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, বাহাদুর শাহের উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ-স্থাপন। এই দুই উদ্দেশ্য ছিল পরস্পর-বিরোধী। চতুর্থতঃ, শিখ ও গুর্খা সেনা ইংরাজ শক্তিকে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করে। ইহার ফলে ইংরাজ শক্তির বিশেষ সুবিধা হয়। পঞ্চমতঃ, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য যথা কাশ্মীর, রামপুর প্রভৃতি ইংরাজ সরকারের পক্ষে থাকায় এবং সিন্ধিয়া ও রাজপুত রাজাগণ এই বিদ্রোহে নিরপেক্ষ থাকায় ইংরাজের বিশেষ সুবিধা হয়। যদি সিন্ধিয়ার সেনাদল ও রাজপুতেরা এই বিদ্রোহে যোগ দিত তবে ইংরাজ সেনার পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সিন্ধিয়ার স্বার্থপরতা ইংরাজের ক্ষমতা দখলে সহায়ক হয়। ষষ্ঠতঃ, বিদ্রোহীগণকে সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্ব দান করিবার মত কোন নেতা দেখা যায় না। ব্রিটিশ কূটনীতির চাতুর্যের সহিত পাল্লা দিয়া কূটনীতি পরিচালনা ও বৈদেশিক শক্তির সাহায্য লাভের চেষ্টা বিদ্রোহী নেতাগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। সপ্তমতঃ, ব্রিটিশের সামরিক সংগঠন, অস্ত্রশক্তি, হ্যাভলক, নীল, আউট্রাম, হিউ রোজ প্রভৃতি সেনাপতিগণের দক্ষতা ও প্রবল নৌ-শক্তি তাহাদের জয়ের পথ তৈয়ারী করে।

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের ফলাফল (Results of the Revolt of 1857 ঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ ভারত ইতিহাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। স্যার লেপেল গ্রীফিনের মতে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ "ভারতীয় আকাশ হইতে অনেক মেঘকে দূরে সরাইয়া দেয়।"[১] প্রথমতঃ, এই বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডের শাসক মহলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, ভারতের ন্যায় বৃহৎ দেশকে একটি বণিক কোম্পানীর শাসনাধীনে রাখা যুক্তি-যুক্ত নহে। ফলে ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর শাসনের স্থলে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেণ্ট গ্রহণ করে। ভারতের গভর্ণর জেনারেল অতঃপর ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নামে পরিচিত হন। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতের মন্ত্রীসভায় ভারত বিষয়ক মন্ত্রী বা ভারত সচিব নিযুক্ত হন। তৃতীয়তঃ, মহারাণীর ঘোষণার দ্বারা দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং ভারতবাসীর ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংস্কার করিয়া ভবিষ্যত বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাশ করা হয়। ভারতীয় সেনাদলে ইংরাজ সেনার সংখ্যা বাড়াইয়া দেশীয় সিপাহীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়।

কোম্পানীর শাসনের অবসান ঃ জাতীয়তা-বাদী ভাবের উদয় ঃ ইংরাজ শাসন সম্পর্কে অবিশ্বাস

১. "The Mutiny swept the Indian sky clear of many clouds".—Lepel Griffin.

সামরিক বাহিনীর উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করা হয়। পঞ্চমতঃ, ভারতীয়গণ যাহাতে ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীভাবে সংঘবদ্ধ না হয় এজন্য ইংরাজ সরকার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদনীতি প্রচার করেন। ষষ্ঠতঃ, সাধারণভাবে ভারতীয়গণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ফৌজদারী আইন সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কাজ করা হয়। কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়গণের মনে এই বিদ্রোহের পর ইংরাজ শাসন সম্পর্কে যে অবিশ্বাস দানা বাঁধে তাহা দূর করা সম্ভব হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন দ্বারা শাসন সংস্কার করিয়া ভারতীয়গণকে সন্তুষ্ট করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। সর্বশেষে, ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ ইংরাজ সরকার যেরূপ বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করেন তাহাতে ভারতবাসীর ইংরাজের ন্যায়-বিচার ও ইংরাজ শাসনের উদার চরিত্র সম্পর্কে উঁচু ধারণা নষ্ট হয়। ইংরাজ জাতির সহিত ভারতীয়গণের সৌহার্দ নষ্ট হয়। ক্রমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভারতীয়গণের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী জানায়। এইভাবে ১৮৫৭ খ্রীঃ পর জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগিয়া উঠে। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাই বিদ্রোহের স্মৃতি ভারতীয় বিপ্লবীগণকে প্রেরণা দান করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতে ইংরাজ শাসনের বিবর্তন

(Evolution of a frame-work of British rule at Home and in India)

১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন (The Government of India Act of 1858) ঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর ভারতের শাসনভার বণিক কোম্পানীর হাত হইতে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে লইবার জন্য জনমত প্রবল হইয়া উঠে। বিভিন্ন চার্টার আইনগুলি দ্বারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে কোম্পানীর সনদের মেয়াদ সীমিত করিয়া দিতেছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে ২০ বৎসরের জন্য কোম্পানীর সনদ দেওয়া হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে কোন সময় উল্লেখ না থাকায় পার্লামেণ্ট যে কোন সময় কোম্পানীর সনদ রদ করিবার ক্ষমতা রাখে। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের জন্য কোম্পানীর কুশাসনকে দায়ী করা হয়। বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল মনে করে যে আর ভারতের শাসন কোম্পানীর হাতে রাখা উচিত নয়। সুতরাং ১৮৫৮ খ্রীঃ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত শাসন আইন পাশ করিয়া ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটায়। কোম্পানীর স্থলে খোদ ব্রিটিশ সরকার শাসনভার নেয়।

কোম্পানীর উপর পার্লামেণ্টের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ

১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা বলা হয় যে—(১) অতঃপর ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাত হইতে ইংলণ্ড রাজের উপর বর্তাইবে। (২) ইংলণ্ডের রাজার তরফে সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া বা ভারত সচিব নামক জনৈক মন্ত্রী ও তাঁহার ১৫ জন উপদেষ্টা ভারত শাসনের কাজ চালাইবেন। (৩) কোম্পানীর আমলে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোল বা পরিচালক সমিতি ও নিয়ন্ত্রণ পরিষদ যে সকল ক্ষমতা ভোগ করিত এখন হইতে তাহা ভারত সচিব ভোগ করিবেন। (৪) ভারত সচিবের উপদেষ্টা পরিষদের ১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জন ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ও ৭ জন কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস দ্বারা নিযুক্ত হইবে। (৫) উপদেষ্টা পরিষদের সভ্যপদ খালি হইলে অতঃপর সরকার সকল নূতন সভ্য নিয়োগের অধিকার পাইবেন। (৬) সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যান্য জরুরী বিষয়ে ভারত সচিব উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ প্রয়োজন হইলে কারণ উল্লেখ করিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন। (৭) ভারত সচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার নির্দেশে চলিবেন ও তাঁহার কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৮) ভারত সচিব ও উপদেষ্টা পরিষদের ব্যয় ভারতের রাজস্ব হইতে বহন করা হইবে। (৯) ভারতের বড়লাট অতঃপর ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নামে পরিচিত হইবেন। তিনি ভারত সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। (১০) চুক্তিবন্ধ সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীগণ অতঃপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা ভারতে নিযুক্ত হইবে। ইহার আগে ইহারা কোম্পানীর দ্বারা নিযুক্ত হইত।

১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের সর্তাবলী

১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতের শাসনভার একটি "আনুষ্ঠানিক ব্যাপার" (formal affair) মাত্র। পার্লামেণ্ট বিভিন্ন আইন দ্বারা ১৮৫৮ খ্রীঃ আগেই কোম্পানীকে হাতের মুঠায় আনিয়াছিল। সুতরাং এই আইন পাশ হইবার আগেই কার্যতঃ পার্লামেণ্ট ক্ষমতার অংশ ভোগ করিত। ১৮৫৮ খ্রীঃ আইনে পার্লামেণ্টের অধিকার চূড়ান্ত ভাবে স্থাপিত হয়। আসলে কোম্পানীর হাত হইতে স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্ব লইবার ফল ভাল হয় নাই। শাসনভার গ্রহণ করিবার পর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসন ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে। কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টির স্থলে একটি আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব তাহাদের পাইয়া বসে। তৃতীয়তঃ, ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হইলেও তাহাতে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ভারত সচিবের উপদেষ্টা পরিষদে কোন ভারতীয় সভ্য লওয়া হয় নাই। ভারত সচিব প্রায় স্বৈর-শাসকের ন্যায় ভারতের উপর শাসন চালাইবার ঢালাও অধিকার পান। তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা ছিল না। সর্বশেষে ১৮৫৮ খ্রীঃ আইনে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কোন রদ-বদল করা হয় নাই। কেবলমাত্র বিলাতে পরিচালক সভার স্থলে ভারত সচিবের দপ্তর স্থাপন করা হয়। ভারতীয়গণকে শাসনকার্যে অংশ লইবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ভারত সচিবের দপ্তরের বিরাট ব্যয় ভারতীয় রাজস্ব হইতে নির্বাহ করার ব্যবস্থা হয়।

১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের সমালোচনা

মহারাণীর ঘোষণাপত্র (The Queen's Proclamation)ঃ ভারতীয় রাজন্য ও জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ১৮৫৮ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা দেন। ইহাতে বলা হয় যে, (১) ভারতের বড়লাটকে রাজ প্রতিনিধি বা ভাইসরয় (viceroy) হিসাবে গণ্য করা হইবে। (২) ভারতবাসীর ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকারে সরকার হস্তক্ষেপ করিবে না। (৩) সরকারি পদগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ব্রিটিশ প্রজার সমান অধিকার স্বীকৃত হইবে। (৪) সরকার আর কোনও দেশীয় রাজ্য অধিগ্রহণ করিবে না। (৫) কোম্পানীর সহিত দেশীয় রাজাগণের স্বাক্ষরিত সন্ধিগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইবে।

১৮৬১ খ্রীঃ ভারতীয় কাউন্সিল আইন (The Indian Council s Act of 1861)ঃ ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা শাসন ও আইন পরিষদ গঠনের ব্যাপারে ভারতীয়গণের মতামত প্রকাশের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষিত ভারতীয়গণ যোগ্যতার অধিকারী হইলেও আইন রচনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণের অধিকার লাভে বঞ্চিত হন। ইহার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্যার সৈয়দ আহমদের ন্যায় ইংরাজ ঘেঁষা লোকেরাও বলেন যে, শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়গণকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। এদিকে নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা ইংরাজ সরকারকে বিচলিত করে। স্যার বার্টল ফ্রা নামক ঝানু ইংরাজ রাজপুরুষ সরকারকে সতর্ক করিয়া দেন যে, ভারতের কোটি কোটি লোকের মতামত না লইয়া আইন রচনা বিপজ্জনক। দ্বিতীয়তঃ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারগুলির স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী আইন রচনার অধিকার না থাকায় শাসনকার্যে অসুবিধা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে লইবার জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন রচিত হয়।

ভারতীয় কাউন্সিল আইনের পটভূমি

বড়লাটের কাউন্সিল বা পরিষদ দুইভাগে বিভক্ত ছিল যথা শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদ। শাসন পরিষদ শাসনকার্যের ব্যাপারে পরামর্শ দিত। আইন পরিষদ আইন রচনা করিত। (১) ১৮৬১ খ্রীঃ আইন অনুসারে বড়লাট শাসন পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের (portfolio) দায়িত্ব বণ্টন করিয়া দেন। বিভিন্ন সদস্য নিজ নিজ দপ্তরের দায়িত্ব বহন করেন। ইহার ফলে ক্যাবিনেট প্রথার ভিত্তি স্থাপিত হয়। (২) বড়লাটের আইন পরিষদের সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া নিম্নতম ৬ জন এবং ঊর্ধতম ১২ জন করার ব্যবস্থা হয়। (৩) জনৈক আইনবিদকে বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়। (৪) বড়লাটের আইন পরিষদের সভ্যগণকে দুই বৎসরের জন্য মনোনীত করা হয়। (৫) আইন পরিষদের অন্ততঃ অর্ধেক সভ্যকে বেসরকারী অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী ছাড়া অন্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়। ৬) বেসরকারী সভ্যগণের ক্ষেত্রে বড়লাট দরকার মনে করিলে কয়েকজন ভারতীয়কে সভ্য হিসাবে আইন পরিষদে মনোনয়ন দানের অধিকার পান। তবে ভারতীয় সভ্য নিয়োগ করিতে বড়লাট বাধ্য ছিলেন না। (৭) আইন পরিষদের ক্ষমতা ১৮৬১ খ্রীঃ

১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনের শর্তাবলী

আইনে নির্দেশ করা হয়। আইন পরিষদের সভ্যগণ কেবলমাত্র আইনের খসড়া রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহারা বিতর্ক বা প্রশ্ন দ্বারা সরকারকে বিব্রত করিতে পারিতেন না। (৮) কোন আইনের খসড়া আইন পরিষদে পেশ করিতে হইলে বড়লাটের অগ্রিম অনুমতির দরকার হইত। বড়লাট যদি অনুমতি না দিতেন তবে সে খসড়া পেশ করা যাইত না। ইংলণ্ডের সরকারের স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে এইরূপ কোন বিষয়ে খসড়া রচনা করা বে-আইনী ছিল। (৯) কোন বিষয়ে আইন সভা ও বড়লাট সম্মতি দিলেও যদি ভারত সচিব অসম্মতি দেখাইতেন তবে তাহা আইনে পরিণত হইতে পারিত না। আইন রচনার বিষয়ে শেষ কথা ভারত সচিবের হাতেই ছিল। (১০) জরুরী অবস্থায় বড়লাট আইন পরিষদ বাদ দিয়া নিজ অধিকারে অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিতেন। (১১) ১৮৬১ খ্রীঃ আইনে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ছোটলাটের অধীনে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা হয়। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিও অনুরূপভাবে বাধা নিষেধের অধীনে আসে।

১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনের সমালোচনা

১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনে মাত্র কয়েকজন ভারতবাসীকে বড়লাট আইন পরিষদে মনোনয়ন করিয়া ভারতীয়গণের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের দাবীকে চাপা দেওয়া হয়। আইন পরিষদে সরকারী সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য থাকায় বেসরকারী সভ্যগণের মতামত চাপা পড়িয়া যায়। তাছাড়া বেসরকারী সভ্যগণের অধিকাংশ নির্বাচিত না হইয়া সরকারের মনোনীত হওয়ায় তাঁহারা জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া সরকারের পক্ষে কথা বলেন। আইন পরিষদের গৃহীত আইন চূড়ান্ত না হইয়া বড়লাটের সম্মতি-সাপেক্ষ থাকায় বড়লাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করা সম্ভব হইত না। সর্বোপরি ১৮৬১ খ্রীঃ আইনে ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব না মানায় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী তীব্র হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হইলে এই আইনের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন

১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন (The Indian Council's Act of 1892)ঃ ১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনের বহু ত্রুটি থাকায় এবং ইহার সমালোচনা হওয়ায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৮৯২ খ্রীঃ একটি নূতন আইন পাশ করে। ১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন দ্বারা—(১) বড়লাটের আইন পরিষদের সভ্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ১০ জন ও সর্বোচ্চ ১৬ জন করা হয়। (২) আইন পরিষদের $\frac{2}{5}$ সংখ্যক সভ্য বেসরকারী অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী বহির্ভূত হইবার নিয়ম করা হয়। (৩) জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থার সভ্যগণের মধ্য হইতে কিছু সভ্যকে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন পরিষদের সভ্য হিসাবে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। (৪) আইন পরিষদের বাকি সকল সভ্য বড়লাটের মনোনীত সভ্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হয়। (৫) আইন পরিষদের গৃহীত আইন বড়লাটের নাকচ করার অধিকার বলবৎ থাকে। (৬) সভ্যগণকে বাজেটের অর্থাৎ অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর মন্তব্য প্রকাশের অধিকার ও জনস্বার্থ বিষয়ে মন্তব্য করার অধিকার দেওয়া হয়। (৭) প্রাদেশিক আইন পরিষদের সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া নিম্ন

সংখ্যা ৮ ও ঊর্ধসংখ্যা ২০ করার ব্যবস্থা হয়। (৮) ১৮৯২ খ্রীঃ আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বড়লাটের আইন পরিষদের ৫ জন সভ্যকে নির্বাচনের দ্বারা নিয়োগ করার নিয়ম চালু করা হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের বেসরকারী সভ্যগণ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের জন্য এই ৫ জন সভ্যকে নির্বাচন করিতেন।

১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনকে ঐতিহাসিক কুপল্যান্ড একটি "বৈপ্লবিক ব্যবস্থা" আখ্যা দিয়াছেন। এই আইনের দ্বারা সর্বপ্রথম আইন পরিষদের সভ্য নিয়োগের জন্য নির্বাচন প্রথার প্রচলন করা হয়। এই আইনের বলে সুরেন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, গোখেল, স্যার রাসবিহারী প্রভৃতি বড়লাটের আইন পরিষদে স্থান পান। ১৮৯২ খ্রীঃ আইন দ্বারা আইন সভার সভ্যগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আলোচনার অধিকার পান। আইন পরিষদে সভ্য সংখ্যাও বাড়ান হয়। কিন্তু সভ্যগণকে সরাসরি নির্বাচন না করিয়া পরোক্ষ নির্বাচন করায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দূরে থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বড়লাটের সম্মতি ব্যতীত কোন আইন কার্যকরী না হওয়ায় আইন পরিষদের বড়লাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিল না। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি চিন্তাশীল দেশ নেতারা এইজন্য এই আইনের সমালোচনা করেন।

১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনের সমালোচনা

১৯০৯ খ্রীঃ মর্লি-মিণ্টো ভারত শাসন সংস্কার আইন (The Morley-Minto Reforms of 1909): ১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনে জনপ্রতিনিধিদের আইন সভায় গ্রহণ না করায় এই আইন ভারতের জাতীয় নেতাগণের দ্বারা সমালোচিত হয়। এদিকে ১৯০৫ খ্রীঃ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইন ও তাহার পরিণামে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ইংরাজ শাসনের ভিত কাঁপাইয়া দেয়। চতুর ইংরাজ শাসককুল বুঝিতে পারে যে, ভারতবাসীকে কিছু পরিমাণ অধিকার না দিলে ইংরাজ সরকারের বিপদ অনিবার্য হইবে। এদিকে জাতীয় কংগ্রেসের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর চাপ বাড়িতে থাকায় ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণেন। ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীগণের দলাদলির পর ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের ঐক্যে ফাটল ধরাইবার সুযোগ পান। কংগ্রেসের নরমপন্থীগণ তখনও ইংরাজ সরকারের সুবিচার ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলজনক ফলে বিশ্বাস করিতেন। এই নরমপন্থী বা মডারেটগণকে ইংরাজ সরকারের পক্ষে রাখিবার জন্য বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারত সচিব লর্ড মর্লি কিছু পরিমাণ সংস্কার প্রবর্তন করিতে মনস্থ করেন। তৃতীয়তঃ, মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু নেতা ১৯০৬ খ্রীঃ বড়লাট মিণ্টোর সহিত দেখা করিয়া ভারতীয় মুসলিমগণের স্বতন্ত্র দাবী ও অধিকারের কথা বলেন। চতুর ইংরাজ শাসকগণ ভেদ নীতির দ্বারা মুসলিম সমাজকে নিজ পক্ষে আনিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করিবার সুযোগ পায়। বড়লাট মিণ্টো ও ভারত সচিব মর্লি স্থির করেন যে, নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিয়া কংগ্রেসের মডারেট বা নরমপন্থী এবং ভারতীয় মুসলিমগণকে ইংরাজের পক্ষে আনিতে হইবে। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লর্ড মর্লি উদার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্ল্যাডস্টোনের

মর্লি-মিণ্টো আইনের ভূমিকা

শিষ্য। দার্শনিক বেন্থামের হিতবাদ এবং গ্ল্যাডষ্টোনের নীতি যথা, "শাসন করিতে হইলে শাসিতের প্রতি কর্তব্য পালন করা উচিত" - এই মতবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে শিক্ষিত ভারতীয়গণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ লইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই যুক্তি অনুযায়ী তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য হিসাবে স্যার এস পি. সিংহকে গ্রহণে সম্মতি দেন। এই সকল কারণে ১৯০৯ খ্রীঃ মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্তিত হয়।

মর্লি-মিণ্টো আইনে (১) বড়লাটের আইন পরিষদের সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া ৬০ জন করা হয়। এই ৬০ জন সভ্য ছাড়া অতিরিক্ত ৯ জন স্থায়ী সদস্য ছিল। আইন পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৬৯ জন। ৬৯ জন সভ্যের মধ্যে ৩৭ জন সরকারী ও ৩২ জন বেসরকারী সভ্য থাকিবার ব্যবস্থা হয়। (২) প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা সরকারী সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা বাড়ান হয়। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে সর্বাধিক ৫০ ও অন্যান্য প্রদেশে সর্বাধিক ৩০ জন সভ্যের পদ সৃষ্টি করা হয়। (৩) কেন্দ্রীয় আইনসভায় ৩২ জন বেসরকারী সভ্যের মধ্যে ২৭ জন নির্বাচিত সভ্য ও ৫ জন মনোনীত সভ্য থাকিবার ব্যবস্থা হয়। (৪) নির্বাচিত সভ্যগণকে জন সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন না করিয়া শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্বাচন করার ব্যবস্থা হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে, মুসলিম সভ্য কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ভোটে, আরও কিছু সভ্য জমিদার শ্রেণীর ভোটে নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট সভ্যগণ বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের আইনসভার সভ্যগণের ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। (৫) প্রাদেশিক আইন সভার গঠনেও স্বতন্ত্র নির্বাচন চালু করা হয়। ইহার অর্থ হইল যে, প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম সভ্য কেবলমাত্র মুসলিম ভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়। (৬) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ক্ষমতা বাড়ান হয়। সভ্যগণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক, বাজেট বিতর্ক, ছাঁটাই প্রস্তাব আনার অধিকার দেওয়া হয়। (৭) আইনসভার নির্বাচনে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোট দানের অধিকার দান করা হয় অর্থাৎ ইহার অর্থ হইল সর্বসাধারণের ভোটাধিকার না দিয়া সম্পত্তির উপর যাহারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিত একমাত্র তাহারাই ভোট দেওয়ার অধিকার পায়।

মর্লি-মিণ্টো আইনের শর্ত

মর্লি-মিণ্টো আইনের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে। প্রথমতঃ, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র সভ্য ও স্বতন্ত্র ভোট চালু করিয়া জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইংরাজের ভেদনীতি ভারতকে ভাগ করিবার পথ দেখায়। দ্বিতীয়তঃ, গণভোটের বদলে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোট চালু করায় দরিদ্র জনসাধারণের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ এই আইনে দেওয়া হয় নাই। আসলে এই আইন দ্বারা মডারেট বা নরমপন্থীগণকে ও মুসলিম সম্প্রদায়কে ইংরাজের অনুগত রাখার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয়তঃ, মর্লি-মিণ্টো আইনে ভারতবাসীকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস

মর্লি-মিণ্টো আইনের সমালোচনা

দানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেন্দ্রে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠনের কোন ব্যবস্থাও ইহাতে ছিল না। লর্ড মর্লি বলেন যে, ভারতবাসীকে স্বশাসন দান করার তিনি পক্ষপাতী নহেন। ইহার ফলে জাতীয় নেতাগণ হতাশ হইয়া পড়েন।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, ১৯১৯ খ্রীঃ (Montague Chelmsford Reforms) : মর্লি-মিণ্টো সংস্কার দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণের আশা-আকাংখার পূরণ হয় নাই। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মর্লি-মিণ্টো আইনের সাম্প্রদায়িক নির্বাচন, পরোক্ষ নির্বাচন প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করে। এমন কি নরমপন্থীগণও মর্লি-মিণ্টো আইনের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসের ভিতর নরমপন্থী ও চরমপন্থীগণের যে বিভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা ১৯১৬ খ্রীঃ মিটাইয়া লইলে জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া ব্রিটিশ সরকার নূতন সংস্কার দ্বারা ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় মুসলিম নেতাগণ তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি ইসলামীয় দেশগুলির প্রতি ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী নীতির দরুণ ইংরাজের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন। মুসলিম লীগ কর্তাভজা নীতি ছাড়িয়া বাঁকাসুরে ইংরাজের সমালোচনা আরম্ভ করে। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে মুসলিম নেতাগণ লক্ষ্নৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রীঃ) দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষে মিটাইয়া নেন। ইহার ফলে ইংরাজের সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ব্যর্থ হইবার উপক্রম হয়। কংগ্রেস লক্ষ্নৌ চুক্তি দ্বারা মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ও স্বতন্ত্র অধিকার মানিয়া নেয়। লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ দাবীকে সমর্থন জানায়। তৃতীয়তঃ, মিসেস এ্যানি বেশান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে হোমরুল আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিলে ইংরাজ সরকার শঙ্কিত হইয়া পড়েন। ভারতবাসীকে কিছু পরিমাণ অধিকার দিয়া তিলকের উগ্রপন্থী আন্দোলনকে উঠাইয়া দেওয়ার কথা তাঁহারা ভাবেন। চতুর্থতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয়গণের সাহায্য ইংরাজের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ভারতীয় অর্থ ও সেনার সাহায্য ছাড়া ইংরাজের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং ভারতবাসীগণকে শাসন সংস্কারের আশ্বাস দিয়া তাহাদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করা হয়।

মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের পটভূমিকা

এমতাবস্থায় ভারত সচিব এডউইন মণ্টেগু ১৯১৭ খ্রীঃ এক ঘোষণায় বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতীয়গণ যাহাতে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার লাভ করিতে পারে, ব্রিটিশ সরকার সেজন্য সংস্কার প্রবর্তন করিবেন। মণ্টেগুর এই ঘোষণায় শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগে ভারতবাসীকে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়। ইহার অর্থ হইল ভারতবাসীকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকার দান (Association of Indians)। এই ঘোষণাকে কার্যে রূপায়িত করিয়া ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু-চেমসফোর্ড বা মণ্ট-ফোর্ড আইন পাশ করা হয়।

মণ্টেগুর ঘোষণা

মণ্ট-ফোর্ড আইনের শর্তগুলি নিম্নরূপ ছিল—(১) কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনার

জন্য গভর্ণর জেনারেলের সভাপতিত্বে একটি কার্য-নির্বাহক সভা গঠন করা হয়। (২) কার্য-নির্বাহক সভায় তিনজন ভারতীয় সদস্য ও পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ সদস্য থাকিবার নিয়ম করা হয়। (৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ও আয় ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দেশরক্ষা, রেলপথ, মুদ্রা, ডাক বিভাগ প্রভৃতি কেন্দ্রের হাতে ; স্বাস্থ্য, সেচ, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রভৃতি প্রদেশের হাতে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের হাতে বেশী অর্থ এবং রাজ্যের হাতে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়। (৪) কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চকক্ষ বা কাউন্সিল অফ ষ্টেটে ৬০ জন সভ্যের মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত ও ২৬ জন মনোনীত সভ্য থাকিবার নিয়ম করা হয়। (৫) নিম্নকক্ষ বা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর ১৪০ জন সভ্যের মধ্যে ৪০ জন মনোনীত ও ১০০ জন নির্বাচিত সভ্যের ব্যবস্থা করা হয়।[১] মনোনীত ৪০ জন সভ্যের মধ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা অনধিক ২৬ করা হয়। (৬) আইনসভাগুলির সভ্যগণকে তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত করা হয়। (৭) উচ্চশ্রেণী, ধনী ব্যক্তি ও বিশিষ্ট লোককে আইন সভার নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। (৮) মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় শতকরা ৭০ জন সভ্য নির্বাচিত ও শতকরা ৩০ জন সভ্য মনোনীত করার ব্যবস্থা হয়। প্রদেশের আইন সভায় সর্বোচ্চ ১২৫ ও সর্বনিম্ন ১১১ জন সভ্য রাখার নিয়ম করা হয়। (৯) কেন্দ্রে ও প্রদেশের আইনসভায় গৃহীত আইন যথাক্রমে বড়লাট ও ছোটলাটগণ দরকার অনুযায়ী নাকচ করার অধিকার পান। বড়লাটের বিনা অনুমতিতে কোন কোন বিষয়ে আইন সভার আইন রচনা করিবার অধিকার হরণ করা হয়। (১০) বড়লাট অর্ডিন্যান্স দ্বারা প্রয়োজন হইলে আইন রচনার অধিকার পান আর তিনি প্রয়োজন বোধে আইনসভাগুলি ভঙ্গ বা রদ বা মুলতুবী রাখার অধিকার পান। (১১) কেন্দ্রীয় আইনসভা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন রচনার অধিকার পায়। সভ্যগণকে প্রশ্ন করা, বিতর্ক, ছাঁটাই প্রস্তাব, সংশোধনী প্রভৃতি আনার অধিকার দেওয়া হয়। (১২) বৈদেশিক নীতি, জাতীয় ঋণ, সামরিক বিভাগ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বড়লাটের বিনা অনুমতিতে প্রশ্ন বা আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়। (১৩) প্রদেশগুলিতে Diarchy বা দ্বৈত শাসন চালু করা হয়। কয়েকটি সংরক্ষিত (Reserve) বিষয়, যথা আইন-শৃংখলা, বিচার প্রভৃতি গভর্ণরের হাতে থাকে এবং হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred) যথা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দায়িত্ব আইনসভা ও তাহার নির্বাচিত মন্ত্রীর হাতে থাকে। প্রদেশের মন্ত্রীদের আইন সভার দ্বারা নির্বাচিত করা হয়। তাঁহাদের কাজের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের শর্ত

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার ভারতীয়গণের আশা-আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়। প্রথমতঃ, কেন্দ্রে কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার ব্যবস্থা না থাকায় বড়লাটের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। কেন্দ্রে আইনসভা আইন রচনা করিলেও শাসনের দায়িত্ব বড়লাট ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার হাতে থাকে। বড়লাট তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী

১. মতান্তরে মোট ১৪০ জন সভ্য করা হয়। ১০৫ জন নির্বাচিত ও ৪০ জন মনোনীত সভ্য।

থাকিতেন না। বিলাতে ভারত সচিবের নিকট তাঁহার কাজের জবাবদিহি করিতে হইত। ইহার ফলে আইনসভা তাঁহার উপর কোন এক্তিয়ার খাটাইতে পারিত না। কেন্দ্রীয় আইনসভা কোন প্রস্তাব আনিলেও বড়লাট তাহা অগ্রাহ্য করার অধিকার পান। ফলে আইনসভা প্রকৃত ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে। মুসলিম সম্প্রদায়কে পৃথক ভোটাধিকার দিলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, প্রদেশে ডায়ার্কী বা দ্বৈত শাসনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গভর্ণরের হাতে থাকে। এ বিষয়ে আইনসভার কোন এক্তিয়ার না থাকায় আইনসভা প্রকৃত ক্ষমতা লাভে বিফল হয়। চতুর্থতঃ, হস্তান্তরিত বিষয়গুলি দায়িত্বশীল মন্ত্রীর হাতে দিলেও, প্রয়োজনবোধে গভর্ণর মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত নামঞ্জুর করার অধিকার পান। ফলে আসল ক্ষমতা গভর্ণরের হাতে থাকিয়া যায়। পঞ্চমতঃ, সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন না করার ফলে ভোটদানের ক্ষমতা বিত্তবান শ্রেণীর হাতে থাকিয়া যায়। ইহার ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিনষ্ট হয়। এই সকল ত্রুটির জন্য জাতীয় কংগ্রেস মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারকে "অপ্রচুর, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যকর"[১] বলিয়া অভিহিত করেন।

মণ্ট-ফোর্ড আইনের ত্রুটি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের বিকাশ

(Development of Local Self Government)

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের বিকাশ: লর্ড মেয়ো হইতে লর্ড রিপন, ১৭৯৩—১৮৮২ খ্রীঃ (Development of Local Self Government from Lord Mayo to Lord Ripon): জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, পৌর ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালনা করার প্রথাকে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বলা হয়। প্রাচীন যুগে মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল কোম্পানীর শাসনকর্তাগণ এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখান। ১৭৯৩ খ্রীঃ চার্টার আইন দ্বারা গভর্ণর জেনারেলকে কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে জাষ্টিসেস অফ পিস নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। এই কর্মচারীগণ শহরের বাড়ির উপর কর আদায় করিয়া পুলিশ, রাস্তাঘাট পরিস্কার রাখা ও মেরামত করা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের খরচ আদায় করিতেন। ক্রমে কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরগুলিতে পৌর-সভা গঠন করা হয়। শহরের করদাতাগণকে পৌর কর্মকর্তা নির্বাচনের অধিকারও দেওয়া

কোম্পানীর আমলে স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা

১. "Inadequate, unsatisfactory and disappointing".

হয়। তবে মূল ক্ষমতা সরকারের নিযুক্ত কমিশনারের হাতে থাকে। প্রেসিডেন্সী শহরের বাহিরে মফস্বল শহরগুলিতে পৌর ব্যবস্থা গঠনের জন্য ১৮৪২ খ্রীঃ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট পাশ করা হয়। ইহার ফলে ভারতের বিভিন্ন শহরে পৌর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ এই পৌর পরিষদগুলিকে পরোক্ষভাবে কর আদায়ের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। ১৮৬৫ খ্রীঃ জেলা বোর্ড চালু করা হয়।

লর্ড মেয়ো ১৮৭০ খ্রীঃ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারতে পৌর শাসন বা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। লর্ড মেয়ো তাঁহার এই প্রস্তাবে বলেন যে — (১) স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনার জন্য স্থানীয় লোকের উৎসাহ, উদ্যম ও স্বার্থ থাকা স্বাভাবিক। (২) সুতরাং পৌরসভাগুলির কাজ ভালভাবে চালাইবার জন্য দেশীয় ও ইওরোপীয় জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করা দরকার। লর্ড মেয়োর আদেশ অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলি পৌর আইন বা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন পাশ করে। ইহার ফলে নূতন নূতন পৌর সভা স্থাপিত হয়। পৌর সভার অর্থ পৌর কমিটির নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বেঙ্গল জেলা সেস আইন (১৮৭১ খ্রীঃ) অনুযায়ী জমির উপর সেস নামক কর আদায় করিয়া এই অর্থ জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও অনুরূপ আইন পাশ করা হয়। লর্ড মেয়োর আইনের দুইটি লক্ষ্য ছিল যথা — (১) ইওরোপীয় কর্মচারীগণের সহিত ভারতীয়গণের যোগ স্থাপন। (২) ভারতীয়গণকে স্বায়ত্ব শাসনে শিক্ষা দান। তাছাড়া ১৮৭৬ খ্রীঃ একটি আইন দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশন গঠিত হয়। কর্পোরেশনে ৭২ জন সদস্য ছিল। এই ৭২ জনের মধ্যে করদাতাগণের ভোটে ৪৮ জন নির্বাচিত হইত।, অবশিষ্ট সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইত। লর্ড মেয়োর স্বায়ত্ব শাসন আইনের প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, পৌর কমিটিগুলি পুরাপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে সরকারের অনুমতি ছাড়া ইহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব হইত না।

লর্ড মেয়োর স্বায়ত্ব শাসন প্রস্তাব

লর্ড রিপনের আমলে পৌর শাসন বা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন ঘটে। লর্ড রিপন ছিলেন গ্ল্যাডস্টোনের উদারতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভার উন্নতি করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই। পৌরসভা বা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের মাধ্যমে ভারতীয়গণ যাহাতে স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়া পরিণামে দেশের শাসনের দায়িত্ব বহনের উপযোগী হয় ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া পৌরসভাগুলিতে সরকারী কর্মচারী অপেক্ষা বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ও নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা বাড়াইয়া তিনি পৌর-সভাগুলিকে গণতান্ত্রিক রূপদানের চেষ্টা করেন।

লর্ড রিপনের উদ্দেশ্য

উপরোক্ত নীতিগুলিকে কার্যকরী করার জন্য ১৮৮২ খ্রীঃ তাঁহার বিখ্যাত স্বায়ত্ব-শাসন বিষয়ক আইন পাশ করেন। এই আইনে বলা হয় যে, (১) স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয়গণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিতে হইবে। (২) সমগ্র দেশে জেলা বোর্ডের অধীনে তালুক ও তহশীল বোর্ড লইয়া লোক্যাল-

বোর্ড বা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বোর্ড গঠিত হইবে। স্থানীয় বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের হাতে স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, মহামারী প্রতিরোধ প্রভৃতির দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া হইবে। (৩) স্থানীয় বোর্ডে বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা স্থাপন করা হইবে। অধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত ও বাকি সদস্য মনোনীত করা হইবে। (৪) জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলা বোর্ডের সভাপতি হইবেন। (৫) জেলা বোর্ডের অধীনে মহকুমা বোর্ড স্থাপিত হইবে। (৬) বোর্ড-গুলির কাজে গাফিলতী দেখা দিলে সরকার সমস্ত ভার নিজ হাতে গ্রহণ করিবেন। (৭) কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের কর্পোরেশনে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। রিপনের স্বায়ত্ব শাসন প্রস্তাব অনুসারে সমগ্র দেশে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা হয়। রিপন বলেন যে "ভারতের পুরাতন স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন তিনি ঘটাইতেছেন।" কিন্তু রিপনের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও কুটিল রাজ কর্মচারীগণ ভারতবাসীকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারের অযোগ্য মনে করিত। ফলে রিপনের প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য বিল রচিত হইলে ভারত সচিব এক ভিটো দ্বারা উক্ত বিলের অনেক অংশ নাকচ করেন। রক্ষণশীল বৃটিশ আমলারা মনে করিত যে, ভারতীয়গণকে স্বায়ত্ব শাসনের শিক্ষা দিলে তাঁহারা স্বাধীনতা দাবী করিবে। তবুও বলা যায় যে, রিপনের প্রবর্তিত সংস্কার মোটামুটিভাবে ১৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চলিতে থাকে।

লর্ড রিপনের স্বায়ত্ব শাসন সংস্কার

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা: রিপনের পর হইতে ১৯৩৫ পর্যন্ত (Development of Local Self Government after Ripon to 1935): লর্ড রিপন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কর্পোরেশন গঠনে গণতান্ত্রিক রীতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু রক্ষণশীল শাসকেরা রিপনের এই ব্যবস্থাকে অপছন্দ করিত। লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াইয়া দেন। তিনি কর্পোরেশনের নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া দিয়া মোট সংখ্যার অর্ধেক করেন। সরকারী চেয়ারম্যান একচ্ছত্র ক্ষমতা লইয়া কর্পোরেশন শাসন করিবার অধিকার পায়। ইহার ফলে কর্পোরেশনের স্বয়ং-শাসিত চরিত্র নষ্ট হয়। সুরেন্দ্রনাথ এজন্য কার্জনী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং কর্পোরেশনের সদস্য পদ ত্যাগ করেন। যাহা হউক, ১৯২৩ খ্রীঃ একটি আইন দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশনের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা হয়। পৌরশাসন ব্যবস্থার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা পর্যালোচনার জন্য ১৯০৮ খ্রীঃ রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন গ্রাম পঞ্চায়েৎ বোর্ড গঠনের জন্য সুপারিশ করে। ১৯১৮ খ্রীঃ লর্ড মিণ্টো এক প্রস্তাব দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে জানাইয়া দেন যে, অতঃপর পৌরসংস্থাগুলিকে যতদূর সম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক করিতে হইবে এবং তাহাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্ট-ফোর্ড আইনে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে নির্বাচিত মন্ত্রীসভার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নির্বাচিত মন্ত্রী স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের ভার পান। কেন্দ্রীয় সরকার স্বায়ত্ব

রয়্যাল কমিশন ও লর্ড মিণ্টোর সংস্কার

শাসন ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেন। কিন্তু অর্থাভাব ও ক্ষমতার অভাব-বশতঃ নির্বাচিত মন্ত্রী এই বিভাগের উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হন। অর্থদপ্তর গভর্ণরের হাতে থাকায় গভর্ণর অর্থবরাদ্দ না করিলে স্বায়ত্বশাসনের কাজ অচল হইয়া পড়ে। ফলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটে।

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত রক্ষা আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন নীতি গৃহীত হয়। ইহার ফলে স্বায়ত্ব শাসন যথা কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির পরিচালনা সরাসরি প্রাদেশিক সরকারের উপর বর্তায়। ইহার ফলে পৌরসভাগুলির উপর অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পৌরসভাগুলির যথেষ্ট পরিমাণ কর আদায়ের ক্ষমতা না থাকায় এই জনহিতকর কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাদের সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করিতে হয়। সরকারী অনুদান সীমিত হওয়ার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার উন্নতি ব্যাহত হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪০ নং ধারায় গ্রামপঞ্চায়েৎ গঠন এবং তাহাদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার ভার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৮ খ্রীঃ গ্রাম পঞ্চায়েৎ আইনের উন্নতি বিধান করিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েৎ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পঞ্চায়েতগুলির হাতে অধিকতর ক্ষমতা দানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

১৯৩৫ খ্রীঃ স্বায়ত্ব শাসন আইন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন : সরকারী চাকুরীর ভারতীয় করণের দাবী

(Constitutional Changes : Struggle for Indianisation of Public Services)

সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের দাবী (Struggle for Indianisation of Public services) : ভারতে ইংরাজ শাসনের সাফল্য অনেক পরিমাণে কর্মচারীগণের দক্ষতা, সাধুতা ও ভারতীয় সমস্যার প্রতি অনুকূল মনোভাবের উপর নির্ভর করিত। লর্ড মেকলে একদা এইজন্য মন্তব্য করেন যে, গভর্ণর জেনারেল অপেক্ষা, কোম্পানীর কর্মচারীগণের চরিত্র গঠনের উপর ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। ইংরাজ কর্মচারীগণ ভারতীয় ভাষা ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে ঔদাসীন্য বা অবহেলা দেখাইত। এদিকে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত ভারতীয়গণের

মনে সরকারী পদলাভের আকাঙ্খা জাগে। ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাস পড়িয়া এবং ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া স্বভাবতই তাহাদের মনে এই আশা জাগে যে ব্রিটিশ সরকার উচ্চপদগুলিতে যোগ্য ভারতীয় প্রার্থী নিয়োগে কৃপণতা করিবেন না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভারতীয়গণের এই আশা অপূর্ণ থাকে।

শিক্ষিত ভারতীয়গণের উচ্চ সরকারী পদ লাভের আশা

ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রীরা মুখে ভারতীয়গণের দাবীর সমর্থনে অনেক কথা বলেন। কিন্তু কাজের বেলায় উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের বিরোধিতা করা হয়। লর্ড কর্ণ-ওয়ালিস খোলাখুলিভাবে ভারতীয় নিয়োগের বিরোধিতা করেন। তিনি ভারতীয়গণের যোগ্যতা ও সততা সম্পর্কে নীচু ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি উচ্চপদে উঁচু মাহিনা দিয়া শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম করেন। ১৭৯৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের দ্বারা বার্ষিক ৫০০ পাউণ্ড বেতনের সরকারী পদে ইংরাজ নিয়োগের নিয়ম বহাল হয়। কিন্তু কোন শিক্ষিত ভারতীয়কে ঐ পদে নিয়োগের যোগ্য বিবেচিত করা হয় নাই। এইভাবে কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ কার্যতঃ বন্ধ হইয়া যায়।

ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় নিয়োগ বিরোধী নীতি

সরকারী পদগুলির ব্রিটিশ করণের নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ও কিছু উদারপন্থী ইংরাজ জোর সমালোচনা করেন। ইহার ফলে ইংরাজ সরকারের টনক নড়ে। ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের ৮৭ নং ধারায় বলা হয় যে ধর্ম, জাতি, বর্ণের জন্য কোন যোগ্য ভারতীয় প্রজাকে কোম্পানীর উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন

ভারতের শিক্ষিত মহলে ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের ৮৭ নং শর্ত ও লর্ড মেকলের উদার মন্তব্য বিরাট আশা সৃষ্টি করে। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ আশা করে যে এইবার ইংরাজ সরকার তাহাদের উপযুক্ত সরকারী পদে নিয়োগ করিবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার এই আইনের ৮৭ ধারার প্রয়োগ বন্ধ রাখেন। এই আইনের ৮৭ ধারা কেবলমাত্র একটি কাগুজে আইনে পরিণত হয়। এজন্য বড়লাটের পরিষদের সভ্য ক্যামেরণ মন্তব্য করেন যে, "১৮৩৩ খ্রীঃ আইন থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একটিও উচ্চপদে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয় নাই।" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এজন্য প্রতিবাদ জানায়।

১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের বিরোধিতা

১৮৫৮ খ্রীঃ মহারাণীর ঘোষণাপত্রে পুনরায় শিক্ষিত ভারতীয়গণকে আশ্বাস দিয়া বলা হয় যে, "ইহার পর হইতে শিক্ষা ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ধর্ম, জাতি, বর্ণের বিচার না করিয়া ভারত সরকারের কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে।" ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন পাশ হইবার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা নির্বাচন করিয়া যোগ্য প্রার্থীকে সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের নিয়ম করা হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আইন দ্বারা প্রতিযোগীগণের বয়স ২১ বৎসর ধার্য করা হয়।

মহারাণীর ঘোষণা পত্রে আশ্বাস : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে আই. সি. এস. নিয়োগ

১৮৬১ খ্রীঃ সিভিল সার্ভিস আইন চালু করা হইলেও কার্যতঃ ভারতীয়গণ উচ্চপদে যোগ দিতে বাধা পায়। লর্ড লিটন একটি গোপন রিপোর্টে বলেন যে "১৮৬১ খ্রীঃ আইনে উচ্চ চাকুরী লাভের জন্য ভারতীয় প্রার্থীর সমান সুযোগ ও অধিকারের কথা বলা হইলেও ইহা কার্যকর হয় নাই।" ভারতীয় প্রার্থীগণকে আই. সি. এসে যোগদান সরাসরি নিষেধ করা সম্ভব না হইলেও তাহাদের বঞ্চিত করিবার জন্য ধোঁকা দেওয়া হইয়া থাকে।[১] সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ভারতীয়গণকে উচ্চ চাকুরী দিতে অনিচ্ছুক ছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ১৮৬৯ খ্রীঃ আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করিয়া চাকুরীতে যোগ দেন। কিন্তু সামান্য অজুহাতে তাঁহাকে এই চাকুরী হইতে বিতাড়িত করা হয়।

ভারতীয় প্রার্থীগণকে বঞ্চনা

শিক্ষিত ভারতীয়গণ ইংরাজ সরকারের এই বঞ্চনা নীতি নতশিরে মানিয়া নেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে "এত অল্প বয়সে ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে বিলাতে গিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা দুষ্কর।" সুতরাং বিলাতে ও ভারতে একই সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের দাবী জানান হয়। অল্প বয়সী ভারতীয় ছাত্রগণ বিলাতে না গিয়া স্বদেশে পরীক্ষা দানের যাহাতে সুযোগ পায় এজন্য জোর চাপ সৃষ্টি করা হয়।

শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতিবাদ

ভারতীয়গণের দাবীর চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ খ্রীঃ একটি আইন রচনা করেন। এই আইনে বলা হয় যে, "যে সকল ভারতীয় আই. সি. এস. পরীক্ষায় বিফল হইবে তাহাদের কভেন্যাণ্টেড সার্ভিস বা চুক্তিবন্ধ সার্ভিসে নিয়োগ করা হইবে।" কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয় নাই।

১৮৭০ খ্রীঃ আইন

ইতিমধ্যে লর্ড লিটন আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীর বয়স ২১ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করিয়া দেন। এত অল্প বয়সে ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে বিলাতে গিয়া প্রতিযোগিতা করা খুবই কষ্টের ছিল। সুতরাং বয়স কমাইয়া প্রকারান্তরে ভারতীয়গণের আই. সি. এস. চাকুরী লাভে বঞ্চনার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ভারতব্যাপী তুমুল আন্দোলন গঠন করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে গিয়া শিক্ষিত সমাজের নিকট এই বৈষম্যমূলক আইনের কুফল বর্ণনা করেন। ১৯ বৎসরের কিশোরের পক্ষে বিলাতে গিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলতা লাভের অসম্ভব দিক তিনি দেখাইয়া দেন। বিলাতে লালমোহন ঘোষ জনসভা করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচার চালান। ইহার ফলে ভারতে ও বিলাতে একই সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের দাবী তীব্রতর হয়।

লর্ড লিটনের নীতি: সুরেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ

ভারতীয়গণের এই তীব্র দাবী এড়াইবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৯ খ্রীঃ একটি নিয়ম চালু করেন। ইহাতে ব্যবস্থা করা হয় যে, উচ্চ বংশজাত ভারতীয় যুবকদের জন্য স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিস নামে একটি চাকুরী সৃষ্টি করা হইবে। স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিসে যোগদানের জন্য প্রার্থীকে কোন পরীক্ষা দিতে হইবে না। বড়লাট উচ্চ বংশজাত ভারতীয়গণের মধ্য হইতে

স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিস ১৮৭৯ খ্রীঃ

---

১. Quoted by W. J. Bryan—British Rule in India. P. 13.

এই চাকুরীর প্রার্থীকে মনোনীত করিবেন। ইহাদের বেতন হার ও পদমর্যাদা আই. সি. এস.-গণ অপেক্ষা কম ছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিবাদ

ভারতীয় নেতাগণ স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিস প্রথার ঘোর নিন্দা করেন। তাঁহারা বলেন যে যোগ্য ভারতীয় ছাত্রগণকে আই. সি. এস. পদে বঞ্চিত করিবার জন্য এই বিকল্প চাকুরী সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইহার প্রথম অধিবেশনেই ভারতে ও বিলাতে এক-যোগে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ এবং উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের দাবী জানায় এবং আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীগণের বয়স কমাইবার নিন্দা করে।

লর্ড ডাফারিন এই অবস্থায় এইটাকিসন (Aitchison) কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন সুপারিশ করে যে ভারতীয় ছাত্রগণের ক্ষেত্রে আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স ১৯—২৩ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের দাবী কমিশন বাতিল করে। তাছাড়া কমিশন প্রাদেশিক সরকারের অধীনে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস এবং অধঃস্তন সিভিল সার্ভিস গঠনের কথাও বলে। এইটাকিসন রিপোর্টের পর বিলাতের পার্লামেণ্ট আই. সি. এস. প্রশ্ন সমাধানের জন্য এক আইনের খসড়া করে। এই খসড়ায় বিলাতে ও ভারতে একসঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়। কিন্তু বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন এই আশংকা প্রকাশ করেন যে এই আইন কার্যকরী হইলে আই. সি. এস. পদে দলে দলে ভারতীয়গণ ঢুকিয়া পড়িবে। ইহার ফলে ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইংরাজের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। লর্ড ল্যান্সডাউনের বিরোধিতায় হাউস অফ কমন্সের প্রস্তাব অকার্যকরী হইয়া যায়।

হাউস অফ কমন্সের প্রস্তাব: ভারত সরকারের বিরোধিতা

ভারতীয় কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ

ভারতীয় নেতাগণ ইহাতে হতাশ না হইয়া অধিকসংখ্যক ভারতীয়কে উচ্চপদে নিয়োগের দাবী জানান। ১৮৯৫ খ্রীঃ পুনা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁহার ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বলেন "আমরা সরকারের সকল বিভাগে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরী পাইবার দাবী করিতেছি। আমরা ভারতীয় বলিয়া এই সকল পদে বঞ্চিত হইতেছি।" ১৯০২ খ্রীঃ আমেদাবাদ কংগ্রেসে পুনরায় এই দাবী কংগ্রেস হইতে করা হয়।

এমতাবস্থায় ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য ১৯১২ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল কমিশন নিয়োগ করেন। রয়েল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সিভিল সার্ভিসের ২৫% চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে ভারতীয়গণের দীর্ঘদিনের দাবীর কিছুটা পূরণ হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে ভারত সরকারের উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ সমর্থন করা হয় এবং আই. সি. এস. চাকুরীর ৩৩% ভারতীয়গণের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু ইংরাজ আই. সি. এস. গণের বিরোধিতায় এই আইন পূর্ণভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক মণ্ট-ফোর্ড আইনের বলে ক্রমে ক্রমে বেশী সংখ্যক ভারতীয় আই. সি. এস. চাকুরীতে ঢুকিতে থাকে। ১৯২৫ খ্রীঃ একটি পাবলিক সার্ভিস

মণ্ট-ফোর্ড আইন ও ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন

কমিশন গঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে ফেডারাল বা কেন্দ্রীয় সার্ভিস কমিশন ও প্রাদেশিক সার্ভিস কমিশন নিয়োগের আইন হয়। প্রাদেশিক সার্ভিস কমিশন প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারী নিয়োগের পরামর্শ দানের অধিকার পায়। ক্রমে আই. সি. এস. প্রভৃতি উচ্চপদে শিক্ষিত ভারতীয়গণ বহু সংখ্যায় ঢুকিয়া পড়ে। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে আই. সি. এস. চাকুরীতে বহু ভারতীয় নিযুক্ত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই সকল পদের পূর্ণ ভারতীয়করণ করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে ইংরাজের বাধা সত্ত্বেও ভারতীয়গণ নিজ যোগ্যতায় উচ্চ পদগুলি লাভ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা ঃ অর্থ নৈতিক শোষণ নীতি

(Evolution of British Rule : Economic Policy)

ব্রিটিশ সরকারের অর্থ নৈতিক নীতি (Economic policy of the British Government) ঃ কোম্পানীর শাসনের আমলে কোম্পানী ভারতবর্ষে তীব্র অর্থ নৈতিক শোষণ চালায়। প্রথমতঃ, কোম্পানী ভূমি রাজস্বের হার অত্যধিক বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানী আফিম, নীল, চা প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা পায়। তৃতীয়তঃ, কোম্পানীর আমলে ভারতীয় কুটীর শিল্প ধ্বংস হইলে বিলাতী কলের মাল ও কাপড়ে ভারতের বাজার ছাইয়া যায়। ভারতীয় তাঁতি ও কারিকরেরা জীবিকাহীন হইয়া কৃষির দিকে ঝুঁকিলে জমিতে চাষ বাড়ে। চতুর্থতঃ, বিলাতের কলকারখানার জন্য ভারত হইতে কাঁচামাল সস্তায় খরিদ করিয়া চালান দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়ে। কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসন ব্রিটিশ সরকারের হাতে আসিবার পর, ব্রিটিশ সরকারও যে অর্থনীতি গ্রহণ করেন তাহাতে ভারতীয়গণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে। ভারতের সম্পদ বিপুল পরিমাণে ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। ইংরাজ সরকার ভারতে যে বাজেট চালু করেন তাহাতে সর্বদাই ঘাটতি দেখান হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য দরিদ্র ভারতবাসীর উপর নূতন করের বোঝা চাপে।

ব্রিটিশ সরকারের শোষণমূলক অর্থনীতি

১৮৫৮ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের ক্ষেত্রে যে অর্থনীতি গ্রহণ করেন তাহার প্রধান দিকগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল। প্রথমতঃ, ভারত সরকার যে রাজস্ব আদায় করিতেন তাহার সিংহভাগ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পোষনে ব্যয় হইত। এই সেনাদলের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের কাজ হইত। আফগান যুদ্ধ, পারস্য অভিযান প্রভৃতি যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় ভারতীয় রাজস্বের উপর ধার্য করা হইত। তাছাড়া বিলাতে ভারত সচিব ও তাঁহার দপ্তরের খরচও ভারতের রাজস্ব হইতে নির্বাহ হইত। ইহার ফলে ভারতের রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতবাসীর উপর

ভারতে ইংরাজ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ

করভার বাড়ান হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের রেলপথ নির্মাণের জন্য ৫% গ্যারোণ্টি দিয়া ভারতে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ফলে রেল কোম্পানীগুলিকে ক্ষতিপূরণ ও সুদের দরুণ বহু লক্ষ টাকা দিতে হইত। ইহাও ভারতের রাজস্ব হইতে ব্যয় হইত। তৃতীয়তঃ, ভারত সরকার কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজস্ব ভাগ করিবার সময় সিংহভাগ কেন্দ্রের হাতে রাখিতেন। এই অর্থ ইংরাজ সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় করা হইত। ইহাকে হোম চার্জ (Home charge) বা ইংরাজ সরকারের খরচ বলিয়া ধরা হইত। এ বিষয়ে বড়লাটের আইনসভার কোন সভ্যের কোন কথা বলিবার এক্তিয়ার ছিল না। চতুর্থতঃ, ভারতীয় টাকার সহিত ইংলণ্ডের পাউণ্ডের বাট্টার হার এমনভাবে ঠিক করা হয় যে, পাউণ্ডের বদলে ভারতীয় টাকার দাম কম ধরা হইত। ইহার ফলে ভারতবর্ষকে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হয়। পঞ্চমতঃ, উচ্চ পদগুলিতে উচ্চ বেতন ও ভাতায় শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী নিয়োগের ফলে একদিকে ভারতীয়গণ এই পদ লাভে বঞ্চিত হয়। অপর দিকে এই সকল কর্মচারীর বেতন ও অন্যান্য ভাতার দরুণ বহু টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। ষষ্ঠতঃ, ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য ছাইয়া যায়। এই মালের দাম বাবদ বহু অর্থ ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। বিলাতী মালের উপর ভারত সরকার আমদানী কর এমনই কম হারে ধার্য করেন যে তাহাতে ভারতের রাজস্বের ক্ষতি হয়। ভারতীয় শিল্পকে গড়িয়া উঠার জন্য কোন সুযোগ ভারত সরকার দিতে চান নাই। তাঁহারা মনে করিতেন যে ভারতে শিল্প স্থাপিত হইলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের মাল বিক্রয় হইবে না।[১] সপ্তমতঃ, ভারতে জলপথ ও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির দিকে নজর না দিয়া তাঁহারা রেলপথ নির্মাণের দিকে জোর দেন। জলসেচ ব্যবস্থার সহিত ভারতের খাদ্য সমস্যা ও কৃষির উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। স্যার আর্থার কটন প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারীগণ জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও সরকার ইহা অগ্রাহ্য করিয়া রেলপথ নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন। রেলপথের দ্বারা ইংলণ্ডের বণিকগণ ভারতের অভ্যন্তর হইতে কাঁচামাল যোগাড় এবং বিলাতীমাল গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া দেওয়ার সুযোগ পায়। এই কারণে ইংলণ্ডের শিল্পপতিগণ রেলপথ নির্মাণে জোর দেয়। ইংলণ্ডের ব্যাংকগুলি ভারতীয় রেলপথে টাকা লগ্নী করিয়া বিরাট লাভের সুযোগ পায়। ইহার ফলে ভারতের দারিদ্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে "ব্রিটিশ সরকার শাসনভার লইবার ১২ বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর আমল অপেক্ষা ৪ গুণ সম্পদ ভারত হইতে ইংলণ্ডে চালান হইয়া যায়। ভারত বারংবার ব্যাপক দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পতিত হয়।" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিলাত হইতে শিল্প দ্রব্য ভারতে আমদানি করা কষ্টসাধ্য হয়। ইহার ফলে ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে ১৯১৬ খ্রীঃ ভারত সরকার শিল্প কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন ভারতে শিল্প স্থাপনের চেষ্টা চালাইবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করে। ১৯১৯ খ্রীঃ শিল্প ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের হাতে পড়ে। তবে ইংরাজ সরকার ভারতে ব্রিটিশ মূলধনে শিল্প গঠনের প্রতি জোর দেয়। ভারতবাসী সাধারণভাবে এই শিল্প ব্যবস্থা হইতে লাভবান হয় নাই। তাহাড়া লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি

১. A. Tripathy—Indian Paramountcy. Vol. I.

মূল শিল্পগুলির উন্নতি বিধানে ইংরাজ সরকার ইচ্ছুক ছিল না। ফলে ভারতের শিল্প বিপ্লব ইংরাজ আমলে ঘটে নাই। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা ভারতে শিল্প বিপ্লব আনয়ন করেন।

রেলপথ নির্মাণ নীতি (Policy of the British Government towards the development of railway) ঃ ইংরাজ শাসনের যুগে ভারতে রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে চারিটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়, যথা—

(১) ১৮৪৯—১৮৬৯ খ্রীঃ এই ২০ বৎসর কাল ইংলণ্ডের কোম্পানীগুলি ভারতে রেলপথ নির্মাণে মূলধন বিনিয়োগ করে। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীগুলিকে গ্যারাণ্টি দেন যে কোম্পানী যে মূলধন খাটাইবে তাহার উপর ভারতের রাজস্ব হইতে শতকরা ৫% বার্ষিক সুদ দেওয়ার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। রেলপথ নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয়। গ্যারাণ্টি প্রথার সুযোগ পাইয়া রেল কোম্পানীগুলি রেলপথ নির্মাণের জন্য মিতব্যয়িতা না করিয়া প্রভূত অর্থ নষ্ট করে। ফলে ১৬৬½ লক্ষ টাকা ভারত সরকারকে ঘাটতি দিতে হয়।

গ্যারান্টি প্রথা

(২) ভারত সরকার গ্যারাণ্টি প্রথা উঠাইয়া দিয়া নিজ হাতে ১৮৬৯—১৮৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব নেন।

সরকারী পরিচালনা

(৩) বিলাতের মূলধনীগণ ভারত সরকারের রেলপথ রাষ্ট্রীয়করণে বিরক্ত হইয়া ইহা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। আফগান যুদ্ধে সরকারের টাকা খরচ হইয়া হাত খালি হইয়া যাওয়ায় সরকারী মালিকানায় রেলপথ নির্মাণ বন্ধ হয়। ১৮৮০ খ্রীঃ পুনরায় গ্যারাণ্টি প্রথা অনুযায়ী বিলাতী কোম্পানীগুলি প্রচুর মুনাফায় রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ করে। বিলাতী কোম্পানী রেল নির্মাণ করিয়া ভারতের রাজস্ব লুঠ করায় ভারতে ও বিলাতে ঘোর সমালোচনা হয়। ১৯২১ খ্রীঃ এ্যাকওয়ার্থ (Acworth) কমিশনের অধিকাংশ সভ্য এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেল নির্মাণের সুপারিশ করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বণিকগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার এই কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন।

দ্বিতীয় গ্যারান্টি প্রথা

(৪) বিলাতী রেল কোম্পানীগুলি ভারত হইতে বিলাতে বছরে এক কোটি টাকার মুনাফা চালান দেওয়ায় ভারতীয় নেতাগণ ঘোর প্রতিবাদ জানান। ভারতীয় যাত্রীগণের প্রতি রেল কোম্পানীগুলির দুর্ব্যবহার এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে। ইহার ফলে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রেলপথগুলির পরিচালনা ও নির্মাণের দায়িত্ব নিজ হাতে নেন। রেলওয়ে বোর্ড নিয়োগ করিয়া রেলের কাজ সুপরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারী পরিচালনা

বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত ২১ মাইল পথে ভারতের সর্বপ্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯০০ খ্রীঃ নাগাদ ভারতে প্রায় ২৫ হাজার মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। স্বাধীন ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার। ইংরাজ আমলে রেলপথ নির্মাণ নীতির ফলে প্রভূত ভারতীয় সম্পদ বিলাতে চলিয়া যায়। থর্নটন (Thernton)

প্রভৃতি চিন্তাশীল ইংরাজেরা ইহার ঘোর সমালোচনা করেন।[১] তবুও রেলপথ বিস্তারের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ে। মাল ও যাত্রী চলাচলের সুবিধা হয়। দুর্ভিক্ষ ও খরার সময় খাদ্য পাঠান সম্ভব হয়।

জলসেচ নীতি (Irrigation Policy)ঃ কোম্পানীর শাসনকালে ভারতে কৃষির উন্নতির কথা বিবেচনা করিয়া, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা চালু করা হয়। যথা মাদ্রাজে বারি দোয়াব ক্যানাল, কাবেরী-কোলেরুন জলসেচ পরিকল্পনা, গঙ্গা ক্যানাল, যমুনা ক্যানাল প্রভৃতি। এই ক্যানাল-গুলি জলসেচ, মাল চলাচলের বিশেষ সহায়ক হয় এবং স্থানীয় কর হইতে ইহার খরচ উঠিয়া যায়। কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার শাসনভার লইবার পর জলসেচ পরিকল্পনার প্রতি উপেক্ষা দেখান। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইংলণ্ডের বণিকেরা লাভের আশায় জলসেচ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার না দিয়া রেলপথকে অগ্রাধিকার দানের জন্য সরকারকে চাপ দেয়। স্যার আর্থার কটন ভারতের সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক জলসেচের ও জলপথ নির্মাণের এক পরিকল্পনা তৈয়ারী করেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত উদারপন্থী নেতা জন ব্রাইট এই পরিকল্পনাকে সমর্থন জানান। এদিকে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন ১৮৮০ খ্রীঃ রিপোর্ট দেন যে, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিতে হইলে জল-সেচের উন্নতি করিতে হইবে। রেলপথ নির্মাণ করিয়া দুর্ভিক্ষ ঠেকান যাইবে না। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা ভারতে জলসেচ পরিকল্পনার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য হ্যামিল্টন কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির নিকট আর্থার কটন বলেন যে, রেল-পথের আয় কমিয়া যাইবার ভয়ে সরকার জলপথ নির্মাণে অবহেলা দেখাইতেছেন। জল-পথ নির্মাণ করিলে জলসেচের উন্নতি হইবে, সস্তায় মাল বহন করা যাইবে। কিন্তু ইংরাজ বণিকগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য হ্যামিল্টন কমিটি জলসেচ ও জলপথ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রায় দেন। আর্থার কটনকে উপহাস করিয়া "মাথায় অনেক জল ভর্তি আছে" বলা হয়।

১৮৫৮ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ সরকারের সেচ পরি-কল্পনার প্রতি উপেক্ষা

লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হইবার পর সরকার জলসেচের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। তিনি সেচ নীতি স্থির করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৩ খ্রীঃ হইতে সরকারী সেচ নীতি গৃহীত হয়। ইহার ফলে বহু জমিতে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। কূপ ও পুষ্করিনী খোদাই করিয়া তাহাতে জল ধরিয়া রাখা, খাল খনন করিয়া জল সরবরাহ করা ইত্যাদি নানাভাবে সেচ প্রকল্প গঠন করা হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে সেচ বিভাগের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত হইলে সেচকার্যের উন্নতি ঘটে। ইহার ফলে পাঞ্জাবে শতদ্রু প্রকল্প, সিন্ধুপ্রদেশে শুক্কর বাঁধ, বোম্বাইয়ে লয়েড প্রকল্প অনুযায়ী সেচ খাল তৈয়ারী করা হয়। স্বাধীন ভারত সরকার সেচকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়াছেন। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ময়ূরাক্ষী

লর্ড কার্জনের সেচ নীতি

১. R. C. Dutt—Economic History of India.

প্রকল্প, দামোদর উপত্যকা প্রকল্প, কাঁসাই প্রকল্প, তিস্তা-কোশী প্রকল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এছাড়া ভাখরা-লাঙ্গল, ফরাক্কা, কৃষ্ণা, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্পও রূপায়িত করা হইয়াছে।

ভারতে আধুনিক শিল্প-নীতি (Industrial Policy)ঃ কোম্পানীর আমলে ভারতের কুটির-শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বহু লোক শিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত। ইহারা বেকার হইয়া ক্ষেত চাষী অথবা দিন মজুরে পরিণত হয়। এদিকে ভারতের বাজার বিলাতী মালে ছাইয়া যায়। ভারতে বিলাতী ব্যাংকগুলি মূলধন লগ্নী করিয়া সুদের টাকা বিলাতে চালান দিতে থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে ইংরাজ বণিকগণের নেতৃত্বে চেম্বার অফ কমার্স বা বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থাগুলি ভারতের বাজারে বিলাতের মাল আমদানীর এজেন্ট হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা বিলাতের ল্যাংকাশায়ারের কলের কাপড়, চেশায়ারের লবণ আমদানী করিয়া মুনাফা লুঠে।

বিলাতী ব্যাঙ্ক ও এজেন্সী প্রথা

বিলাতের শিল্পপতি ও ভারতের ইংরাজ বণিক সংস্থাগুলি ভারতীয় মালিকানায় ভারতে আধুনিক শিল্প গড়িয়া উঠার ঘোর বিরোধিতা করে। ইংরাজ সরকারও এ বিষয়ে অদ্ভুত দ্বিমুখী নীতি নেন। চারাগাছ যখন বাড়িতে থাকে তাহাকে বেড়া দিয়া রক্ষা করিলে তবে তাহা বৃক্ষে পরিণত হয়। সেইরূপ শিল্প শিশু অবস্থায় যখন থাকে তাহাকে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার জন্য বিদেশী মালের উপর আমদানী শুল্ক চাপাইয়া বিদেশী মালের দাম বাড়াইয়া দিয়া দেশীয় শিল্প রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পগুলিকে রক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা বিলাতের আমদানী মালের উপর শুল্কের হার কমাইয়া দেন। ফলে সস্তার বিলাতী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পগুলি বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সূতী শিল্পকে পিষিয়া মারার জন্য তাঁহারা ইহার উপর ব্যাপক উৎপাদন শুল্ক চাপাইয়া দেন। ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প শুল্ক আইন (১৮৯৬ খ্রীঃ) অনুযায়ী ভারতীয় বস্ত্রকলগুলির উপর শতকরা ৩½% হারে শুল্ক চাপাইয়া দেওয়া হয়।[১] এই বৈষম্যমূলক শুল্ক আইনের ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের পথে চলিয়া যায়। ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড় বিক্রয় অব্যাহত থাকে।

ভারতীয় শিল্পসংরক্ষণ নীতির প্রতি ঔদাসীন্য; ভারতীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক আদায়

ইংরাজ সরকারের হাতে এইরূপ বাধা বিঘ্ন পাইলেও ভারতে শিল্পের বিস্তার চলে। বোম্বাইয়ে ১৮৫১ খ্রীঃ প্রথম ভারতীয় কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ভারতীয় পার্শী সম্প্রদায় এই বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা নেন। ১৮৬১ খ্রীঃ বোম্বাইয়ে ও গুজরাটে প্রায় ১৩টি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। পরবর্তী ১৫ বৎসরের মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭টি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিলাত হইতে কাপড় আমদানী বন্ধ হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটে। কিন্তু যুদ্ধের পর আমদানী তুলার দাম বাড়িলে এবং সরকার বস্ত্র উৎপাদনের

ভারতে বস্ত্র শিল্পের প্রসার

১. R C. Dutt—Economic History of India.

উপর বাড়তি শুল্ক চাপাইলে বস্ত্র শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। টাটা কোম্পানী লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, জেসপ কোম্পানী লোহার কারখানা স্থাপন করে। ১৯১৯ খ্রীঃ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোং নামে অপর একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে সংরক্ষণ দান করিলে ইহার দ্রুত উন্নতি ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাতকে মৌলিক শিল্প হিসাবে গণ্য করিয়া ইহার উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ভিলাই, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজ আমলে কয়লা শিল্পের দিকেও নজর দেওয়া হয়। ১৮১৪ খ্রীঃ সর্বপ্রথম রাণীগঞ্জে কয়লা আবিষ্কৃত হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ পর হইতে ভারতীয় কয়লা বেশী পরিমাণে চালু হইলে বিদেশী কয়লা আমদানী কমিয়া যায়। স্বাধীনতা লাভের পর কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে পরিণত করা হইয়াছে। পাট শিল্প ভারতের এক বিশেষ সম্পদ। বাংলায় পাটের চাষের ফলে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। এই পাট হইতে বস্তা তৈয়ারী হইয়া থাকে। ১৮৫৫ খ্রীঃ কলিকাতার নিকটবর্তী রিষড়ায় সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ক্রমে গঙ্গার তীর ধরিয়া বাংলায় শতাধিক পাটকল স্থাপিত হয়। বিশ্বের পাটের বাজার এই কলগুলি প্রায় একচেটিয়া করিয়া নেয়। ইংরাজ আমলে এই কলগুলির মালিকানা ইংরাজ মালিকের হাতে ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় মালিকেরা এই কলগুলি অধিকার করিয়াছে। পাট চালান করিয়া স্বাধীন ভারত সরকার বহু কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আহরণ করেন। এছাড়া চা শিল্প হইল ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে আসামে ব্যাপক চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। ইংরাজ ক্ষেত মালিকগণ আসাম ও পরে দার্জিলিং অঞ্চলে চা বাগিচা স্থাপন করে। বিশ্বের বাজারে চা রপ্তানী করিয়া ইংরাজ চা বাগিচা মালিকগণ প্রভূত লাভ করে। ভারত সরকার চায়ের উপর কম শুল্ক বসাইয়া ইংরাজ মালিকগণকে পূর্ণ সুযোগ দেন। স্বাধীনতা লাভের পর চা বাগিচাগুলি ভারতীয় মালিকানায় আসিয়াছে। বিশ্বের বাজারে চা রপ্তানী করিয়া ভারত সরকার এখনও বহু কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন। এছাড়া চিনি শিল্পেও ভারত অগ্রগতি লাভ করে।

লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতের শিল্পগুলি হইল প্রধানতঃ কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল। ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতে এই ধরণের শিল্পের প্রসার হয়। বিলাতের ন্যায় নানা কারখানা এদেশে গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। ইংরাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যতটুকু শিল্প বিস্তারের প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ততটুকুই করা হয়। তাছাড়া শিল্পগুলির মালিকানা ইংরাজ কোম্পানীগুলির হাতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ ও

প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিল্প বিস্তার

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ১৯০৫ খ্রীঃ পর স্বদেশী শিল্প গঠনের জন্য ভারতীয় শিল্পপতিগণ ব্যাপকভাবে আগাইয়া আসেন। ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিলাতী মালের যোগান কমিয়া যায়। ফলে ভারতে কলকারখানা বেশী সংখ্যায় স্থাপিত হয়। এমন কি সামরিক দ্রব্যাদির শিল্পও ভারতে স্থাপিত হয়। ভারতীয় নেতাগণ জনসাধারণের বিকল্প জীবিকার জন্য শিল্প স্থাপনের উৎসাহ দিতে সরকারকে চাপ দেন। ১৯১৮ খ্রীঃ

শিল্প কমিশনও সরকারকে ভারতে শিল্প স্থাপনের পরামর্শ দিলে সরকার শিল্প স্থাপনের বাধা অনেকটা কমাইয়া দেন।

ব্রিটিশ আমলে কর, শুল্ক ও মুদ্রা নীতি (Taxes, tariffs and currency policy under British rule)ঃ কোম্পানীর আমলে ভূমি রাজস্ব ছিল কোম্পানীর সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার (১৮৫৮ খ্রীঃ) ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর ভূমি রাজস্ব, আফিম ও লবণের উপর শুল্ক এবং আমদানী-রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হইয়া দাঁড়ায়। এছাড়া মাঝে মাঝে ভূমি রাজস্ব বাড়াইয়া সরকারের আয় বাড়ান হইত। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সেচ, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতির খরচ মিটাইবার জন্য বাড়তি সেস ও উপকর আদায় করিয়া সরকার টাকা যোগাড় করিতেন। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের শাসনকালে ভূমি রাজস্ব ছাড়া আরও বহু প্রকার কর ও উপকরের বোঝা দরিদ্র ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপে। সরকারের খরচ না কমাইয়া এবং ভারত হইতে অর্থ যাহাতে বাহিরে না যায় সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া, ইংরাজ সরকার বাড়তি কর দ্বারা ঘাটতি মিটাইবার ব্যবস্থা করেন। চৌবাচ্চার জল বাহির হইবার নল বন্ধ না করিয়া কেবলমাত্র চৌবাচ্চায় জল ভরিবার নলের পরিধি বাড়াইলে যেমন চৌবাচ্চা ভর্তি হয় না ইংরাজ সরকার সেইরূপ বাজে খরচ ও অর্থের বহির্গমন বন্ধ না করিয়া কর বাড়াইয়া চলেন। ফলে সরকারের ঘাটতি বাড়িতেই থাকে। সরকারি ঋণের পরিমাণও বাড়ে। এই ঋণের উপর সুদও বাড়িতে থাকে।

ইংরাজ আমলে বাড়তি করের বোঝা

লবণ হইল প্রতি গৃহস্থের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ১৮৫৮ খ্রীঃ পর ইংরাজ সরকার লবণের উপর মণ-প্রতি ২ টাকা শুল্ক ধার্য করেন। কিন্তু ১৮৮৭ খ্রীঃ লবণের উপর শুল্ক মণ প্রতি ২.৫০ টাকা ধরা হয়। লবণের উপর শুল্ক বাড়াইয়া যে টাকা পাওয়া যায় সরকার তাহা ভারতবাসীর স্বার্থে ব্যবহার না করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার, যুদ্ধের খরচ ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করেন। মহামতি গোখেল এজন্য বড়লাটের আইন সভায় বর্ধিত লবণ শুল্ক ও ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের উপর তাহার প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার ইহাতে কর্ণপাত করে নাই। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খ্রীঃ লবণ আইন ভাঙিয়া বিনা শুল্কে দেশী লবণ তৈয়ারী করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন।

লবণ শুল্ক

ভারতে ইংরাজ সরকারের রাজস্বের অপর উৎস ছিল আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক এবং আবগারী শুল্ক প্রভৃতি। ভারত সরকারের খরচ ও রাজস্ব ঘাটতি মিটাইতে হইলে ভারতে আমদানী বিলাতী মালের উপর চড়া হারে শুল্ক বসাইয়া প্রচুর অর্থ আদায় করা সম্ভব ছিল। ভারতে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী মাল আমদানী হইত। সুতরাং ইহার উপর চড়া হারে শুল্ক লইলে ভারত সরকার সহজে বহু অর্থ পাইতেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার এই সহজ পথটি লইতে মোটেই রাজী ছিলেন না। কারণ ভারতে বিলাতী মাল বিক্রয় করা ছিল ইংরাজ জাতির স্বার্থের পক্ষে উপকারী। সুতরাং তাঁহারা ভারতে আমদানী বিলাতী মালের উপর খুবই

বিলাতী মালের উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস

নিম্ন হারে শুল্ক ধার্য করেন। এমন কি মাঝে মাঝে বিনা শুল্কে ভারতে বিলাতী মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ ভারতে বিলাতী মালের উপর আমদানী শুল্ক ছিল শতকরা ১০ টাকা। লর্ড নর্থব্রুক বড়লাট হইয়া তাহা কমাইয়া ৫ টাকায় পরিণত করেন। লর্ড লিটন বড়লাট হইলে বিলাতী মোটা কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক একেবারেই উঠাইয়া দেন। সরকারের রাজস্বের ঘাটতি ভারতীয় শিল্পের উপর কর চাপাইয়া বা ভারতীয়গণের উপর বাড়তি কর চাপাইয়া মিটান হয়।

বিলাতী মালের উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া দিলে রাজস্বের যে ঘাটতি হয় তাহা পূরণের জন্য ভারতের কাপড়ের কলগুলির উপর শতকরা ৩·৫০ টাকা হারে উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতেও সরকারের অর্থাভাব না মিটিলে যে সকল ব্যক্তির আয় ৫০০ টাকার উপর ছিল তাহাদের উপর আয়কর ধার্য করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ হইতে স্থায়ীভাবে আয়কর চালু হয়। অবশ্য কৃষি জমির আয় আয়করের আওতা হইতে বাহিরে থাকে। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই বৈষম্যমূলক কর নীতির ঘোর সমালোচনা করিয়াছেন। রাশব্রুক উইলিয়ামসের মতে, "ব্রিটিশ ও ভারতের স্বার্থে সংঘাত দেখা দিলে ইংরাজ সরকার সর্বদাই ভারতের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন।" উদারনৈতিক গ্ল্যাডস্টোন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ভারতীয় কর ব্যবস্থার ব্যাপারে তদন্ত ও সুপারিশের জন্য একটি কমিশন বসান। কিন্তু গ্ল্যাডস্টোনের পর এ বিষয়ে আর কোনও অগ্রগতি হয় নাই।

ভারতীয় শিল্পের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি: ঐতিহাসিকগণের সমালোচনা

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের মুদ্রার সহিত বিলাতের ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ের হার এমনভাবে ধরা হয় যে, ইহার ফলে ভারতকে বেশী অর্থ দিতে হইত। এছাড়া বিলাতে ভারত সচিবের দপ্তরের খরচ হোম চার্জ ও অন্যান্য খাতে বিলাতে টাকা পরিশোধের সময় মুদ্রার বিনিময় হার বেশী থাকায় ভারতকে সর্বদাই বেশী মুদ্রা দিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে রূপার দাম পড়িয়া গেলে ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার দাম পড়িয়া যায়। ফলে বিলাতী পাউণ্ডের বিনিময়ে ভারতকে আরও বেশী রূপা দিতে হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ ভারতের একটি রৌপ্য মুদ্রার দাম ছিল বিলাতের ২ শিলিং। ১৮৯৩ খ্রীঃ তাহা কমাইয়া ভারতীয় একটি রৌপ্য মুদ্রার দাম ধরা হয় ১ শিলিং ২ পেনী। মুদ্রার মান নীচু হারে ধরার ফলে বিলাতের পাওনা টাকা মিটাইতে গিয়া ভারত সরকারের রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়।

মুদ্রামানের অবনতি ও ভারতের দারিদ্র্য

ক্রমে ভারত সরকার উপলব্ধি করেন যে, মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার না করিলে ভারতের রাজস্বের ঘাটতি মিটিবে না। এজন্য হার্শেল (Herschel) কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে কাগজের নোট চালু হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ রাউলার কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারতে স্বর্ণ মুদ্রা বা সোভারিন এবং রৌপ্য মুদ্রা বা রুপি (Rupee)-কে আইন সম্মত মুদ্রা বলিয়া স্বীকার করা হয়।

মুদ্রা সংস্কার নীতি

ইংরাজ আমলে প্রজাস্বত্ব আইন (Tenancy Laws during British rule): কোম্পানীর আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মহালওয়ারী বন্দোবস্তের

ফলে জমিদার ও মধ্য স্বত্বাধিকারীগণের সুবিধা হইলেও রায়ত বা চাষীর অবস্থা বেশ খারাপ হইয়া পড়ে। জমির উপর রায়তকে কোন স্বত্ব না দেওয়ার ফলে জমিদারগণ চাষী বা রায়তদের ইচ্ছামত উচ্ছেদের অধিকার পায়। এদিকে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া রায়তের নাভিশ্বাস উঠে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার রায়তগণের জমিতে স্বত্ব রক্ষার জন্য কয়েকটি আইন করেন।

(১) ১৮৫৯ খ্রীঃ রেণ্টএ্যাক্ট বা খাজনা আইন দ্বারা বলা হয় যে, কোন রায়ত ১২ বৎসরকাল একাধিক্রমে জমি ভোগ করিলে এবং জমিদারকে নিয়মিত খাজনা প্রদান করিলে রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। কিন্তু এই আইনের সর্বপ্রথম ত্রুটি ছিল এই যে, জমি জরিপ করিয়া প্লট অনুযায়ী রেকর্ডে রায়তের নাম না যোগ করার ফলে কাগজে-কলমে অধিকার পাইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রায়তের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, জমিদারগণ খাজনা বৃদ্ধি করিয়া রায়তগণকে নাজেহাল করিবার সুযোগ পায়।

১৮৫৯ খ্রীঃ রায়তি আইন

(২) ১৮৮৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। এই আইনের বলে জেলায় জেলায় জরিপ করিয়া রায়তগণের স্বত্ব নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা হয়। রায়তের নাম জমির রেকর্ডে যোগ করা হয়। নির্দিষ্ট হারে খাজনা ধার্য এবং জমিদার-রায়তের গোলমাল হইলে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। জমিতে রায়তের স্বত্ব স্বীকৃত হয়। ১৮৯৫ খ্রীঃ অপর এক আইন দ্বারা রায়ত জমি হস্তান্তর করিলে ইহা নথিভুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮৫ খ্রীঃ প্রজাস্বত্ব আইন ও ১৮৯৫ খ্রীঃ আইন

(৩) ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা ভূমি রাজস্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে রায়তের স্বত্ব রক্ষার জন্য আইন পাশ হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৮ খ্রীঃ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৯ খ্রীঃ মধ্যপ্রদেশ প্রজাস্বত্ব আইন, বোম্বাই প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৮ খ্রীঃ

ভারত সরকারের দুর্ভিক্ষ নিরোধ নীতি (Famine Policy)ঃ কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে লোকেরা প্রধান জীবিকা হিসাবে কৃষিকেই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতির ফলে শস্যহানি ও তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ ভারতের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া থাকে। কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকে ১৭৭০ খ্রীঃ ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তাহার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার বিবরণ (প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে পৃঃ ২৪) উল্লেখ করা হইয়াছে। কোম্পানীর শাসনকালে কয়েকটি বড় ধরণের দুর্ভিক্ষ হয়।

ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রভাব

ইংরাজ সরকার কোম্পানীর হাত হইতে নিজ হাতে ভারতের শাসনভার লইবার পর জল-সেচ ব্যবস্থার দিকে নজর না দেওয়ার ফলে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায়। ১৮৬৬ খ্রীঃ উড়িষ্যা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যায়। ১৮৭৬ খ্রীঃ পশ্চিম ভারতে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে বহু প্রাণ নষ্ট হয়। এছাড়া আরও কয়েকটি দুর্ভিক্ষ ঘটে।

১৮৫৮ খ্রীঃ পর ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া

বেয়ার্ড স্মিথ কমিশন ১৮৬১ খ্রীঃ ভারতে দুর্ভিক্ষের জন্য ভূমি ব্যবস্থার ত্রুটিকেই দায়ী করে। ১৮৬৭ খ্রীঃ ক্যাম্পবেল কমিশনও দুর্ভিক্ষ নিরোধের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করে। লর্ড লিটনের আমলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর লর্ড লিটন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য ষ্ট্র্যাচি (Strachey) কমিটি নিয়োগ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ ষ্ট্র্যাচি কমিটির সুপারিশে বলা হয় যে, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সরকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর জমা রাখিবেন। এই তহবিলের সঞ্চিত অর্থ দুর্ভিক্ষে ত্রাণের জন্য ব্যয়িত হইবে। দুর্ভিক্ষ ঘটিলে সরকারকে ত্রাণের দায়িত্ব লইতে হইবে। সুস্থ লোকদের কাজ দিয়া, দুর্বল ও অকর্মদের খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দিয়া বাঁচাইতে হইবে। স্থানীয় ভিত্তিতে যথা বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি জনকল্যাণের কাজে লোককে খাটাইয়া উদার হাতে মজুরি দিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা ও ঋণ আদায় বন্ধ রাখিতে হইবে। ষ্ট্র্যাচি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৮৩ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ আইন বা ফেমিন কোড (Famine Code) তৈয়ারী হয় এবং ইহার সাহায্যে ১৮৯৬-৯৭ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সহায়তা হয়। লায়াল কমিশনও ১৮৯৮ খ্রীঃ ষ্ট্র্যাচি কমিশনের সুপারিশগুলি সমর্থন করেন।

ষ্ট্র্যাচি কমিশনের সুপারিশ ও তাহার প্রয়োগ

লর্ড কার্জনের আমলে ম্যাকডোনেল কমিশন ১৯০০ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে আরও কতিপয় ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। (১) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিশনার নামে এক পদ সৃষ্টি করা ; (২) কৃষি ব্যাংক স্থাপন ও উন্নত প্রথায় চাষের প্রচলন ; (৩) জলসেচ ব্যবস্থার বিধান ; (৪) বীজ, সার ও গবাদি পশু ক্রয়ের জন্য ঋণ দান। ম্যাকডোনেল কমিশনের সুপারিশগুলি মোটামুটি কার্যকরী করা হয়। ইহার ফলে দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক ও দরিদ্রগণ বহু পরিমাণে নিস্কৃতি পায় এবং ব্যাপক দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়।

ম্যাকডোনেল কমিশনের সুপারিশ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অ-ব্রিটিশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতাগণের প্রতিবাদ

(Nationalist Protest against "un-British rule")

অ-ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতাগণের প্রতিবাদ : ইংরাজ শাসনের বৈধতা বিচার (Nationalist protest against un-British rule : Examination of the Benifits of British rule) : ভারতের শাসনব্যবস্থা, সরকারী চাকুরী, ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতি

সর্বস্তরে ইংরাজ সরকার ভারতে যে প্রচণ্ড শোষণ চালান তাহা জাতীয়তাবাদী নেতাগণের সতর্ক চক্ষু এড়ায় নাই। তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে, ১৮৫০-১৯০০ খ্রীঃ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত সরকারের শাসন খাতে ব্যয় ৪ গুণ বাড়িয়াছে। তাছাড়া বিলাতী মাল বিক্রয় করিয়া, রেল চালাইয়া ইংরাজ জাতি ভারতের সম্পদ লুঠ করিতেছে। সরকার ইচ্ছামত খরচ করিয়া ঘাটতি মিটাইবার জন্য জন-সাধারণের উপর কর বাড়াইতেছেন। হোম চার্জের খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাতে চলিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে ভারতবাসীর মতামত লইবার কোন দরকার সরকার মনে করেন নাই।

ব্রিটিশ সরকার বিলাতের মিল মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শোষণমূলক আইন রচনা করেন। মুখে ন্যায় নীতির কথা বলিলেও হাতে কলমে তাঁহারা ইংরাজের স্বার্থে শোষণ করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ভারতে ইংরাজ সরকারের শোষণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইংরাজ সরকার নির্বিচারে যে শোষণ ভারতে চালায় তাহাতে তাঁহারা মর্মাহত হন। তাঁহাদের মতে এই ধরণের শাসন ছিল un-British বা ব্রিটেনের ঐতিহ্য ও আদর্শ বিরোধী। এই সকল ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ জানিতেন যে, ইংরাজ জাতি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রের আদর্শ হইল জনসাধারণের উপর কর চাপাইতে হইলে তাহাদের প্রতিনিধিগণের সম্মতি লওয়া দরকার। বিলাতে পার্লামেণ্ট সভার বিনা সম্মতিতে সরকার কোন কর চাপাইতে পারেন না। জনপ্রতিনিধিগণের মতের বিরুদ্ধে কর আদায় ইংরাজ ঐতিহ্য বিরোধী। ভারতের ক্ষেত্রে, শিক্ষিত ভারতবাসীগণ ছিলেন জাতির প্রতিনিধি। তাঁহাদের মতামত না লইয়া, অথবা বড়লাটের পরামর্শ সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি না লইয়া ভারতবাসীর উপর কর স্থাপন তাঁহারা ইংরাজ ঐতিহ্য-বিরোধী বা un-British বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং ইংরাজ স্বদেশে গণতান্ত্রিক ও উদার নীতি অনুসরণ করিলেও ভারতে সেই আদর্শ অনুসরণ না করায় তাঁহারা un-British rule বা অব্রিটিশ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

"Un-British rule" বা অ-ব্রিটিশ শাসন নীতি কথাটি ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাগণের পিতামহ-স্থানীয় দাদাভাই নওরোজী সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ছিল "Poverty and un-British Rule in India"। দাদাভাই নওরোজী, গোখেল, রানাড়ে, সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি নেতাগণ ইংরাজ আমলে ভারতে শোষণ ব্যবস্থার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া ভারতে ইংরাজ শাসনের যৌক্তিকতা বিচার করেন। লাহোর কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজী বলেন যে "ভারতবাসীর সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইল ভারতের দারিদ্র্য।" তাঁহার গ্রন্থে তিনি বলেন যে "ইংরাজ বৈজ্ঞানিক পন্থায় ভারতবাসীর মর্মস্থানে আঘাত করিতেছে। কিন্তু এই সত্য কথাকে চাপা দিয়া তাহারা ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতের উন্নতির কথা প্রচার করিয়া সেই গভীর ক্ষতকে চাপা দিয়া চলিয়াছে"। দাদাভাই নওরোজী আরও বলেন যে, "ইংরাজেরা বলিয়া থাকে যে ভারতের দারিদ্র্য হইল অনিবার্য। কিন্তু ভারতবাসীরা ইংরাজের এই অভিমতকে উদ্ভট ও বস্তাপচা বলিয়া মনে করে"। ইংরাজ সরকার ভারতের অর্থ বাজে

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ

খরচ করিলে অথবা ভারতের অর্থ ইংলণ্ডের স্বার্থে ব্যবহার করিলে ভারতবাসীকে প্রতিবাদ করিতে দেওয়া হয় না। দাদাভাই নওরোজী বলেন যে, "দেশের লোক কাজ না পাইয়া অলসভাবে বসিয়া আছে। সরকার তাহাদের শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা অর্জনের রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভারতে ইংরাজ স্থাপিত কল-কারখানায় ভারতীয়-গণকে শ্রমিকের কাজে ছাড়া অন্য কোন সুযোগ দেওয়া হয় না।" ইংরাজের স্থাপিত কল-কারখানার মুনাফা ভারতের বাহিরে ইংলণ্ডে চালান করা হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত আই সি. এস. চাকুরী হইতে অবসর লইয়া ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।[১] এই দুইটি গ্রন্থে তিনি ইংরাজ আমলে ভারতের শোষণের বৈজ্ঞানিক-ভাবে বিশ্লেষণ করেন। কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতের সম্পদ ভারতের স্বার্থে ব্যবহারের দাবী জানান। মহারাষ্ট্রের মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে ১৮৯০ খ্রীঃ সংসদে বলেন যে "শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি ভারতবাসীর হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।" তিনি আরও বলেন যে মহারানীর ঘোষণা পত্রে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলেও তাহা রক্ষা করা হইতেছে না। গোখেল তাঁহার এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় ভারতের শোষণ সম্পর্কে বিবরণ দিয়া বড়লাটের নিকট দাবী করেন যে, আপাততঃ ভারতবাসীর উপর হইতে লবণ শুল্ক, দেশী কাপড়ের উপর শুল্ক তুলিয়া লওয়া হউক এবং আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হউক।

উদারনৈতিক ইংরাজগণের শোষণ নীতির সমালোচনা

কোন কোন উদারপন্থী ইংরাজ লেখকও ভারতে ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতির নিন্দা জানান। মেজর উইনগেট এই অভিমত দেন যে, "ব্রিটেন একটি শিলিং খরচ না করিয়া ভারত সাম্রাজ্য পাইয়াছে।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য চীন, ব্রহ্ম, আফগান, পারস্য যুদ্ধের খরচ ভারতবাসীর উপর চাপাইয়া কর আদায় করা হইয়া থাকে। Home charge নামক গালভরা নাম দিয়া ভারতেরই রাজস্ব হইতে কোটি কোটি টাকা শাসক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য বিলাতে পাঠান হয়। মোট কথা ভারতের রক্ত চুষিয়া ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নজির খুবই কম দেখা যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই সকল চিন্তাবিদের যুক্তি গ্রহণ করে। ফলে কংগ্রেসের বার্ষিক প্রস্তাবে ভারত হইতে বিলাতে সম্পদ প্রেরণ, সরকারী কর বৃদ্ধি, সরকারী চাকুরিতে শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের প্রতিবাদ করা হয়। ভারতের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরাজের কুশাসনকে দায়ী করা হয়। এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অন্ধমোহ লোকের কাটিতে আরম্ভ করে। দাদাভাই নওরোজী, গোখেল, রানাড়ে ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্রিটিশের শোষণ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করেন।

---

১. এই গ্রন্থ দুইটির নাম ছিল—(১) Economic History of India under British Rule. (২) Economic History of India in the Victorian Age.

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক ও সীমান্ত নীতি

(Foreign and Frontier Policy)

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি (North-west Frontier Policy) : ভারতের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বলিতে সিন্ধু নদ ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বুঝায়। ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করিবার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতিগণকে লইয়া সমস্যা দেখা দেয়। ইহারা সিন্ধু, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে হামলা ও লুটপাঠ চালাইয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের সীমান্ত বিপন্ন করিয়া তুলে। আফগানিস্থানের আমীরও ইহাদের সহযোগিতা করেন। ব্রিটিশ সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য সীমান্ত নীতি গ্রহণে বাধ্য হন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যা

সিন্ধুর ইংরাজ শাসনকর্তা স্যার চার্লস নেপিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের দমনের জন্য নেপিয়ার নীতি (Napier System) গ্রহণ করেন। এই নীতি অনুযায়ী সিন্ধু সীমান্তে ক্ষুদ্র দুর্গ শ্রেণী নির্মাণ এবং উহাতে পাহারাদারী সেনা রাখা হয়। সীমান্ত অধিবাসীগণকে আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়। কিন্তু সীমান্ত অধিবাসীরা আগ্নেয়াস্ত্র পাইয়া উপজাতিগণের সহিত যোগ দিয়া ভারতের ভিতর লুটপাঠ চালায়। ফলে নেপিয়ার নীতি পরিত্যক্ত হয়। স্যার বার্টল ফ্রার ইহার পর সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত হইলে "সিন্ধু নীতি" (Sind System) চালু করেন। এই নীতি অনুসারে সীমান্ত অধিবাসীগণের আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া নেওয়া হয়। এই অঞ্চলে কয়েকটি অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করিয়া উপজাতি হানাদারগণকে ঠেকাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কালাতের খান সাহেবকে বালুচ উপজাতির কর্তা হিসাবে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বালুচ হানাদার দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু "সিন্ধু নীতি"ও কার্যক্ষেত্রে বিফল হয়। হানাদারগণের উৎপাত অব্যাহত থাকে।

নেপিয়ার নীতি ও সিন্ধু নীতি

স্যার জন লরেন্স বড়লাট হইয়া সীমান্ত কর্মচারীগণকে নির্দেশ দেন যে, উপজাতি অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করিতে চান না ইহা উপজাতিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হউক। ইহা সত্বেও যদি হানাদারগণ উৎপাত চালায় তবে পাঞ্জাব সরকার হানাদারগণের দেশে দমনমূলক সামরিক অভিযান চালাইয়া ইহাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। উপজাতিদের নিকট পাইকারী জরিমানা আদায় করিয়া লুটপাঠ করার ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশও তিনি দেন। ইহা ছাড়া উপজাতি

লর্ড লরেন্সের হস্তক্ষেপ না করা নীতি

অঞ্চলে হাসপাতাল, বিদ্যালয় স্থাপন ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিয়া উপজাতিগণকে শান্তিপ্রিয় ও সভ্য নাগরিকে পরিণত করার নির্দেশও তিনি দেন। লর্ড লরেন্সের দমন ও নিরপেক্ষতা নীতি প্রায় ২৫ বৎসর অনুসরণ করা হয়।

লর্ড লিটন ১৮৭৬ খ্রীঃ বড়লাট হইবার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি অঞ্চল অধিকার করিয়া উত্তর-পশ্চিমে ভারতের "বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক সীমান্ত" স্থাপন করার নীতি গ্রহণ করেন। লর্ড লিটন ছিলেন "Forward Policy" বা আগ্রাসী নীতির ভক্ত। সুতরাং তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব সরকারকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অধিকার করিবার নির্দেশ দেন। লর্ড লরেন্সের নিরপেক্ষতা নীতি পরিত্যক্ত হয়। বালুচিস্থানে ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডিম্যান (Captain Sandeman) এজেণ্ট নিযুক্ত হন। তিনি কালাতের খান সাহেবকে ইংরাজের নিকট কোয়েটা শহর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। ক্রমে উত্তর-পশ্চিমের পেশোয়ার, হাজারা, কোহাট, বান্নু, ডেরা গাজি খাঁ, ডেরা ইসমাইল খাঁ অঞ্চল ইংরাজ অধিকারে আসে। লর্ড লিটনের নির্দেশে ইংরাজ কমিশনারগণ এই সকল স্থানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। লর্ড ল্যান্সডাইন বড়লাট হইয়া লিটনের অনুসৃত আগ্রাসী নীতিকে অনুসরণ করেন। লর্ড ল্যান্সডাউন, স্যার মার্টিনার ডুরাণ্ডকে কাবুলে দূত পাঠাইয়া ডুরাণ্ড চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী (১৮৯৩ খ্রীঃ) আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়। ইহার নাম হয় "ডুরাণ্ড লাইন।" আফগান আমীরকে ব্রিটিশ সরকার ১৮ লাখ টাকা অর্থ সাহায্য ও অস্ত্রশস্ত্র দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

লর্ড লিটনের আগ্রাসী নীতি : লর্ড ল্যান্সডাউন : ডুরাণ্ড লাইন

ডুরাণ্ড চুক্তির পর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আফ্রিদি, বরকজাই প্রভৃতি উপজাতিগণ তাহাদের স্বাধীনতায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরাজ ঘাঁটিগুলি জ্বালাইয়া এবং বহু ইংরাজ সেনা নিহত করিয়া, চিত্রল দুর্গ অবরোধ করিয়া উপজাতিগণ ইংরাজ অধিকার নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। উপজাতি যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার প্রায় ৪০ হাজার ইংরাজ সেনা নিয়োগ করিলেও উপজাতিগণকে দমন করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

উপজাতি বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হন। লর্ড কার্জন সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শান্তি স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন — (১) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অগ্রগামী অঞ্চল যথা খাইবার, গিলগিট প্রভৃতি স্থান হইতে ইংরাজ সেনা সরাইয়া লওয়া হয়। (২) ইংরাজ অফিসারের অধীনে স্থানীয় বাহিনী (Local militia) গড়িয়া ইহাদের এই সকল স্থান রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইহাদের নাম হয় খাইবার রাইফেল, কুররম বাহিনী প্রভৃতি। ইহার ফলে বেকার পাঠানেরা নূতন কাজ পাইয়া ইংরাজের প্রতি অনুগত হয়। (৩) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি-গুলি যথা মালাকান্দ, পেশোয়ার, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ সেনার ছাউনি রাখা হয়। (৪) পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের সহিত এই সকল ঘাঁটির রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দরকার হইলে ভারত হইতে

লর্ড কার্জনের সংগঠন নীতি

রেলযোগে দ্রুত সেনা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কার্জনের নীতির ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হয়।

লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান নীতি ও প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (Afghan Policy of Lord Auckland : First Anglo-Afghan War) ঃ ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পশ্চিম ভারতের দ্বারদেশে আফগানিস্থান বিরাজমান। প্রাচীন যুগ হইতে বিদেশী আক্রমণকারীগণ আফগানিস্থান হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হইলে স্বভাবতঃই আফগানিস্থানের দিকে ইংরাজ শাসকগণের দৃষ্টি পড়ে। ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ শক্তির আফগানিস্থানের পথে ভারতে ঢুকিয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল কারণে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্থানের দিকে সতর্ক চোখ রাখেন।

আফগানিস্থান ও ভারতের নিরাপত্তা সমস্যা

মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ পাঞ্জাবে শিখ সাম্রাজ্য স্থাপন করার পর ভারতে ইংরাজশক্তি আফগান সমস্যা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। কিন্তু ইংরাজ সরকার বেশী দিন এই নিরাপত্তা ভোগ করিবার সুযোগ পান নাই। রাশিয়ার জার সরকার আফগান সীমান্তের দিকে রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করিলে ইংরাজের আতঙ্ক বাড়িয়া যায়।

রাশিয়ার জার সরকার মধ্য এশিয়ার তুর্কী রাজ্যগুলি যথা সমরখন্দ, বোখারা, তাসখন্দ প্রভৃতি অধিকার করিয়া আফগানিস্থানের সীমান্ত অভিমুখে আগাইতে থাকেন। ইহাতে ইংরাজের আশংকা হয় যে, রাশিয়া আফগানিস্থানে ঢুকিয়া পড়িবে। রুশ শক্তি আফগানিস্থানে ঢুকিয়া পড়িলে তাহাদের পক্ষে ভারত আক্রমণ অত্যন্ত সহজসাধ্য হইবে। পারস্য ১৮৩৭ খ্রীঃ ভারত সীমান্তে হিরাট অধিকার করে। ইংরাজ সরকার সন্দেহ করেন যে, রাশিয়া গোপনে পারস্যকে হিরাট দখলের জন্য প্ররোচনা দিয়াছে। ইংরাজ সেনাপতি পটিঞ্জারের সহায়তায় আফগান সরকার হিরাট পুনরুদ্ধার করে। এই সময় লর্ড পামারষ্টোন ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রীর পদে বসেন। তাঁহার আমলে ইওরোপে ইংরাজ-রুশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পামারষ্টোন আশংকা করেন যে, রাশিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারত আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছে। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডও বিলাতের কর্তৃপক্ষের সহিত এবিষয়ে একমত হন।

ইংরাজ সরকারের রুশ ভীতি

লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্থানে রুশ অনুপ্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে ইংরাজ প্রভাব বাড়াইবার নীতি নেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ কোম্পানীর পরিচালক সভা তাঁহাকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অনুমতি দেন। লর্ড অকল্যাণ্ড আলেকজাণ্ডার বার্ণেস নামক এক দূতকে আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের নিকট পাঠাইয়া ইংরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রস্তাব দেন। দোস্ত মহম্মদ ইহার বিনিময়ে পেশোয়ার দাবী করেন। এই সময় পেশোয়ার ইংরাজের মিত্র মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের অধিকারে ছিল। দোস্ত

বার্ণেস দৌত্য : অকল্যাণ্ডের নীতি

মহম্মদকে পেশোয়ার দানের প্রতিশ্রুতি দিলে ইংরাজের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতা নষ্ট হইত। সুতরাং লর্ড অকল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে বার্ণেস দৌত্য বিফল হয়।



দোস্ত মহম্মদ

দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া রাশিয়ার দিকে মুখ ফেরান। তিনি রুশ দূত ভিক্টোভিচকে মহা সমাদরে নিজ দরবারে আনেন। সম্ভবতঃ দোস্ত মহম্মদ রুশ দূতকে কাবুলে ডাকিয়া আনিয়া ইংরাজের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে উল্টা ফল হয়।

লর্ড অকল্যাণ্ড রাশিয়ার সহিত দোস্ত মহম্মদের যোগাযোগের কথা শুনিয়া আতঙ্ক বোধ করেন। তিনি রুশপন্হী দোস্ত মহম্মদকে কাবুলের সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজ-পন্হী শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প নেন। শাহ সুজা ছিলেন আহমদ শাহ আবদালীর বংশধর। শাহ সুজা ইহার আগে আফগানিস্থানের বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপদার্থ। বরকজাই বিদ্রোহের ফলে তিনি সিংহাসন হারাইয়া ভারতে আশ্রয় নিয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মদকে উৎখাত করিবার জন্য লর্ড অকল্যাণ্ড, ইংরাজ, রঞ্জিৎ সিংহ ও শাহ সুজার মধ্যে ১৮৩৮ খ্রীঃ ত্রিশক্তি চুক্তি স্থাপন করেন। এই চুক্তির দ্বারা ইংরাজ ও শিখ সেনা আফগানিস্থান আক্রমণ করিয়া দোস্ত মহম্মদকে বিতাড়ন করার সংকল্প নেয়। চতুর রঞ্জিৎ সিংহ এই সুযোগে শাহ সুজার নিকট হইতে কোহিনূর মণি হাতাইয়া নেন।

লর্ড অকল্যাণ্ডের কাবুল আক্রমণের সিদ্ধান্ত : ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর লর্ড অকল্যাণ্ড সিমলা ঘোষণার দ্বারা ১৮৩৮ খ্রীঃ আমীর দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ইংরাজ সেনাদল দোস্ত মহম্মদকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করে। শাহ সুজা কাবুলের সিংহাসনে বসেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একদল ইংরাজ সেনাকে কাবুলে রাখা হয়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানগণ তাহাদের দেশে ইংরাজের হস্তক্ষেপে ক্ষেপিয়া যায়। শাহ সুজাকে ইংরাজের হাতের পুতুল বলিয়া তাহারা আমীরের গদী হইতে হঠাইতে সংকল্প নেয়। এদিকে কাবুলে ইংরাজ সেনার অত্যাচারে আফগানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ফলে ১৮৪১ খ্রীঃ আফগান বিদ্রোহীগণের আক্রমণে বার্ণেস ও অন্যান্য ইংরাজ অফিসারগণ নিহত হন। শাহ সুজাও নিহত হন। কাবুলের ইংরাজ সেনাদল ভারত অভিমুখে পালাইতে গিয়া বরফ, ঝড় ও আফগান আক্রমণে নিহত বা বন্দী হয়। একমাত্র ডাঃ ব্রাইডন নামক একজন ইংরাজ পলাইয়া গিয়া জালালাবাদ দুর্গে এই বিপর্যয়ের সংবাদ দেন। এই বিফলতার ফলে লর্ড অকল্যাণ্ড পদত্যাগ করেন। লর্ড এলেনবরা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া সেনাপতি

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ : ইংরাজের বিপর্যয়

পোলকের সাহায্যে জালালাবাদ দুর্গ হইতে অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈনাদলকে উদ্ধার করেন। লর্ড এলেনবরার আদেশে ইংরাজ সেনা পুনরায় কাবুলে ঢুকিয়া ধ্বংসলীলা চালায়। ইহার পর এলেনবরার আদেশে ইংরাজ সেনা আফগানিস্থান ত্যাগ করে। দোস্ত মহম্মদ পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে বসেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান নীতিকে ঐতিহাসিক পি. রবার্টস (P. Roberts) "রাজনৈতিক দিক হইতে বিপর্যয়কর এবং নৈতিক দিক হইতে ভ্রান্ত" (politically disastrous and morally wrong) বলিয়াছেন। অকল্যাণ্ড অহেতুক রুশ ভীতি বশতঃ এই আক্রমণমুখী নীতি নেন। আফগান জাতির স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে আমল না দিয়া তিনি মহা ভুল করেন। তাছাড়া অকর্মণ্য ও অপদার্থ শাহ সুজাকে তিনি বলপূর্বক আফগানগণের উপর চাপাইতে গিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার চেষ্টা করেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স, প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া আফগানিস্থান সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করেন। লর্ড লরেন্সের এই নীতিকে "দক্ষতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা" (Masterly inactivity) নীতি বলা হয়। লর্ড লরেন্স মনে করিতেন যে, ভারত সীমান্ত সুরক্ষার জন্য আফগানিস্থানে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই অথবা কাবুলে ব্রিটিশ দূত রাখিবার দরকারও নাই। রাশিয়া আফগানিস্থান হইয়া ভারতে ঢুকিবে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। যদি রাশিয়া তাহা করে তবে স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানগণই তাহার মোকাবিলা করিবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাছাড়া ইংরাজ সরকার আফগানিস্থানে রুশ হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না, রাশিয়াকে এই কথা জানাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

লর্ড লরেন্সের নিরপেক্ষতা নীতি

দোস্ত মহম্মদের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে লরেন্স মনে করিতেন যে, যে প্রার্থী কাবুলের সিংহাসন নিজ বাহুবলে পাইবে তাহাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হইবে। কোন বিশেষ প্রার্থীকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ইংরাজ সরকার ব্যস্ততা দেখাইবেন না। দোস্ত মহম্মদের পুত্রগণের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শের আলি শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেন। তখন লর্ড লরেন্স তাঁহাকে স্বীকৃতি দেন। লর্ড লরেন্সের নীতি শের আলির মনে গভীর বিরাগ সৃষ্টি করে। শের আলি বলেন যে ইংরাজদের নীতি হইল "স্বার্থদুষ্ট"। যে ঘোড়া বাজী জিতে তাহাকেই শেষ পর্যন্ত তাহারা গ্রহণ করে। কিন্তু বিপদের দিনে সাহায্যের হাত ইংরাজরা আগাইয়া দেয় না। ইহার ফলে শের আলি ইংরাজ মিত্রতা সম্পর্কে উদাসীন থাকেন।

লরেন্সের নীতির ফলাফল

লর্ড লিটন ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ, ১৮৭৮-৭৯ খ্রীঃ (Lord Lytton and the Second Anglo-Afghan war) : দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ১৬ জন পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ হয়। লর্ড লরেন্স এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকেন। শেষ পর্যন্ত দোস্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শের আলি এই যুদ্ধে জয়ী হইলে ইংরাজ সরকার তাঁহাকে স্বীকৃতি দেন। লর্ড মেয়ো অনুরূপভাবে হস্তক্ষেপ

না করার নীতি নেন। লর্ড নর্থব্রুকের আমলে রাশিয়ার রাজ্য বিস্তার ও "খিভা" নামক স্থান দখলের ফলে শের আলি ভীত হন। মধ্য এশিয়ার অধিকৃত স্থান লইয়া রাশিয়া তুর্কীস্থান প্রদেশ গঠন করিলে, শের আলি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গ্যারাণ্টি বা প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু উদারপন্থী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন বড়লাটকে নিরপেক্ষতা নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। ফলে লর্ড নর্থব্রুক শের আলিকে জানাইয়া দেন যে "আমাদের স্থায়ী নীতি আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব"।[১] ইহাতে শের আলি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। এছাড়া শের আলি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব খানকে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা খানকে উত্তরাধিকারী করিতে চান। তিনি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট আবদুল্লা খানের জন্য স্বীকৃতি চাহিলে লর্ড নর্থব্রুক ইহা দিতে বিরত থাকেন। ইহার ফলে শের আলির সহিত ব্রিটিশের সম্পর্ক তিক্ত হয়। শের আলি রুশ তুর্কীস্থানের শাসক কাউফম্যানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইংরাজকে ভয় দেখাইবার জন্য শের আলি ইহা করেন। কিন্তু পরবর্তী বড়লাট লর্ড লিটন ইহার ফলে আফগানিস্থানে রুশ হস্তক্ষেপের আশংকা করেন।

শের আলির ইংরাজ সাহায্য ভিক্ষা ও সিংহাসনারোহণ

ইতিমধ্যে বিলাতে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসে। নূতন প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও বিস্তার নীতির ভক্ত। সুতরাং নিরপেক্ষতা নীতি ছাড়িয়া আফগানিস্থানে ব্রিটিশ প্রভাব স্থায়ীভাবে স্থাপন করার তিনি সংকল্প নেন। বড়লাট লর্ড লিটন ছিলেন ডিসরেইলির নীতির অনুরাগী। লর্ড লিটন এই সিদ্ধান্ত নেন যে, শের আলিকে ব্রিটিশ মিত্রতা দিয়া আফগানিস্থানে পাকাপাকিভাবে ইংরাজ প্রভাব কায়েম করিতে হইবে। তিনি শের আলির নিকট দাবী জানান যে, "শের আলি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট যে সাহায্য চাহিয়া প্রস্তাব দিয়াছিলেন, ব্রিটিশ সরকার এখন তাহা দিবেন। ইহার বিনিময়ে হিরাটে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখিতে হইবে।"

লর্ড লিটনের হস্তক্ষেপ নীতি

কিন্তু শের আলি আফগানিস্থানে কোন বৈদেশিক দূত রাখার বিরোধী ছিলেন। তিনি লর্ড লিটনকে জানান যে, "যদি ইংরাজ রেসিডেণ্ট তাঁহাকে লইতে হয় তবে সমানভাবে তাঁহাকে রুশ রেসিডেণ্টও লইতে হইবে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা তাঁহার নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়।" লর্ড লিটন এই জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া শের আলিকে ভীতি প্রদর্শন করেন। লর্ড লিটন বলেন যে, "ইংরাজ তাঁহাকে শরের কাঠির ন্যায় দুই টুকরা করিয়া ফেলিবে।" কালাতের খানের নিকট হইতে কোয়েটা দখল করিয়া লর্ড লিটন এই স্থানে সেনা ব্যারাক স্থাপন করেন এবং গিলগিটে একজন ব্রিটিশ এজেণ্ট নিয়োগ করা হয়। ইহাতে শের আলি চটিয়া যান।

শের আলির সহিত লর্ড লিটনের বিরোধ

এদিকে ইওরোপে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের পর বার্লিন কংগ্রেসে ইংলণ্ড রাশিয়াকে জব্দ করায় রুশ সরকার ইংলণ্ডকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেন। রুশ সরকার জানিতেন যে

১. "We shall maintain our settled policy in Afghanistan".

ইংরাজেরা আফগানিস্থানে রুশ অনুপ্রবেশের বিরোধী। ইংরাজকে ব্যস্ত করিবার জন্য রুশ দূত ষ্টোলেইটফ সদলবলে কাবুল প্রবেশ করিয়া শের আলির সহিত মিত্রতা প্রস্তাব জানায়। রাশিয়া শের আলিকে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কাবুলে রুশ দূতের আগমনে লর্ড লিটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনিও পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ইংরাজ দূতকে সসৈন্যে কাবুলের দিকে পাঠাইয়া দেন। আফগানগণ আলি মসজিদ নামক স্থানে এই দূতের অগ্রগতিতে বাধা দিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮ খ্রীঃ) আরম্ভ হয়।

লর্ড লিটনের দূত প্রেরণ

৪০ হাজার ইংরাজ সেনা বন্যার জলের ন্যায় আফগানিস্থানে ঢুকিয়া পড়িলে শের আলি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাশিয়ায় পলাইয়া যান। লর্ড লিটন, শের আলির পুত্র ইয়াকুব খানকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত গণ্ডামাকের সন্ধি (১৮৭৯ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির বলে (১) ইয়াকুব খান ইংরাজের নির্দেশে বৈদেশিক নীতি চালাইতে স্বীকৃতি দেন। (২) কাবুলে ইংরাজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়। (৩) ইংরাজ আফগানিস্থানকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। (৪) ইয়াকুব খানকে বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানগণ গণ্ডামাকের সন্ধিকে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ করিলে ইয়াকুব খান ভারতে পলাইয়া আসেন। ইংরাজ সেনা পুনরায় আফগানগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আবদার রহমানকে সিংহাসনে বসায়। ইহার পর ইংরাজেরা কাবুল হইতে চলিয়া আসে এবং নিরপেক্ষ থাকে। আবদার রহমান ছিলেন স্বাধীনচিত্ত লোক। তিনি ইংরাজ প্রভাবমুক্ত হইয়া শাসনকার্য চালান। ইংরাজ শক্তিও বুঝিতে পারে যে, আফগানগণ ইংরাজের অধীনতা কিছুতেই মানিবে না। এ দিকে রাশিয়ার সহিত ইংলন্ডের একটি বোঝাপড়া হইবার ফলে উভয় দেশ আফগানিস্থানের নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিতে রাজী হয়। লর্ড লিটন দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে রুশ হস্তক্ষেপ লইয়া অহেতুক বাড়াবাড়ি করেন এবং ইহার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তীব্র সমালোচনা হয়। কিন্তু লর্ড লিটন প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলির নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়েন। লিটনের আফগান নীতি ছিল খুবই আক্রমণমুখী ও অদূরদর্শী। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আফগানিস্থানের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হয়। লিটনের আফগান নীতির একমাত্র পরোক্ষ ফল ছিল এই যে তাঁহার নীতির ফলে মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ: গণ্ডামাকের সন্ধি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পর হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক (Anglo-Afghan relations after the Second Anglo-Afghan war): দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পরও রাশিয়া আফগান সীমান্তের দিকে বিস্তার নীতি চালাইয়া যায়। ১৮৮৪ খ্রীঃ হিরাটের ১০০ মাইল দূরে মার্ভ শহর এবং পরের বৎসর পাঞ্জদে রাশিয়া দখল করিলে ব্রিটিশ সরকার রুশ-আফগান সীমান্ত চিহ্নিত করার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ দেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়া অক্ষুনদীকে (Oxus) তাহার রাজ্যের দক্ষিণ

সীমান্ত বলিয়া স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু রাশিয়া অতঃপর পূর্ব দিকে পামীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলে পুনর্বার ইঙ্গ-রুশ বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ চুক্তির (Anglo-Russian Convention) দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। রাশিয়া আফগানিস্থানের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা মানিয়া নেয়। ইংলণ্ডও আফগানিস্থানের স্বাধীনতা স্বীকার করে। উভয় দেশ আফগানিস্থানে বাণিজ্যের সমান সুযোগ লইতে অঙ্গীকার করে। আফগান আমীর হবিবুল্লাহ তাঁহার বিনা সম্মতিতে এই চুক্তি করায় ইহার বিরোধিতা করেন। হবিবুল্লাহর পুত্র আমানুল্লাহ সিংহাসনে বসিয়া ইংরাজ বিরোধী দলের প্রভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (১৯১৯ খ্রীঃ) করেন। ফলে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ বাধে। রাওয়ালপিন্ডির সন্ধি (১৯১৯ খ্রীঃ) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২১ খ্রীঃ ইঙ্গ-আফগান চুক্তির দ্বারা ইংলন্ডের সহিত আফগানিস্থানের চূড়ান্ত মীমাংসা স্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা আফগানিস্থানের স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত হয়। উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয়।

রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্ম সীমান্ত নীতি

(Relation with Burma)

ব্রহ্মদেশ ও সীমান্ত নীতি (Burmese Frontier Policy) : ভারতের অভ্যন্তরে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজ ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দেয়। ফলে তিনটি ব্রহ্ম যুদ্ধের দ্বারা ইংরাজ ব্রহ্মদেশ গ্রাস করে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। (বিশদ বিবরণ পৃঃ ১২১ দেখ)। এই দুই ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ ব্রহ্ম, আরাকান প্রভৃতি স্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে আসে। কেবলমাত্র উত্তর ব্রহ্মের স্বাধীনতা বজায় থাকে। ব্রহ্মরাজ মিণ্ডনের সহিত ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক তিক্ত হয়। তাঁহার পুত্র থিব ব্রহ্ম সিংহাসনে বসিলে ইঙ্গ-ব্রহ্ম সম্পর্ক জটিল হয়। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ বাধে। ব্রহ্মদেশ আক্রমণের জন্য ইংরাজ শক্তি ব্রহ্মরাজের কুশাসন, ইংরাজ বণিকগণের উপর দুর্ব্যবহার, কাউতাও প্রথা, ব্রহ্মরাজের আসাম আক্রমণ প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে ইংরাজ শক্তি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব লইয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। চীনের ক্ষেত্রে যেমন কাউতাও প্রথা ও চীনে ইংরাজ বণিকগণের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের অজুহাত দেখান হয় ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মরাজ থিব আত্মসমর্পণ করেন। লর্ড ডাফরিন সমগ্র ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ

ইন্দোচীন হইতে ব্রহ্মে ফরাসী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বন্ধ করিবার জন্য ইংরাজগণ ব্রহ্মদেশ দ্রুত অধিকার করে। ব্রহ্ম সরকার আফগানিস্থানের ন্যায় দুর্ধর্ষ না হইবার ফলে সহজে ইংরাজ সেনার নিকট পরাজিত হন। ব্রহ্মদেশে প্রকৃত ফরাসী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল কিনা তাহা বলা শক্ত। তবে আফগানিস্থানে রুশ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যত প্রত্যক্ষ ও প্রবল ছিল, ব্রহ্মদেশে ফরাসী হস্তক্ষেপের সেরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। যাহা হউক ব্রিটিশ সরকার ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের নিরাপত্তা এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গের একাংশের উপর ব্রহ্মের দাবীর কথা ভাবিয়া কোন ঝুঁকি লইতে অস্বীকৃত হন। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ অধিকারে আসে। ব্রহ্মদেশে ফরাসী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বিদূরিত হয়।

ফরাসী ভীতি ও ব্রহ্ম দেশে ইংরাজ নীতি

উত্তর ব্রহ্ম অধিকারের পর উত্তর ব্রহ্মে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ব্রহ্ম-চীন সীমান্ত অঞ্চল, ভামো প্রভৃতি স্থানে কাচিন, কারেন প্রভৃতি দুর্ধর্ষ উপজাতি বাস করে। ইহারা কোন আইন-শৃংখলা মানিয়া চলিতে রাজী ছিল না। ফলে ব্রহ্ম সীমান্তে গোলযোগ অব্যাহত থাকে।

ব্রহ্মদেশে অরাজকতা

ব্রহ্মদেশ অধিকারের পর ইন্দোচীন ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী শ্যাম দেশে (Thailand or Saim) ইঙ্গ-ফরাসী অধিকারের সীমা নির্ধারণের জন্য ইংরাজ সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শেষ পর্যন্ত উভয় শক্তি মেকং নদীকে পরস্পরের সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমা বলিয়া স্বীকার করে। ১৮৯৮ খ্রীঃ একটি ঘোষণা দ্বারা মেকং নদীকে ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের সীমানা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ইহার ফলে কার্যতঃ শ্যামদেশের অর্ধাংশ ইংরাজ কর্তৃত্বে চলিয়া আসে। ভারতের পূর্ব সীমান্তের প্রতিরক্ষার ঘাঁটি হিসাবে মেকং নদী চিহ্নিত হয়।

ব্রহ্ম প্রতিবেশী শ্যাম দেশে ইংরাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিব্বত নীতি

(Tibetan Policy)

ভারত-তিব্বত সম্পর্ক এবং লর্ড কার্জনের তিব্বত নীতি (Indo-Tibetan relation and Lord Curzon's Tibetan Policy) ঃ ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রতিবেশী রাজ্য তিব্বত অবস্থিত। তিব্বত দেশটি হিমালয়ের কোলে অবস্থিত। তিব্বতের সীমান্ত একদিক চীনের সহিত সংলগ্ন এবং অপর দিক ভারত ও নেপালের সহিত সংলগ্ন। কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম ও আসাম প্রভৃতি ভারতের অঞ্চলগুলি তিব্বতের সহিত সংলগ্ন। তিব্বতে যদি কোন প্রবল শক্তি ক্ষমতা বিস্তার করে তবে ভারতের সীমান্ত বিপন্ন হইবার

তিব্বতের গুরুত্ব

সম্ভাবনা রহিয়াছে। আফগানিস্থান যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তিব্বত সেইরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

তিব্বতের শাসন ব্যবস্থা

তিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। ভারত হইতে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। বাংলার দার্শনিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন এবং এই দেশেই দেহরক্ষা করেন। তিব্বতের শাসনকর্তা হিসাবে ধর্মগুরু দালাইলামা নির্বাচিত হইতেন। পাঞ্চেনলামা ও তাসিলামা তাঁহাকে শাসনকার্যে সাহায্য করিতেন।

তিব্বত-চীন সম্পর্ক

তিব্বতকে চীনের সামন্তরাষ্ট্র (vassal state) ও চীনের একটি প্রদেশ বলিয়া চীনের মাঞ্চু সম্রাটগণ দাবী করেন। তিব্বতের উপর দাবী স্থাপন করিবার জন্য ১৭১৮ খ্রীঃ চীনা সেনা তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করে এবং আম্বান নামে চীনা প্রতিনিধিকে দালাইলামার উপর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়োগ করে। কিন্তু তিব্বতের দালাইলামাগণও চীনের অধিকার পুরোপুরি মানিয়া লইতে গররাজি হন। ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিব্বত নামেমাত্র চীনের অধীনে থাকে। ১৭৯১ খ্রীঃ নেপালী গুর্খাগণ তিব্বত আক্রমণ করিলে তিব্বতীগণ চীনা সেনার সাহায্য লইয়া আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করে। এই আক্রমণের পিছনে ইংরাজের হস্তক্ষেপের সন্দেহ করিয়া তিব্বতকে নিষিদ্ধ দেশে পরিণত করা হয়। সকল বহিরাগতদের তিব্বতে প্রবেশ নিষেধ করা হয়।

তিব্বতের গুরুত্ব এবং এই দেশের সহিত বাণিজ্যের কথা চিন্তা করিয়া ১৭৭৪ খ্রীঃ ওয়ারেন হেস্টিংস তিব্বতে জর্জ বগলেকে দূত হিসাবে পাঠান। কিন্তু চীনের বিরোধিতায় তাঁহার দৌত্য বিফল হয়।

ইংরাজের তিব্বত নীতি

ইংরাজ সরকার ভারতের সীমান্তস্থিত তিব্বতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার উপর কড়া নজর রাখেন। বাঙালী অভিযানকারী শরৎচন্দ্র দাস ব্রিটিশ সরকারের গোপন সহায়তায় তিব্বতে গিয়া ভারত হইতে তিব্বতে যাতায়াতের রাস্তা ও মানচিত্র রচনা করেন। ভারত সরকার চীনের সম্মতি লইয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ তিব্বতে মেকলে (Macaulay) মিশন পাঠাইবার চেষ্টা করিলে তৎকালীন দালাইলামার বিরোধিতায় তাহা বিফল হয়। ব্রিটিশ সরকার সিকিম অধিকার করিবার পর সিকিম-তিব্বত সীমান্ত নির্ধারণের জন্য চীনের সহিত ১৮৯০ খ্রীঃ এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির বলে তিস্তা নদীকে তিব্বত-সিকিম সীমান্তের মধ্যবর্তী সীমা হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু তিব্বত সরকার এই শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভারতের অভ্যন্তরস্থ স্থান দাবী করেন এবং কোন কোন অঞ্চল হইতে করও আদায় করেন। এইভাবে ভারত-তিব্বত সীমান্তে গোলমাল দেখা দেয়।

লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হইলে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি তিব্বতের উপর পড়ে। তিব্বতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি ১৮৯৯ খ্রীঃ দালাইলামার নিকট প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু দালাইলামা এই চিঠি না লইয়া ফেরৎ দেন। ইতিমধ্যে তিব্বতে রুশ অনুপ্রবেশের খবর পাইয়া লর্ড কার্জন আতঙ্কিত হন। দোরজিয়েফ নামক জনৈক

মোঙ্গল জাতীয় ব্যক্তি ও রুশ প্রজা দালাইলামা ও রাশিয়ার জার সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া সংবাদ রটে। এই দোরজিয়েফ ছিলেন দালাইলামার শিক্ষক। গুজব রটে যে দোরজিয়েফের নেতৃত্বে তিব্বত হইতে তিনবার প্রতিনিধি দল পাঠান হইয়াছে। লর্ড কার্জন এই গুজবের সত্যাসত্য নির্ধারণ না করিয়া তিব্বতে ইংরাজ সামরিক মিশন পাঠাইবার জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র মিশনকে তিব্বত সীমান্তের ভিতরে খাম্বাজং-এ পাঠাইয়া আলাপ-আলোচনা করার নির্দেশ দেন। লর্ড কার্জন এই সতর্কতা নীতি না মানিয়া কর্ণেল ইয়ংহাজব্যান্ডের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সেনা-দল তিব্বতের রাজধানী লাসায় পাঠাইয়া দেন। সভ্যতায় পিছাইয়া পড়া তিব্বতীয়গণ তীর, ধনুক লইয়া গুরু নামক স্থানে এই মিশনকে বাধা দিলে ইংরাজ সেনার গুলির আঘাতে প্রায় ৬০০ তিব্বতী সেনা মারা পড়ে। দালাইলামা চীনে পলায়ন করেন। কর্ণেল ইয়ংহাজব্যান্ড ১৯০৪ খ্রীঃ লাসায় পৌঁছিয়া এক সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির দ্বারা—(১) গিয়াংসি ও গারটকে ইংরাজের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। (২) ভারত হইতে তিব্বতে আমদানী মালের উপর তিব্বত সরকারের শুল্ক আদায়ের নিয়ম রহিত হয়। (৩) চুম্বি উপত্যকা ইংরাজ অধিকারে আসে। (৪) তিব্বত সরকার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে অঙ্গীকার করেন। (৫) ইংরাজের বিনা অনুমতিতে তিব্বতে কোন দেশের দূত গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। (৬) তিস্তা নদী ধরিয়া সিকিম-তিব্বত সীমান্ত তিব্বত সরকার স্বীকার করেন।

লর্ড কার্জনের তিব্বত নীতি

অসহায় ও নির্বিরোধী তিব্বতীয়গণের উপর লর্ড কার্জনের রক্তাক্ত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের জন্য ইংলণ্ডে তীব্র সমালোচনা হয়। এদিকে রুশ ও চীন সরকার তিব্বতে ইংরাজ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানান। অহেতুক রুশ ভীতির অজুহাতে তিব্বতের স্বাধীনতায় আঘাত দেওয়ায় কার্জন নিন্দিত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ড ও রাশিয়া উভয় দেশ তিব্বতের নিরপেক্ষতা মানিয়া নেয়। উভয় দেশ চীনের মাধ্যমে তিব্বতের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে স্বীকৃতি দেয়। ইহার পর বৃটিশ সরকার ১৯০৪ খ্রীঃ সন্ধির কিছু শর্ত পাল্টাইয়া দেন। ইংরাজ সরকার ইহার পর আর তিব্বতে হস্তক্ষেপের কোন চেষ্টা করে নাই। লর্ড কার্জনের তিব্বত নীতিকে "মধ্য এশিয়ার বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের শেষ সঙ্গীত" (Swan song) বলিয়া ধরা হয়।

লর্ড কার্জনের নীতির সমালোচনা

তিব্বতে কোন বৃহৎ শক্তি হস্তক্ষেপ না করায় চীন এইদেশে একতরফা অধিকার স্থাপন করার সুযোগ পায়। যাহা হউক ১৯১৪ খ্রীঃ সিমলা চুক্তির দ্বারা চীন, তিব্বত ও ভারতের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ভারত-তিব্বত সীমান্ত নির্ধারিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ম্যাকমেহন লাইন নামে লাইন দ্বারা ভারত ও তিব্বত সীমান্ত স্থির হয়। কিন্তু চীনা সরকার এই চুক্তিকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে বিরত থাকে। ১৯৪৯ খ্রীঃ চীনে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পর তিব্বতের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লোপ করিয়া চীন তিব্বত অধিকার

চীনের তিব্বতে অধিকার স্থাপন

করে। দালাইলামা লাসা হইতে পলাইয়া স্বাধীন ভারত সরকারের আশ্রয় নেন। তিব্বতে চীনা অধিকার স্থাপিত হইবার ফলে ভারত-তিব্বত সীমান্ত লইয়া গোলমাল বাধে। ইহার ফলে ১৯৬২ খ্রীঃ ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ আসামের নেফা ও কাশ্মীরের লাদাক সীমান্তে হয়। এই সম্পর্কে পার্বত্য যুদ্ধে অপটু ভারতীয় সেনাগণ পরাজিত হইলে, চীন ভারতের বেশ কিছু স্থান অধিকার করিয়া ভারতের উপর একতরফা সন্ধি চাপাইয়া দেয়। ভারত সরকার এখনও এই সন্ধিকে আইনতঃ স্বীকৃতি দেন নাই।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

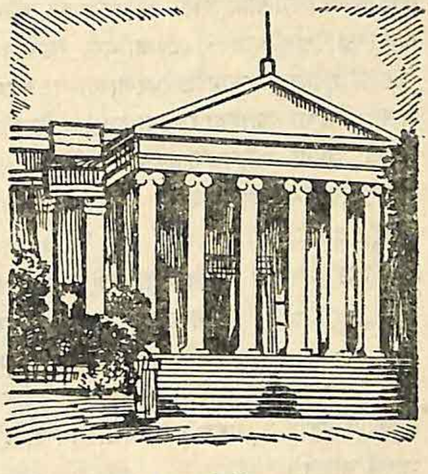
সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণ

(Cultural and Religious Revival)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি (Growth of University Education)ঃ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৫২ দেখ)। ভারতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে সুপারিশ করিয়া ১৮৫৪ খ্রীঃ বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড একটি ডেসপ্যাচ পাঠান। স্যার চার্লস উডের ডেসপ্যাচ বা নির্দেশনামাকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। উডের ডেসপ্যাচে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা ও বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী অনুদান দেওয়া এবং শিক্ষার দায়িত্ব বহন করিবার জন্য একটি সরকারী শিক্ষা দপ্তর স্থাপনের কথাও উডের ডেসপ্যাচে বলা হয়। উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী ১৮৫৭ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪শে জানুয়ারী ১৮৫৭ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, সিনেট নামক পরিচালক সভা গঠনের ব্যবস্থা হয়। প্রদেশের গভর্ণরগণ পদাধিকার বলে চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পান। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা, এঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরী বিদ্যার ফ্যাকাল্টি খোলা হয়। পঠন-পাঠনের দায়িত্ব কলেজগুলির উপর দেওয়া হয়। সরকারী, মিশনারী ও বেসরকারী কলেজগুলি পড়াইবার দায়িত্ব নেয়। যেহেতু বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন মান অনুযায়ী পড়ান হইত, তাহাতে মানের সমতা থাকিত না। উডের প্রস্তাব অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রগণের পড়ার মান

উডের ডেসপ্যাচ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

যাচাই করিয়া তাহাদের উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করার ব্যবস্থা হয়। স্কুলগুলিতে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় ভারতে মাত্র দুইটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল—একটি হইল রুরকি কলেজ এবং অপরটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৮৮০ খ্রীঃ এই কলেজ শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোরে একটি করিয়া মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। অধিকাংশ কলেজগুলিতে কলা ও বিজ্ঞান পড়ান হইত। ১৮৫৭ খ্রীঃ সারা ভারতে মোট ২৭টি কলেজ ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ কলেজের সংখ্যা বাড়িয়া ৭২-এ দাঁড়ায়।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বাড়িলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ বাড়ে। এই চাপ কমাইবার জন্য ১৮৮২ খ্রীঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লর্ড রিপন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সুপারিশ করিবার জন্য হাণ্টার কমিশন (১৮৮২ খ্রীঃ) নিয়োগ করেন। হাণ্টার কমিশন কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সতর্কতার সহিত স্বায়ত্ব শাসন দান এবং কলেজগুলিতে একটি নির্দিষ্ট হারে ছাত্র বেতন আদায়ের সুপারিশ করেন। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দানের কথা বলা হয়। তাছাড়া হান্টার কমিশন বেসরকারী কর্মসমিতির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার সুপারিশ করে। সরকার কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ মোটামুটি লইলেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই। যাহা হউক ইতিমধ্যে মেট্রোপলিটান ইনটিটিউশন, সিটি কলেজ, রিপণ কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজ প্রভৃতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

লর্ড কার্জন বড়লাটের পদে নিযুক্ত হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির বিষয়ে বিশেষ নজর দেন। লর্ড কার্জন মনে করিতেন যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনার মান খুব নীচু স্তরের। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্ব শাসন নষ্ট করিয়া ইহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ান।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা নীতি

লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির কাজকর্ম পরিদর্শন করিয়া ইহার উন্নতির সুপারিশ করিবার জন্য স্যার টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ (১৯০২ খ্রীঃ)

করেন। এই কমিশনের ভারতীয় সদস্য ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামি। র‍্যালে কমিশনের রিপোর্ট পাইবার পর ১৯০৪ খ্রীঃ লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন। এই আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকোত্তর পঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার রাখার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সরকার মনোনীত ফেলো বা সভ্যগণের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের গৃহীত আইনকে সরকারের নাকচ অথবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখা হয়। কলেজগুলির অনুমোদন দানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়ান হয়। কলেজ পরিদর্শনের জন্য ইনস্পেক্টর অফ কলেজ নিযুক্ত হয়।

কার্জনের সংস্কার

লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াইলে জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ইহার তুমুল সমালোচনা করা হয়। যাহা হউক, ১৯০৪ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে স্নাতকোত্তর পঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকায় স্যার আশুতোষ মুখার্জী ইহার সুযোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের বিরাট উন্নতি সাধন করেন।

সমালোচনা

১৯১৭ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতিকল্পে স্যার মাইকেল স্যাডলারের সভাপতিত্বে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইহার অন্যতম সভ্য। স্যাডলার কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করে—(১) স্কুলের শিক্ষা শেষ করিবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে দুই বৎসর কাল মধ্যবর্তী শিক্ষার প্রচলন। (২) তিন বৎসরের জন্য ডিগ্রী কোর্স প্রচলন। (৩) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রবর্তন। (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরীর উচ্চতম কোর্স প্রবর্তন। ইহার পর ১৯১৬-২১ খ্রীঃ মধ্যে সাতটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় যথা কাশী, পাটনা, ঢাকা, মহীশূর, আলিগড় প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। ইহা ইন্টারমিডিয়েট বা মধ্যবর্তী পাঠক্রম উঠাইয়া দিয়া ১২ বৎসরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুপারিশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের ডিগ্রী পাঠক্রমের সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশন স্থাপনের কথাও বলা হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে স্বাধীন ভারত সরকার ১২ বৎসর মাধ্যমিক ও ৩ বৎসর ডিগ্রী কোর্স চালু করেন। বর্তমানে এই ব্যবস্থার পুনরায় পরিবর্তন করিয়া ১০+২+৩ অর্থাৎ ১০ বৎসর স্কুল, ২ বৎসর মাধ্যমিক ও ৩ বৎসর ডিগ্রী প্রথা চালু করা হইয়াছে। বৃত্তিমুখীন শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনাও নেওয়া হইয়াছে।

১৯১৭ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বর্তমান অবস্থা

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার (Female Education)ঃ ঊনবিংশ শতকে ভারতে নব-জাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্ত্রী স্বাধীনতার প্রচলন। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত

নারীগণ সমাজে আপন স্থান পাইবেন না ইহা বুঝিয়া মানবতাবাদী ব্যক্তিগণ স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নারী মুক্তির জন্য জাতিকে শুনান, "নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা ?" স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে খ্রীষ্টান মিশনারী, ব্রাহ্ম সমাজ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নেন (তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬২ দেখ)। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, ফিমেল-জুভেনাইল সোসাইটি প্রভৃতি সমিতি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগ্রণী হয়। ক্রমে জনসাধারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে।

স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা

ব্রাহ্ম সমাজ বিভিন্ন পত্রিকার দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। বামাবোধিনী, অবলা বান্ধব, মহিলা, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে এই চেষ্টা চালান হয়। ইহার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্য সমাজও পাঞ্জাবের জলন্ধরে কন্যা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করে। বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজ ও ডেকান এডুকেশন সোসাইটিও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সংকল্প নেয়।

ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজের ভূমিকা

কলিকাতায় ড্রিংকওয়াটার বেথুন দ্বারা ১৮৪৯ খ্রীঃ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল পদক্ষেপ বলিয়া গণিত হয়। এই বিদ্যালয় ক্রমে বেথুন কলেজে পরিণত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হন। এছাড়া মদনমোহন অর্থলংকার, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয় স্থাপনে আনুকূল্য করেন। ক্রমে সরকার বেথুন স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ এই বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। ১৯৭৮ খ্রীঃ বেথুন কলেজের শত-বার্ষিকী পালিত হইয়াছে। বেথুনের প্রচেষ্টা ছাড়া স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি নিজ চেষ্টায় মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টা সরকারের ঔদাসীন্যকে ভঙ্গ করে। ১৮৫৪ খ্রীঃ চার্লস উড তাঁহার ডেসপ্যাচের ৮৩ নং অনুচ্ছেদে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে সরকারকে আগ্রহী হইতে নির্দেশ দেন। বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী অনুদান দেওয়া আরম্ভ হয়। এদিকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টায় শহর ও গ্রামাঞ্চলে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ সমগ্র ভারতে ১৬৪০টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ইহাদের অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাংলা ও মাদ্রাজে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী ছিল। বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতির খরচ নির্বাহের জন্য পৌরসভাগুলি স্থানীয় কর আদায় করিয়া যাহাতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে এজন্য শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করে। সরকারী অনুদানও বালিকা বিদ্যালয়ে উদারভাবে দেওয়া হয়। ফলে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়। ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভেরও সুযোগ পায়। ১৯০২ খ্রীঃ

বেথুন বিদ্যালয় ও সরকারী নীতি

সারাদেশে প্রায় ১২টি মহিলা কলেজ ছিল। ১৯১৬ খ্রীঃ পুনায় একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া কলেজে সহশিক্ষার সুযোগও দান করা হয়। মিশনারীগণ মহিলা কলেজ স্থাপন ও সহশিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা নেন। তবুও একথা বলা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নাই।

মাতৃভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষা (Vernacular and Primary Education) ঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান দেশের উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক একথা ইংরাজীনবিশ শিক্ষিত লোকেরা প্রথমে বলিতে পারে নাই। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক মাতৃভাষা শিক্ষার তদন্তের জন্য উইলিয়াম এ্যাডমসকে নিয়োগ করেন। এ্যাডমস রিপোর্টে মাতৃভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

এ্যাডমস রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার বিবরণ

এ্যাডমসের এই রিপোর্টের নাম ছিল "মাতৃভাষা বা প্রাথমিক শিক্ষা রিপোর্ট।" এ্যাডমস রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষালাভের প্রথা ছিল। স্কুল বা বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজস্ব বাড়ি বলিতে কিছুই ছিল না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন নির্দিষ্ট মান ছিল না এবং ছাত্র-দত্ত বেতনের উপরই শিক্ষক বা গুরু মহাশয়গণের উদরান্নের সংস্থান হইত। পাঠশালাগুলিতে বাংলা পড়িতে, লিখিতে ও পাটীগণিতের সাহায্যে হিসাব রক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহারা ইহার বেশী শিক্ষালাভ করিতে আগ্রহী ছিল তাহাদের আরও দুই বৎসর ধরিয়া বাংলা ভাষা, পত্র লিখন, দলিল লিখন প্রভৃতি কাজ শিখান হইত। ছাপা বই প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। সমগ্র জনসংখ্যার ৫½% ছিল অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন। বাকি সকলে ছিল নিরক্ষর। স্ত্রী শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ইহা ছাড়া টোল ও মাদ্রাসায় যথাক্রমে সংস্কৃত ও ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এ্যাডমস প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দেন।

১৮৫৪ খ্রীঃ উডস ডেসপ্যাচে সর্বপ্রথম মাতৃভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়। উডস ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী মাতৃভাষার মাধ্যমে স্কুলে শিক্ষা-দানের উপর জোর দেওয়া হয় এবং জেলাগুলিতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য

উডস ডেসপ্যাচ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

সরকারের তরফে চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে, যথা প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয় (Vernacular School), মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। এই সকল বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার সহিত মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তবুও সরকার শিক্ষাখাতে উপযুক্ত অর্থ না দেওয়ায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই কম হয়। বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৮৭১ খ্রীঃ পর সরকার প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে বেশী নজর দেন। ১৮৭২ খ্রীঃ বাংলা সরকার প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়ের জন্য ৪ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ ভারতে ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ তাহা বাড়িয়া প্রায় ৮৩ হাজারে পেঁছায়।

লর্ড রিপনের আমলে হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রাথমিক ও মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, অন্য সকল স্তরের শিক্ষা অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দান করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়ার জন্য এই কমিশন সুপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি এমনভাবে করিতে বলা হয় যে, যাহার ফলে এই শিক্ষা বাস্তব জীবনের উপযোগী হয়। পৌরসংস্থাগুলির রাজস্বের একাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করিবার সুপারিশ করা হয়; প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম সরকারী পরিদর্শকের দ্বারা পরিদর্শন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দানের কথাও বলা হয়। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে মাতৃভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৯১৩ খ্রীঃ ভারত সরকার এক নির্দেশনামার দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে আরও চেষ্টা করিতে নির্দেশ দেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ পর প্রাদেশিক সরকারগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে 'বুনিয়াদী শিক্ষা' অথবা হাতের কাজ ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার চেষ্টা আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হইয়াছে। বর্তমানে ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী "কর্মভিত্তিক শিক্ষা" (work education) ও মাতৃভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

হাণ্টার কমিশন ও লর্ড রিপনের সংস্কার: প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

কারিগরী শিক্ষা (Technical Education): ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার হইলেও সাধারণভাবে কেতাবী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। কেতাবী শিক্ষা দ্বারা ছাত্ররা শুধুমাত্র চাকুরীজীবিতে পরিণত হয়। কারিগরী ও হাতে-কলমে কোন কাজ শিক্ষা করা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যার প্রসার ঊনবিংশ শতকে খুব বিস্তৃত হয় নাই। যাহা হউক ১৮৩৫ খ্রীঃ কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় এবং মধুসূদন গুপ্ত নামে এক প্রগতিবাদী ছাত্র সামাজিক কুসংস্কার কাটাইয়া মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া শল্যবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং ১৮৪১ খ্রীঃ ইহার স্ত্রী বিভাগ খোলা হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ মাদ্রাজ মেডিক্যাল স্কুল ও ১৮৪৫ খ্রীঃ বোম্বাইয়ে গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ বাংলায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৮০ খ্রীঃ ইহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনিয়া শিবপুরে বর্তমান গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। এছাড়া লর্ড ডালহৌসীর আমলে রুরকিতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও স্থাপিত হয়। ইহার পর পুনায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। লর্ড কার্জন কারিগরী শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি মিঃ ফিপ্স (Phipps) নামে জনৈক মার্কিন ভদ্রলোকের নিকট হইতে ৩০০০০ পাউণ্ড দান পাইয়া বিহারের পুসাতে ভারতের প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপন করেন। পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপভাবে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। ক্রমে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ স্থাপন করেন। যাহা হউক বৃত্তিমুখী কারিগরী

চিকিৎসা ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার

শিক্ষার প্রচলন ইংরাজ শাসনের যুগে যথোপযুক্ত হয় নাই। স্বাধীন ভারত সরকার এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। পশ্চিম বাংলার যাদবপুরে, খড়্গপুরে, মাদ্রাজে, কানপুরে উন্নত মানের কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন
(Sir Syed Ahmed Khan and Aligarh Movement)

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জাগরণ (Sir Syed Ahmed Khan and Muslim Renaissance) : ইংরাজেরা মুসলিম শাসন উচ্ছেদ করিয়া ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার ফলে ভারতীয় মুসলিমগণ ইংরাজের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি বিরাগ দেখায়। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা না করিয়া তাহারা পুরাতন ফার্সী ও আরবী ভাষা শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখে। মুসলিম সম্প্রদায় ইংরাজী শিক্ষাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহা হইতে দূরে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে মুসলিম অভিজাতগণ বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় ইংরাজ সরকারও সরকারী চাকুরীগুলিতে মুসলিমগণকে নিয়োগ করার পরিবর্তে হিন্দু নিয়োগে পক্ষপাত দেখান। ইহার ফলে মুসলিম অভিজাতকুল শাসন ক্ষমতা হারাইয়া বিষহীন চোড়া সাপে পরিণত হন। এদিকে যুগের উপযোগী আধুনিক শিক্ষা না পাইয়া ভারতীয় মুসলিম সমাজ ক্রমে পিছাইয়া পড়ে। ১৮৭৭ খ্রীঃ ভারতে ১৬৫২ জন হিন্দু গ্রাজুয়েট থাকিলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র ২৬ জন গ্রাজুয়েট ছিল। উইলিয়াম হাণ্টার তাঁহার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস (Indian Mussalmans) নামক গ্রন্থে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতা ও অসন্তোষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিরূপতা

রাজা রামমোহন রায় যেরূপ ভারতীয় হিন্দু সমাজে আধুনিক ভাবধারা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া নবজাগরণের সূচনা করেন, স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম সমাজে সেইরূপ জাগরণের সূত্রপাত করেন। পিছাইয়া পড়া মুসলিম সমাজের দুরাবস্থা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। মুসলিম সমাজে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার হাওয়া না ঢুকাইলে ইহাদের উন্নতির কোন আশা নাই ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। সরকারী চাকুরীর সিংহভাগ ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুগণ পাইয়া প্রশাসন যন্ত্রকে হাতে আনিয়া ফেলিতেছে ইহা তাঁহার চোখে পড়ে। এজন্য স্যার সৈয়দ মুসলিমগণকে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানান। তাছাড়া তিনি মুসলিম সমাজের কুসংস্কার

স্যার সৈয়দ আহমদের মতামত

দূর করার কথাও বলেন। পুরাতনপন্থী মৌলভী ও উলেমাগণ তখনও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের মতে ইহা ছিল বিজাতীয় শিক্ষা। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ইসলামীয় সমাজে অবক্ষয় দেখা দিবে। ইংরাজী শিক্ষিত মুসলিমগণ ইসলামের নীতি ও আচার ত্যাগ করিবে বলিয়া তাঁহারা ভীত হন। স্যার সৈয়দকে গোঁড়া রক্ষণশীল মৌলভী ও উলেমাগণের তীব্র বিরোধিতার মোকাবিলা করিতে হয়। এমন কি এজন্য তাঁহার প্রাণও বিপন্ন হয়। কিন্তু সৈয়দ ইহাতে দৃকপাত না করিয়া তাঁহার আদর্শে অবিচল থাকেন।



স্যার সৈয়দ আহমদ খান

স্যার সৈয়দ আহমদের জীবনকথা

স্যার সৈয়দ আহমদের জন্ম হয় ১৮১৭ খ্রীঃ উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলিতে। তিনি প্রথম জীবনে কিছুকাল মুঘল বাদশাহের দপ্তরে চাকুরী করেন। এই সময় তিনি কিছু পরিমাণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে তিনি ইংরাজ সরকারে চাকুরী নেন এবং মুন্সেফের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজ কর্মচারীগণের প্রাণ রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ইংরাজের সুনজরে পড়েন। তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের কারণ বিচার করিয়া একটি পুস্তিকা রচনা করেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলিম সমাজের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বিরূপ মনোভাব পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাম। স্যার সৈয়দ

মুসলিমগণের জন্য ইংরাজের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা

জানিতেন যে ইংরাজ সরকারের সহানুভূতি ও সাহায্য ছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। মুসলিম সমাজ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ইংরাজ বিরোধী আন্দোলনের সামিল না হইয়া যাহাতে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য ইংরাজের প্রতি অনুগত হয় সেজন্য তিনি চেষ্টা করেন।[১] এজন্য তিনি মুসলমান সমাজকে কংগ্রেস আন্দোলন হইতে দূরে থাকার পরামর্শ দেন।

স্যার সৈয়দ মুসলিম সম্প্রদায়কে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা বাদ দিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে আহবান জানান। তিনি বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে কোরানে কোন নির্দেশ নাই। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারকল্পে ১৮৬৪ খ্রীঃ তিনি গাজীপুরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল ১৮৭৭ খ্রীঃ আলিগড়ে এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা। এই কলেজ শেষ পর্যন্ত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই

১, British Paramountcy and Indian Renaissance.

কলেজকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণ ঘটে। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমনই আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম সম্প্রদায়ের জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অক্সফোর্ড বা কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে আলিগড়কে একটি আবাসিক কলেজে পরিণত করা হয়। মুসলিম ছাত্র সমাজের চিন্তাধারা ও মতবাদ গঠনে এই কলেজ ও তাহার ইংরাজ অধ্যাপকগণ বিশেষতঃ, এই কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ থিওডোর বেক বিশেষ ভূমিকা নেন। আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে মুসলিম সমাজের মধ্যে আলিগড় আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহবান করিয়া মুসলিম সমাজের নেতাগণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করেন। এইভাবে পিছাইয়া পড়া মুসলিম সমাজে তিনি নব-জীবনের প্রবাহ সঞ্চার করেন।

আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা : মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার

স্যার সৈয়দ প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে ভারত মাতার দুই চক্ষুর সহিত তুলনা করেন। কিন্তু পরে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক রফিক জ্যাকেরিয়ার মতে স্যার সৈয়দের এই ধারণা হয় যে দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার চলন হইলে শিক্ষায় অগ্রসর ও সংখ্যায় বেশী হিন্দুরা সকল ক্ষমতা অধিকার করিবে। মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষমতায় বঞ্চিত হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হইবে। এই আশংকার জন্য তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক, স্বশাসন দাবীর সামিল না হইয়া ইংরাজের অনুগত থাকিবার জন্য উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, আপাততঃ ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার দরকার নাই। দ্বিতীয়তঃ, স্যার সৈয়দ ভারতের হিন্দু ও মুসলিমগণ একটি জাতি কংগ্রেসের এই আদর্শের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান হইল দুই পৃথক জাতি। পাইওনিয়ার পত্রিকা, আলিগড় গেজেট পত্রিকায় তিনি জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা ও কংগ্রেস নেতাগণের সহিত বিতর্কে নামিয়া পড়েন। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক তাঁহাকে এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেন। তিনি বলেন যে ভারতের হিন্দু ও মুসলিম হইল দুই পৃথক জাতি। তৃতীয়তঃ, মুসলিম স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে সকল বিষয়ে ইংরাজের সহযোগিতা এবং কংগ্রেসের বিরোধিতাকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি মনে করিতেন যে কংগ্রেসের স্বায়ত্ব শাসন দাবী গৃহীত হইলে হিন্দুগণই ক্ষমতা পাইবে। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাগণ স্যার সৈয়দ আহমদকে বহু বুঝাইলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক মত; সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৮৮ খ্রীঃ আলিগড়ে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ইহাতে মুসলিম সভ্যের সংখ্যা অধিক হইলেও কিছু হিন্দুকেও সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই সমিতি স্থাপন করিয়া স্যার সৈয়দ ইহা প্রচার করেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ভারতীয় জনতার একমাত্র মুখপাত্র নয়। তিনি এই সমিতির দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতা

মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র দাবী

খর্ব করার চেষ্টা করেন। ইহার পশ্চাতে ইংরাজের প্ররোচনা ছিল সন্দেহ নাই। এই সমিতি ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানায়। স্যার সৈয়দ ইহার পর মুসলিম এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েশন (১৮৯৩ খ্রীঃ) স্থাপন করিয়া মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দাবী তুলিয়া ধরেন। সৈয়দ আহমদ মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বার্থ ও দাবী লইয়া কংগ্রেস নেতা বদরুদ্দিন তায়েবজী ও অক্টোভিয়ান হিউমের সহিত প্রকাশ্য বিতর্ক করেন। স্যার সৈয়দ বলেন যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নীতি দ্বারা মুসলিম সমাজের মঙ্গল হইবে না।

কৃতিত্ব

স্যার সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টার ফলেই ভারতীয় মুসলিমগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও ভাবধারা প্রবেশ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। মুসলিম ধর্মাবলম্বীগণের নবজাগরণে তাঁহার অবদান তর্কের ঊর্ধে। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ে সমাজ সংস্কারের জন্যও চেষ্টা করেন। তবে তাঁহার অন্ধ ইংরাজ ভক্তি ও ইংরাজী সভ্যতার প্রতি মোহ অত্যন্ত বেশী ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রকৃত মূল্য তিনি উপলব্ধি না করিয়া ইংরাজের সমস্ত কিছুকেই শ্রেষ্ঠ বলেন।[১] দ্বিতীয়তঃ, স্যার সৈয়দ আহমদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি বিরোধিতার সুযোগ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজেরা গ্রহণ করে। ইংরাজ বলিতে থাকে যে জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র নহে। কোন কোন লেখক মনে করেন যে স্যার সৈয়দ হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের দ্বারা যে বিভেদের প্রাচীর তুলেন তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্তান সৃষ্টি হয়।[২]

আলিগড় আন্দোলন (Aligarh Movement)ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খান পিছাইয়া-পড়া ভারতীয় মুসলিম সমাজের ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খ্রীঃ আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এই কলেজ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হয়। মুসলিম সমাজের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এই কলেজ হইতে প্রচার চলে। মুসলিম সমাজে আধুনিক ভাবধারা প্রসারে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করে। ইহার ফলে মুসলিম সমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়।

আধুনিক শিক্ষা বিস্তার

আলিগড় আন্দোলনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ইংরাজ সরকারের সহিত ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। স্যার সৈয়দ আহমদ মনে করিতেন যে শিক্ষা ও চাকুরীতে আগাইয়া থাকা হিন্দু সমাজের সহিত পিছাইয়া পড়া মুসলিম সমাজের জন্য সমান অধিকার আদায় করিতে হইলে ইংরাজের সহযোগিতা দরকার। তিনি ইংরাজ সরকারকে ইহা বুঝান যে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়

১. Ram Gopal—How India Struggled for Freedom.

১. British Paramountcy and Indian Renaissance.

ততটা দায়ী নন। তিনি মুসলিমগণকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের জন্য আহবান জানান।[১] ঐতিহাসিক হাণ্টারের মতে স্যার সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টায় ইংরাজ সরকারের সহিত মুসলিমগণের সমঝোতা বাড়ে।[২] আলিগড় কলেজ হইতে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ সহজে সরকারী চাকুরী পাইতে থাকে। ইহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ প্রচার করে।

ইংরাজের প্রতি আনুগত্য

স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্থলে হিন্দু-মুসলিম দুই পৃথক জাতি এই তত্ব প্রচার করেন। প্রথম দিকে স্যার সৈয়দ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলিলেও পরে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। অশোক মেহতা প্রভৃতি লেখক মনে করেন যে স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেকের (Theodore Beck) প্রভাবে মুসলমান সমাজের পৃথক অধিকারের কথা বলেন। থিওডোর বেক আলিগড় আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সঞ্চার করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে কেবলমাত্র থিওডোর বেকের প্রভাবেই স্যার সৈয়দ হিন্দু-মুসলিম পৃথক অধিকারের কথা বলেন কিনা তাহা বলা যায় না।

দ্বিজাতিতত্ব : মুসলিম সমাজের পৃথক অধিকার দাবী

আলিগড় আন্দোলনের মূল কথা এই ছিল যে ভারতীয় মুসলিম সমাজের স্বার্থ, হিন্দুগণ হইতে পৃথক। পাইওনিয়ার পত্রিকা, আলিগড় ইনষ্টিটিউট গেজেটের মাধ্যমে স্যার সৈয়দ মুসলিম সম্প্রদায়কে এই কথা বলেন। থিওডোর বেকও পাইওনিয়ার পত্রিকার মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ব প্রচার করেন। থিওডোর বেক আরও বলেন যে ভারতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী চাকুরীর প্রার্থী নির্বাচন করা হইলে অধিকাংশ চাকুরী শিক্ষায় উন্নত হিন্দুরা অধিকার করিবে। এজন্য মুসলিমদের প্রতিবাদ করা দরকার। ইহার উত্তরে এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম, থিওডোর বেককে বলেন যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান নাই। আলিগড়ের সংকীর্ণ স্থানে বসিয়া তিনি এক অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।[৩] ভারত-বাসীর সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ঐক্যের তিনি খবর রাখেন না। থিওডোর বেকের পর, অধ্যক্ষ মরিসন ও আর্চিবল্ডও, বেকের ন্যায় সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেন।

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থিওডোর বেকের প্রভাব

আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ইংলণ্ডে ও ভারতে ইহাই প্রচার করা হয় যে জাতীয় কংগ্রেস কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে না। কংগ্রেসের শাসন সংস্কারের দাবীর পশ্চাতে মুসলিম সমাজের সমর্থন নাই। কংগ্রেসের পাল্টা সংগঠন হিসাবে আলিগড়ের নেতারা ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার সৈয়দ ইহাও বলেন যে কংগ্রেসের

কংগ্রেস বিরোধিতা ও শাসন সংস্কার দাবীর বিরোধিতা

১. British Paramountcy and Indian Renaissance.

২. Hunter—Indian Mussalmans.

৩. R. Jacharia—Muslims in India.

পার্লামেণ্টারী শাসনের দাবী ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে। তাঁহার ভয় ছিল যে পার্লামেণ্টারী শাসন চালু হইলে পিছাইয়া-পড়া মুসলমান সমাজের হাত হইতে শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবে।

আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব মুসলিম অভিজাত ও যুব সমাজের উপর গভীরভাবে পড়ে। যদিও বেশ কিছু সংখ্যক স্বচ্ছ দৃষ্টি, জাতীয়তাভাবসম্পন্ন মুসলিম নেতা কংগ্রেসের পতাকার নীচে আসেন তবুও মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ বড় অংশ আলিগড় আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকেন। এই আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে যে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক ক্ষত সৃষ্টি করে তাহা পরিণামে ভারত ব্যবচ্ছেদ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাধি লাভ করে। উগ্র হিন্দুরা শিবাজী উৎসব ও ভারতমাতাকে দেবীরূপে কল্পনা করিলে উগ্র মুসলমানেরা ইহাতে প্রতিবাদ জানায়। চতুর ইংরাজ সরকার হিন্দু-মুসলিম বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করিয়া দেয়। তবুও একথা সত্য যে আলিগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নূতন জীবন প্রবাহের সঞ্চার করে। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ভুল হইলেও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য ছিল ধ্রুব।

আলিগড় আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণাম ঃ জাতীয়তাবাদের ক্ষত সৃষ্টি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিবাদী সাহিত্য ও সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব ঃ বঙ্কিম—রবীন্দ্রনাথ

(Literature of Protest and Patriotism Bankim to Rabindranath)

প্রতিবাদী ও দেশাত্মবোধক সাহিত্য (Protest and Patriotism in Literature) ঃ জাতীয় সাহিত্য ছাড়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয় না। স্বদেশবাসীর ধ্যান-ধারণা সাহিত্যেই প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের মাধ্যমেই জাতির পরাধীনতার মর্মবেদনা প্রকাশিত হয় এবং স্বদেশ মন্ত্র ছড়াইয়া পড়ে। কবি ঈশ্বর গুপ্তই হইলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি যিনি তাঁহার কবিতাবলীতে স্বদেশ ধর্ম ও স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচার করেন। তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় ইংরাজ দ্বারা ভারতবর্ষের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লক্ষ্য করেন যে কিছু ইংরাজী শিক্ষিত দেশবাসী ভারতীয় ভাব ও আদর্শকে ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাব ও জীবনধারাকে সার

সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ঈশ্বর গুপ্ত

করিয়াছেন। ইহারা যে পথে চলিয়াছেন তাহার ফলে ভারতীয়গণ নিজ স্বদেশ ও সভ্যতা সম্পর্কে হীনমন্যতায় ভুগিতে থাকিবে। ইহাদের খাদহীন ইংরাজ ভক্তি ও হীনতা লক্ষ্য করিয়া কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলেন যে—"তুমি মা কল্পতরু; আমরা সব পোষা গরু" ইত্যাদি। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার স্তম্ভে ঈশ্বর গুপ্ত নির্ভীকভাবে স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করিয়া বলেন—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

ডিরোজীও

ডিরোজিও একদিকে কুসংস্কার ও সামাজিক আচরণকে যেমন তীব্র আঘাত করেন, তেমনই অপরদিকে তাঁহার ইংরাজী কবিতায় স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দেন। ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিরোজিওর—"স্বদেশের প্রতি" কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন। সেই অনবদ্য অনুবাদের একটি অংশ এই—

"কোথায় সে বন্দ্যপদ। মহিমা কোথায়।
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়"।

ভারতের অতীত গৌরবের অস্তগমন সম্পর্কে ডিরোজিওর দীর্ঘ নিঃশ্বাস আমরা এই কবিতার চরণে উপলব্ধি করিতে পারি।

নব্যবঙ্গ দলের সাহিত্য
মাইকেল মধুসূদন

পরাধীনতায় গ্লানি, ইংরাজ শাসনের অত্যাচার ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত ভারতবাসীকে সজাগ করিয়া তুলে। অপরদিকে দেশবাসীর মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, সামাজিক কুপ্রথা তাহাদের ব্যথিত করে। নব্যবঙ্গ দল তাহাদের প্রাথমিক উগ্রতা কাটাইয়া যুক্তিবাদের আলোকে সমাজ-সংস্কার ও শাসন সংস্কারের কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করেন। জ্ঞানান্বেষণ, এনকুয়েরার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। নব্যবঙ্গের শিরোমণি মধুকবি মাইকেল মধুসূদন ইংরাজী সাহিত্যের অঙ্গন ছাড়িয়া বাংলা ভাষার অঙ্গনে সোনার ফসল ফলাইতে আরম্ভ করেন। কবিবর মধুসূদনের

"রেখো মা, দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে···"

এবং "বঙ্গ ভাষার প্রতি" কবিতায়—

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন···"

প্রতি বাঙালীর হৃদয়ে স্বদেশ প্রীতি জাগায়। কেহ কেহ মনে করেন যে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদ চরিত্র বাংলার জাগ্রত চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাবের প্রতীক। এই মেঘনাদ অন্যায় মাথা পাতিয়া না লইয়া জীবনপণ সংগ্রাম চালায়। বাংলার জাগ্রত যৌবন মেঘনাদ চরিত্রে রূপ পায়।

কবি শ্রীমধুসূদন বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যে বীজ রোপণ করেন উত্তরকালে তাহা ফুলে ফলে ভরিয়া উঠে। রঙ্গলাল ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর তাঁহার বিখ্যাত গান

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" রচনা করেন। তাছাড়া রঙ্গলালের কর্মদেবী প্রভৃতি নাটকে স্বদেশপ্রেমের প্রভাব দেখা যায়। দীনবন্ধু নীলদর্পণ নাটকে নীলকর সাহেবগণের নৃশংস অত্যাচারের যে জ্বলন্ত ছবি আঁকেন তাহা দেশবাসীকে শিহরিত করে। পাদ্রী লং সাহেবের নামে এই নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে মাইকেল মধুসূদন এই অনুবাদ কার্য করেন। লং সাহেবের নামে তাহা প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগে। লং সাহেবকে বিচারালয়ে জরিমানা করা হইলে কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই জরিমানার টাকা দেন। লং সাহেবের এক মাস জেল হইলে বাংলার কবি গান বাঁধেন—

রঙ্গলাল : দীনবন্ধু

"নীল বানরে সোনার বাংলা করল এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার।"

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলীও স্বাদেশিকতা প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক প্রভৃতি গ্রন্থ স্বদেশপ্রেমে সমুজ্জল। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার মাধ্যমে জাতির জাগরণের চেষ্টা করেন। ইহার পর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চে রাজোচিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মহাভারতের বীর অর্জুনের অপর নাম ছিল সব্যসাচী। তিনি দুই হাতে শর ও অস্ত্রচালনা করিতেন বলিয়া এই নাম পান। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী। উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা সকল বিভাগেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিম স্বদেশপ্রেমকে আবেগে সিঞ্চিত করিয়া বাঙালীর ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দেন। আনন্দমঠের সন্তানদল ছিল দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত-প্রাণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দল। দেশমাতাকে মাতৃরূপে বন্দনা করিয়া তাঁহার মুক্তির কথা বঙ্কিম আনন্দমঠের মাধ্যমে প্রচার করেন। স্বদেশপ্রেমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম একথা বঙ্কিম স্বামী সত্যানন্দের মুখ দিয়া বলান। আনন্দমঠের স্বদেশমন্ত্র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত ভারতবাসীর ঘরে ঘরে জাতীয় মন্ত্ররূপে ছড়াইয়া পড়ে। "সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্য শ্যামলা ..." দেশমাতার রূপ জাতির মনের পটে পাকা রং-এ আঁকা হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস জাতিকে তাহার অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবীচৌধুরাণীতে ভবানী পাঠকের মুখে "নিষ্কাম কর্মের" বাণী জাতির হৃদয়কে মথিত করে। দেবীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি জাতিকে আত্মবলে বলীয়ান করে। বঙ্কিমের কমলাকান্ত শর্মা আফিং দেবী হইলেও সত্যদ্রষ্টা। শিক্ষিত ভারতীয়গণের ইংরাজীয়ানার মোহ এবং চাকুরীজীবির প্রতি কমলাকান্তের কটাক্ষময় উক্তি জাতিকে সচকিত করে। বঙ্কিম কমলাকান্তের মুখ দিয়া বিধবা বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতার বাণী এবং অন্ধ ইংরাজীয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।[১] বঙ্কিমের বিভিন্ন প্রবন্ধ যথা "বাঙলার ইতিহাস", "ভারতের স্বাধীনতা" প্রভৃতি তাঁহার গভীর মননশীলতা ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র :
বিবেকানন্দ

১. A. Tripathy—Extremist Challenge.

বঙ্কিমের রচনায় দেশাত্মবোধের যে জাগরণ ঘটে তাহা অপ্রতিহত গতিতে আগাইয়া চলে। হেমচন্দ্র জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, গ্রীস ও রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে। তিনি প্রকারান্তরে বলেন যে ইতিহাসের নিয়মে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটিবে। ইলবার্ট বিল বিতর্কে হেমচন্দ্র জাত্যাভিমানী ইংরাজকে ধিক্কার দিয়া "নেভার, নেভার" নামক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যেও স্বদেশাভিমানের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে পলাশীর প্রান্তরে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতার অবসানের যে মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকেন তাহা জাতিকে শিহরিত করে। নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন তাহা বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়া কুরুক্ষেত্র কাব্যেও ভারতের ঐক্যের আদর্শ প্রচার করা হয়।

হেমচন্দ্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার প্রবর্তন করিলে স্বদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন জোয়ার দেখা দেয়। নবগোপাল মিত্র মহাশয় "ন্যাশন্যাল" কথাটির উপর এমনই জোর দিয়া সর্বদা শব্দটি ব্যবহার করিতেন যে রসিক বাঙালী তাঁহার নাম রাখে "ন্যাশন্যাল মিত্তির"। হিন্দুমেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেয় বিখ্যাত রচনা "মিলে সব ভারত সন্তান" গানখানি সর্বপ্রথম গাওয়া হয়। হিন্দুমেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও স্বরচিত স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস "মহারাষ্ট্র-জীবন প্রভাত", "রাজপুত-জীবন সন্ধ্যা" প্রভৃতি জাতীয় ভাবের জাগরণে সহায়তা করে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের হিন্দুমেলা

রবীন্দ্রনাথ ক্রমে জাতীয়তাবাদী সঙ্গীতের দ্বারা জাতির জাগরণ ঘটান। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তাঁহার বিখ্যাত "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান" গানখানি জাতির মর্ম বেদনাকে প্রকাশ করে। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার বিখ্যাত "শিবাজী" কবিতা রচিত হয়। এছাড়া স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে", "অয়ি ভুবন মনো মোহিনী," "আমার সোনার বাংলা" প্রভৃতি অসংখ্য সঙ্গীতের ডালিতে কবিগুরু ভারত লক্ষ্মীর অঙ্গনকে সাজাইয়া দেন। কবিগুরু তাঁহার "চার অধ্যায়" উপন্যাসে বিপ্লবী ভাবধারাকে প্রতিফলিত করেন। তাঁহার মুক্তধারা ও রক্ত করবী উপন্যাসে অত্যাচারী যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের আর্তচিৎকার ও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার "যেদিন সুনীল জলধি হইতে, উঠিলে জননী ভারতবর্ষ," "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা," "ভারত আমার জননী আমার" প্রভৃতি গান দ্বারা জাতিকে আবেগ ও স্বদেশপ্রেমে সিঞ্চিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতন, সাজাহান প্রভৃতি নাটক স্বদেশপ্রেমের জাগরণ ঘটায়। অতুল প্রসাদের "বল বল বল সবে," "উঠগো ভারতলক্ষ্মী" প্রভৃতি গানও সমাদর পায়। রবীন্দ্র যুগের শেষের দিকে কবি নজরুল ইসলাম বঙ্গভারতীর সুমধুর বীণার তারে রুদ্র সুরে দেশাত্মবোধক গানের ঝঙ্কার তুলিয়া যুব শক্তিকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ, আবেগে দুর্জয় করিয়া তুলেন। নজরুলের "কারার ঐ লৌহ-কপাট" হইল পরাধীনতার শিকল ভাঙার গান। রবীন্দ্রযুগের শক্তিমান ঔপন্যাসিক

রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র তাঁহার পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রাম্যসমাজের কুসংস্কারকে তীব্র আঘাত করেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার পথের দাবী উপন্যাসে সব্যসাচীর চরিত্রে বাংলার বিপ্লবীর ত্যাগদীপ্ত উজ্জ্বল চরিত্র আঁকেন। এইভাবে দেশাত্মবোধক সাহিত্য জাতিকে নব আদর্শে বলীয়ান করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য শিল্পরীতির বিকাশ

(Birth of Oriental art)

প্রাচ্য শিল্পকলার বিকাশ (Birth of oriental art) : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সহিত ভারতীয় শিল্পকলার গভীর অবনতি ঘটে। এই কারণে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে নূতন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় শিল্পীগণ পাশ্চাত্য শিল্পকলার অন্ধ অনুকরণ করেন। ইওরোপীয় শিল্পীরা ইঁহাদের নকলকারী বলিয়া সম্মান করিতেন না। ভারতীয় শিল্পীগণের সৃজনী প্রতিভা এই যুগে স্তিমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বেশী দিন ভারতীয় শিল্পকলা এই বন্ধ্যা অবস্থায় থাকে নাই। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতকে যেমন ভারতের নব জাগরণের সূচনা হয়, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সেইরূপ নূতন সৃষ্টির জোয়ার বহিতে আরম্ভ করে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ

ভারতীয় শিল্পকলায় এই যে নূতন শৈলীর সৃষ্টি হয় তাহাকে প্রাচ্য শিল্পকলা বা ওরিয়েণ্টাল আর্ট বলা হয়। শিল্পী রবিবর্মা ইওরোপীয় আঙ্গিকে ভারতীয় বিষয়বস্তু আঁকিয়া প্রশংসা পান। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল ভারতীয় চিরায়ত চিত্রশৈলীর উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁহার প্রভাবে ভারতীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া ভারতীয় রীতির চর্চা আরম্ভ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে তাঁহার ভাষ্য সাদরে গৃহীত হয়। ডাঃ কুমার স্বামীও ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকে তাঁহার রচনাবলীর দ্বারা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রাচ্য শিল্পরীতির পুনর্জাগরণের পুরোহিত

অবনীন্দ্রনাথ: প্রাচীন শিল্পধারার জাগরণ



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন শিল্পকলা রীতির সহিত আধুনিক ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সমন্বয় সাধন করেন। তিনি পারসীক, মুঘল, হিন্দু চিত্রকলা ও লোকশিল্পের পুনরায় চর্চা আরম্ভ করেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী, যথা নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতি বহু শিল্পীর মধ্যে তাঁহার ভাবধারা ছড়াইয়া দেন। পাঞ্জাবের আবদুর রহমান চাঘতাইও একটি শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন। চিত্রকলা ছাড়া ভাস্কর্যশিল্পেরও এই যুগে বিরাট উন্নতি ঘটে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে ভাস্কর্য শিল্পের চর্চা বিশেষভাবে হয়। ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই শিল্পে বিশেষ দক্ষতা দেখান। স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিক স্থাপত্য বিজ্ঞানের সহিত মুঘল বা রাজপুত স্থাপত্যের সমন্বয় ঘটাইয়া স্থাপত্যরীতি গঠন করা হয়। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস এই স্থাপত্যরীতির একটি দৃষ্টান্ত। এই সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যশিল্পের অগ্রগতির কথাও স্মরণ করা দরকার। ঊনবিংশ শতকের প্রাক্কালে ভারতীয় নৃত্যকলা অবহেলিত ছিল। বিদ্দজন সমাজে ইহার আদর তেমন ছিল না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নৃত্যলক্ষ্মীর ধূলিমলিন রূপকে পুনরায় সংস্কৃত করিয়া বিশ্বসভায় তাহার মহিমা উদঘাটন করেন। বিশ্বভারতীর মাধ্যমে তিনি বাংলার লোকনৃত্যের সহিত মণিপুরী, কত্থক ও কথাকলির সমন্বয় সাধন করিয়া নৃত্যনাটক রচনা করেন। ইহা বিশ্বে বিশেষ আদৃত হয়। উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্যের বিশুদ্ধ আঙ্গিকের রচনা করিয়া বিশ্বের দরবারে প্রচুর সম্মান লাভ করেন। এছাড়া কেরল মণ্ডলম, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দক্ষিণী নৃত্যের চর্চার উৎকর্ষতা দেখা যায়। বালা সরস্বতী কত্থক, কথাকলি, কুচিপুরী নৃত্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া বহুদেশে প্রশংসা পান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগতি : দেশীয় সংবাদপত্র আইন

(Development of the Press and Public opinion : Vernacular Press Act and after)

সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগতি (Development of the Press and Public opinion) ঃ তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৭৯ দেখ)। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও জাতীয়তাবাদ প্রসারে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রধান ভূমিকা নেয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ, সরকারী নীতির সমালোচনা ও জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রচার করিয়া জনমত গঠন করে। ১৮৫৭ খ্রীঃ পর হইতে ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। ইংরাজ মালিকানায় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ইংরাজ শাসনের পক্ষে প্রচার চালায়। অপরদিকে ভারতীয় মালিকানায় প্রকাশিত ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা

জাতীয়তাবাদী ভাব প্রচার করে। ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রগুলি সরকার সমর্থক ও ভারতীয় বিরোধী দৃষ্টি নেয়। অপর দিকে ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্রগুলি প্রধানতঃ সরকার বিরোধী ভূমিকা নেয়। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র বা ইংরাজী মালিকানার সংবাদপত্রের মধ্যে ১৮১২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত জন বুল (John Bull) গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী মতের ভক্ত ছিল। ইংলিশ-ম্যান পত্রিকা ছিল কলিকাতার ইংরাজ সমাজের প্রিয় পত্রিকা। ইহার ভারতীয় বিরোধী মনোভাব ছিল সুপরিচিত। এছাড়া এ-লা হাভারের পাইওনিয়ার (Pioneer) এবং মর্নিং পোষ্ট (Morning Post) পত্রিকাগুলিও ঘোর ইংরাজ ভক্তির পরিচয় দেয়। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ও ষ্টেটসম্যান পত্রিকা একত্রিত হইয়া দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় পরিণত হয়। যুক্তিপূর্ণ ও নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করিয়া ইহা প্রচুর সুনাম পায়। ১৮৬১ খ্রীঃ বোম্বাই টাইমস ও আরও দুইটি পত্রিকা একত্রিত হইয়া টাইমস অফ ইণ্ডিয়া (Times of India) নামে আত্মপ্রকাশ করে।

ইংরাজ মালিকানায় সংবাদপত্র

ভারতীয় মালিকানায় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি নির্ভীকভাবে সরকারের সমালোচনা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশে ব্রতী হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জী এ বিষয়ে নির্ভীক ও যুক্তিবাদী সাংবাদিকতার এক বিরল দৃষ্টান্ত রাখেন। নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র তাঁহার কলম চালনা করিয়া সরকারকে এবিষয়ে সচেতন করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ সম্পর্কেও তিনি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনায় হিন্দু পেট্রিয়ট নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার আদর্শ অম্লান রাখে। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কৃষ্ণদাস "প্রায় ২৩ বৎসর ধরিয়া এই পত্রিকাকে দেশের শক্তির (Power of the country) প্রতীকে পরিণত করেন"। সরকার অনেক ক্ষেত্রে এই পত্রিকার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া গ্রহণ করিতেন। এছাড়া কেশবচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান মিরর, সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকাও বিখ্যাত ছিল। বেঙ্গলী পত্রিকা এক সময় জাতীয়তাবাদীগণের মুখপাত্রে পরিণত হয়। এছাড়া বাংলার বাহিরে, পাঞ্জাবের লাহোর ট্রিবিউন, উত্তর প্রদেশের ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড, মাদ্রাজের দি হিন্দু, নেটিভ পাব্লিক ওপিনিয়ন, বোম্বাইয়ের মারাঠা, ইন্দুপ্রকাশ, ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি ছিল বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকা। কলিকাতা হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাও সৎ সাংবাদিকতা এবং উন্নত মানের আলোচনার জন্য প্রশংসা পায়।

ভারতীয় মালিকানায় ইংরাজী সংবাদপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট

১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন পাশ হইলে ভারতীয় সাংবাদিকতায় নূতন আলোড়ন দেখা দেয়। এই আইনের সমালোচনায় সংবাদপত্রগুলি মুখর হইয়া উঠে। এই সময় হইতে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্রগুলি ভারতীয়গণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সঞ্চারের জন্য বিশেষ চেষ্টা চালায়। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির সমালোচনা সর্বদা নিরপেক্ষ না হইলেও ইহাদের লেখার ঝাঁঝে জনমত বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায়

বাংলা সংবাদপত্র ঃ সোমপ্রকাশ, সাধারণী, বঙ্গদর্শন

সোমপ্রকাশ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাদর্পণ এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাদর্পণ পত্রিকাই সর্বপ্রথম ইংরাজ ও ভারতবাসীর জাতিগত ব্যবধান বুঝাইতে "জাতিবৈর" কথাটি ব্যবহার করে। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'সাধারণী' ও 'বঙ্গদর্শন' জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারে ঐতিহাসিক ভূমিকা নেয়। আর্যদর্শন, ভারত মিহির ও হিন্দু হিতৈষিণীর কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও পরে হিরন্ময়ী দেবী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত উদ্বোধন পত্রিকা প্রভৃতি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিলেও জাতীয়তার বিকাশে ইহাদের অবদান কম ছিল না।

অমৃতবাজার পত্রিকা

১৮৬৮ খ্রীঃ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ ভারতীয় সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক জাগরণের ইতিহাসে একটি নূতন যুগের সূচনা করে। অমৃতবাজার প্রথমে যশোহর হইতে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শিশির কুমার ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক। প্রথম হইতে ভারতবাসী ও শাসক ইংরাজের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের কথা অমৃতবাজার তুলিয়া ধরে। এই কাগজের একটি স্তম্ভে মফঃস্বলে ইংরাজ কর্মচারীগণের দুর্নীতির খবর বাহির হইত। ইহার ফলে সরকারী কোপ পত্রিকাটির উপর পড়ে এবং পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মচারীগণকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করা হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র দমন আইন করিলে রাতারাতি অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরাজী কাগজে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯১ খ্রীঃ ইহা দৈনিক পত্রিকাতে পরিণত হয় এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতীয় সাংবাদিকতার জগতে দিগস্তম্ভের ন্যায় কাজ করে।

সঞ্জীবনী ও সুলভ সমাচার

বাংলায় বঙ্গবাণী, সঞ্জীবনী ও এক পয়সা মূল্যের সুলভ সমাচার সরকারী কাজের সমালোচনা খুবই তীব্রভাবে চালায়। সমাজ সংস্কারের জন্যও সঞ্জীবনী পত্রিকা তাহার স্তম্ভে অগ্নিময় আলোচনা চালায়। এইভাবে সংবাদপত্র জাতীয় জাগরণে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন ও ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা (The Vernacular Press Act and the Role of the Press) ঃ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির অগ্নিবর্ষী লেখনী ইংরাজ সরকারকে চঞ্চল করিয়া তুলে। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির তীব্র আক্রমণ সরকারী রোষের বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়। লর্ড লিটন বড়লাট হইয়া বলেন যে "বাঙালী বাবুগণ রাজদ্রোহমূলক সাংবাদিকতা চালাইয়া সরকারকে উত্যক্ত করিতেছেন।" ফলে ১৮৭৮ খ্রীঃ ৯নং দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমন আইন পাশ করিয়া সরকার দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করেন। এই আইনে বলা হয় যে—(১) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রকাশক ও মুদ্রণকারী এমন কিছু প্রকাশ করিবেন না যাহাতে লোকের মনে সরকারের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মে। (২) এজন্য প্রকাশক ও মুদ্রণকারীকে মুচলেখা দিতে বলা হয়। (৩) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মুদ্রণ যন্ত্র বাজেয়াপ্ত ও জরিমানা করার

লর্ড লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন

ব্যবস্থা করা হয়। (৪) মাদ্রাজ প্রদেশকে এই আইনের আওতা হইতে বাহিরে রাখা হয়।

লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলিকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করে। অমৃতবাজার পত্রিকা এই আইনের আওতা কাটাইবার জন্য রাতারাতি ইংরাজী ভাষার পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশ এই আইনের বাহিরে থাকায় মাদ্রাজে দি হিন্দু (The Hindu) নামে একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী কাগজ (১৮৭৮ খ্রীঃ) বাহির হয়। ইহা সুব্রহ্মণ্য আইয়ার প্রভৃতির সম্পাদনায় বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও দি হিন্দু

লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমন আইনের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ এক সর্বভারতীয় প্রতিবাদী আন্দোলন গঠন করেন। বাক স্বাধীনতা ধ্বংসের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র ধিক্কার ধ্বনি উঠে। শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রীঃ লর্ড লিটনের এই দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করেন। ইংরাজ সরকারের এই দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে ভারতীয়গণের রাজনৈতিক চেতনা আরও তীব্র হইয়া উঠে।

সুরেন্দ্রনাথের সংবাদপত্র দমন আইনের প্রতিবাদ ঃ সংবাদপত্র দমন আইন প্রত্যাহার

ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠী ভাষায় "কেশরী" এবং ইংরাজী "মারাঠা" প্রকাশ করিয়া ভারতীয় সাংবাদিকতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর আনেন। তিলকের কেশরী সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের তূর্য বাজাইয়া জাতিকে সক্রিয় সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

কেশরী ও বাল গঙ্গাধর তিলক

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জাতীয় কংগ্রেসের ভাবধারা ও আদর্শকে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া দেয়। ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা নেয়, অপর দিকে ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্র কংগ্রেসের সমর্থন করে। সংবাদপত্রগুলি সরকারের করনীতি, ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন (Drain of wealth), মাথাভারী প্রশাসন, ইংরাজ আই. সি. এস. নিয়োগের প্রতিবাদ এবং পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তনের দাবীকে উচ্চে তুলিয়া ধরে। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে "ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের জাগরণে ভারতীয় সংবাদপত্র মুখ্য ভূমিকা নেয়।"[১] ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সংবাদপত্র নির্ভীকভাবে জাতির নিকট নেতাগণের আহ্বান পৌঁছাইয়া দেয়।

ভারতের রাজনৈতিক জাগরণে সংবাদপত্রের ভূমিকা

———

১. British Paramountcy and Indian Renaissance.

ধর্মীয় আন্দোলন ঃ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

(Religious Movements : Beginning of Militant Nationalism)

ধর্ম আন্দোলন এবং সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উপর তাহার প্রভাব (Religious Movements and their Impact on Militant Nationalism)ঃ ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন বড় ঘটনার পশ্চাতে আদর্শগত প্রভাব কাজ করিয়া থাকে। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে যেমন দার্শনিকগণের প্রভাব কাজ করে, সেইরূপ ভারতের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের জাগরণের পশ্চাতে ভারতীয় ধর্মমত বিশেষ কাজ করে। স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী দয়ানন্দ যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন তাহা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। (উনবিংশ শতকের ধর্ম আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬২ দেখ)।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীর নিকট বেদান্ত ধর্মের নব ব্যাখ্যা করেন। বিবেকানন্দ "জাতীয়তাবাদকে একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে পরিণত করেন"।[১] তিনি দেশবাসীকে নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আস্থা রাখিয়া চলিতে উপদেশ দেন। যুব সমাজকে লৌহের ন্যায় মাংসপেশী, ইস্পাতের ন্যায় স্নায়ু এবং মনকে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও কঠোর প্রতিজ্ঞায় শাণিত করিতে আহবান জানান। তিনি গীতার আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া জাতিকে ক্লীবতা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে "বিখ্যাত চিত্রকর মাইকেল এ্যাঞ্জেলো যেমন চিত্রকলার মধ্যে বাস্তবতাকে সঞ্চার করেন, ধর্মতত্ত্বের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সেইরূপ বাস্তবতাকে স্থান দেন"।[২] তিনি অবদমিত, ধূলি-ধূসরিত, দরিদ্র ভারতবাসীর মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎ পান। "যত্র জীব তত্র শিব", জীবই ভগবান, এই বাণী তিনি ভারতবাসীর মর্মে গাঁথিয়া দেন। ইংরাজী সভ্যতা হইতে ভারতীয় সভ্যতা হীন এই ধারণায় জাতি যখন ভুগিতেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে ভারতের সংস্কৃতি পরম গৌরবের বস্তু। ভারতবাসী হীন বলিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিবার কোন প্রয়োজন নাই।



স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব

দেশবাসীকে তিনি বলেন "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিরোধত" অর্থাৎ উঠ, জাগো,

১. "Swami Vivekananda raised nationalism to a high spirituul plane." Dr. B. B. Majumdar—Militant Nationalism in India.

২. "Vivekananda was the Michelangelo of the realm of spirit." Dr. A. Tripathy—The Extremist Challenge.

নিজ প্রাপ্য বুঝিয়া লও। তাছাড়া স্বামীজী দেশের ধনী-দরিদ্র সর্বসাধারণকে পরস্পরের ভ্রাতা বলিয়া ভাবিয়া জাতীয় ঐক্য বাড়াইতে উপদেশ দেন। স্বামীজী হত দরিদ্র দুঃখিনী ভারতমাতার কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন। শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগীন পত্রিকায় এই নব-জাতীয়তাবাদের গঠনে বিবেকানন্দের দান মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। ভারতের বিপ্লবীগণ বিবেকানন্দের বাণীকে পরম যত্নে আত্মস্থ করিয়া দেশমাতার মুক্তির জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রসারে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে নব-জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্টার ব্রত লইয়া অবতীর্ণ হন বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের সেই ভূমিকাকে বলিষ্ঠ রেখায় তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে তুলিয়া ধরেন। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বঙ্কিম ছড়াইয়া দেন। রামমোহন জাতির জাগরণের জন্য যেরূপ উপনিষদের বাণীকে গ্রহণ করেন; বঙ্কিম সেই উদ্দেশ্যে ভগবদ্গীতাকে ব্যবহার করেন। তিনি উপনিষদের "নির্গুণ ব্রহ্মকে" গীতার "সগুণ ব্রহ্ম" রূপে ব্যাখ্যা করেন। উপনিষদের "নিরাকার ব্রহ্মকে" তিনি সাকার উপাসনার পথে আনেন। এই "সাকার ব্রহ্ম" ছিলেন দেশমাতা। বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" সংগীতের দ্বারা তাঁহারই বন্দনা গাহেন। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সত্যানন্দ এই দেশমাতার প্রতিমা ভক্ত মহেন্দ্রকে দেখাইয়া বলেন "মা যা ছিলেন; মা যা হইয়াছেন; এবং মা যা হইবেন"। ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে বঙ্কিমের পরিকল্পিত ধর্মরাজ্য, জাতীয়তাবাদীগণের স্বরাজ বা স্বরাজ্যে পরিণত হয়; গীতার ধর্মযুদ্ধ, স্বরাজ লাভের জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ ধরে।[১] বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তান দল, বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ভারতীয় বিপ্লবীগণের প্রেরণার উৎস ছিল। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ গঠনে বঙ্কিমের আদর্শ বিশেষ কার্যকরী হয়। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী মতবাদ কংগ্রেসের নরমপন্থীগণের অকার্যকারিতা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। অসার বক্তৃতা ও করুণ আবেদনের পথ ছাড়িয়া নিজ শক্তিতে জাতির অধিকার অর্জনের জন্যও বঙ্কিমচন্দ্র বলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সাম্প্রদায়িকতা বিচার

কোন কোন লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী লেখার মধ্যে গোঁড়া হিন্দুয়ানী ও মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা যায় বলিয়া অভিযোগ করেন।[২] বঙ্কিমের বিরুদ্ধে এই সমালোচনার কোন ভিত্তি নাই। প্রথমতঃ, বঙ্কিমচন্দ্র, আকবর বা হুসেন শাহ প্রভৃতি উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী শাসকগণের চরিত্র মসীলিপ্ত করেন নাই। ঔরঙ্গজেব ও কতলু খাঁর ন্যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শাসকেরই তিনি সমালোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, পতনশীল, সংকীর্ণচিত্ত হিন্দু রাজাগণকেও বঙ্কিম সমানভাবে কশাঘাত করিয়াছেন।

---

১. Dr. A. Tripathy—The Extremist Challenge.

২. Clark—The Role of Bankimchandra in the Development of Nationalism, in the volume—Historians of India, Pakistan and Ceylon. P. 439-40.

লক্ষ্মণ সেনের দরবারের অবক্ষয়ও তাঁহার সমালোচনা এড়ায় নাই। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নৈতিক, ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবক্ষয়কে বঙ্কিম ক্ষমা করেন নাই। কারণ তিনি মনে করিতেন যে, এই দোষের জন্যই ভারতবাসী স্বাধীনতা হারাইয়াছে।[১]

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্মীয় মতবাদ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। দয়ানন্দ বেদকে তাঁহার মতবাদের প্রধান ভিত্তিতে পরিণত করেন। তিনি আর্য সভ্যতার পবিত্রতায় ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে হিন্দু ধর্মের জলাশয়ে বহু কুসংস্কার শ্যাওলার ন্যায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বৈদিক সভ্যভার আলোকে উহাকে সংস্কার করা দরকার। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি পাপ পবিত্র বৈদিক ধর্মকে কলুষিত করিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। হিন্দু জাতিকে বৈদিক সভ্যতার আলোকে পুনর্গঠন করিবার জন্য তিনি আর্য সমাজ আন্দোলন গঠন করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তিনি দেশবাসীকে সজাগ করিয়া দেন। ভারতবাসীকে তিনি হীনমন্যতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন।[২] স্বামী দয়ানন্দের প্রভাব উত্তর ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও গুজরাটে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার সত্যার্থ প্রকাশ নামক গ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয় হয়। দয়ানন্দের প্রবর্তিত এ্যাংলো-ভেদিক বিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় করা হয়।

স্বামী দয়ানন্দের প্রভাব

ইংরাজ লেখক ভ্যালেন্টাইন চিরনের মতে "দয়ানন্দের আর্য সমাজ সম্প্রদায় হইতে বহু বিশিষ্ট বিপ্লবীর উদয় হয়"।[৩]

চরমপন্থীগণের উদ্ভব : নরমপন্থী বা মডারেটগণের দুর্বলতা (Rise of the Extremists : Weakness of the Moderates) : ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে কিছু সংখ্যক কংগ্রেস নেতা ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় বিচার, ইংরাজী সভ্যতার শ্রেষ্টত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আস্থাবান ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বায়ত্বশাসন লাভ করাই হইল ভারতবাসীর উন্নতির একমাত্র পথ। ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিলে ভারতবাসী অসহায় ও শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাঁহারা স্বরাজ বা স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করিতেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র সরকারী চাকুরীর ভারতীয়করণ, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রবর্তন প্রভৃতি দাবী জানাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই দাবী আদায়ের জন্য তাঁহারা কোন সক্রিয় পন্হা গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। ইংরাজ সরকারের ন্যায় বিচারের উপর তাঁহাদের এমনই গভীর বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা মনে করিতেন যে ঠিকমত আবেদন জানাইতে পারিলে উদার চিত্ত ও গণতন্ত্রী ইংরাজ জাতি ভারতীয়গণের দাবী পরিপূরণ

মডারেট মতবাদ; আবেদন নীতি

১. A Tripathy—The Extremist Challenge.
২. British Paramouutcy and Indian Renaissance. P. 114.
৩. V. Chiron—Indian unrest.

করিবে। ইঁহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, আইনসভায় বিতর্ক, দরখাস্ত নীতির মাধ্যমে দাবী আদায়ের আশা করিতেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ইঁহারা যথারীতি প্রকাশ করিতেন। এই শ্রেণীর জাতীয় নেতাগণকে মডারেট বা নরমপন্থী বা আপোষপন্থী বলা হইত। স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা, দাদাভাই নওরোজী, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছিলেন মডারেটপন্থীগণের নায়ক।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে মডারেট বা নরমপন্থীগণের আদর্শে এক শ্রেণীর নেতা আস্থা হারাইয়া ফেলেন। ইঁহারা মনে করিতেন যে স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভই ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাল গঙ্গাধর তিলক বলেন যে "স্বরাজ হইল আমার জন্মগত অধিকার" (Swaraj is my birth right)। এই অধিকার কেহ কাড়িয়া লইলে তাহা নিজ শক্তির দ্বারা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। স্বরাজ ইংরাজের দানের দ্বারা বা আবেদন নীতির দ্বারা অর্জন করা যাইবে না। ইংরাজের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া কোন ফল হইবে না। জাতিকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া, নিজ শক্তি ও সভ্যতার প্রতি আস্থাবান হইয়া স্বরাজ অর্জন করিতে হইবে। সক্রিয় আন্দোলন, ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারাই জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিবে। চরমপন্থীগণ মডারেট নীতিকে "রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি" (Political mendicancy) বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৪ খ্রীঃ বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় মডারেট নীতির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে "আবেদন নীতি ভারতের যুব শক্তির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে"। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন যে মডারেটগণের আবেদন নীতির সহিত ভারতের বৃহত্তর জনগণের কোন মনের যোগ নাই। নরমপন্থীগণের কর্তাভজা, ধামাধরা নীতি ছাড়িয়া সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে নিজ শক্তিতে স্বরাজ অর্জনের জন্য মহারাষ্ট্র কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলক ডাক দেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রতি আস্থা রাখিবার কথা তিলক জোরের সঙ্গে বলেন। অনুকরণ নয় আত্মশক্তির উদ্বোধনই জাতিকে আগাইয়া দিবে ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। কেশরী নামে পত্রিকার স্তম্ভে সংগ্রামী তিলক তাঁহার বাণী দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া দেন। গ্রামের মণ্ডপে জনগণের হৃদয়ে তিলকের অগ্নিমন্ত্র "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" নূতন প্রেরণা সঞ্চার করে।

চরমপন্থী মতবাদ : বাল গঙ্গাধর তিলক

বাংলায় বিপিনচন্দ্রও এই নব-জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা হন। নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকা ও বন্দেমাতরম পত্রিকায় এই নব-জাতীয়তাবাদের তিনি ভাষ্য দেন। স্বরাজ লাভের জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি গ্রহণের তিনি ডাক দেন। পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়ও এই নব-জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান নায়কের ভূমিকা নেন। তিনি বলেন যে "কংগ্রেসের নরমপন্থী আবেদন নীতি জাতির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নরমপন্থীগণের সহিত বৃহত্তর জনগণের কোন সংযোগ নাই।[১]

বিপিনচন্দ্র ও লাজপৎ রায়

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ফলে জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই

১. Quoted by British Paramountcy and Indian Renaissance.

দুই গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ বারাণসী কংগ্রেসে চরমপন্থীগণ দাবী আদায়ের জন্য সক্রিয় আন্দোলন যথা, স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতির কথা বলেন।



লালা লাজপৎ রায়

সুরাট কংগ্রেস : চরমপন্থীগণের কংগ্রেস ত্যাগ

১৯০৬ খ্রীঃ কলিকাতা কংগ্রেসে কংগ্রেস আন্দোলনের লক্ষ্য "স্বরাজ" লাভ বলায় চরমপন্থীগণ শান্ত হন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীগণের মনকষাকষি চলিতে থাকে। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় যে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহা চরমপন্থীগণের হাত শক্ত করে। ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট কংগ্রেসে এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ চরম সীমায় উঠে। সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীগণ "স্বরাজ, স্বদেশী ও বয়কট"কে কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে অরাজী হইলে চরমপন্থীগণ তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব কিছুদিনের জন্য নরমপন্থীগণের হাতে থাকিয়া যায়।

সুরাট কংগ্রেসের পর (১৯০৭ খ্রীঃ) সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ তিলক, লাজপৎ, বিপিন চন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতার পরিচালনায় জাতীয় ভাবধারায় পরিণত হয়। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ ইহার পর দুইটি খাতে প্রবাহিত হয়, যথা, (১) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বয়কট, স্বদেশী প্রভৃতি, (২) সশস্ত্র বিপ্লব। তিলক তাঁহার কেশরী ও মারাঠা পত্রিকায়, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম পত্রিকায়, ব্রহ্মবান্ধব সন্ধ্যা পত্রিকায়, লাজপৎ স্বরাজ পত্রিকায় সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছড়াইয়া দেন। তিলক গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব প্রচলন করিয়া মহারাষ্ট্রের জনগণকে প্রেরণা দেন। বাংলাদেশেও শিবাজী উৎসব, প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার "শিবাজী" নামক বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন।

সংগ্রামী জাতীয়তা-বাদের প্রভাব

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণ (Factors leading to the rise of Militant Nationalism) : সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতার আদর্শ ও স্বামী দয়ানন্দের আর্য সমাজ আন্দোলন বিশেষ সহায়ক হয়। বিবেকানন্দের নব বেদান্তবাদ জাতিকে ক্লীবতা ও হীনমন্যতা ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিতে জাগিয়া উঠার আহবান, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা কৃষ্ণ চরিত্রের মাধ্যমে ধর্মরাজ্য

বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও দয়ানন্দের প্রভাব

স্থাপনের আদর্শ স্বরাজ ও সক্রিয় সংগ্রামের জন্য জাতির মানসিক জমিনকে তৈয়ারী করে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেশমাতাকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন এবং বন্দেমাতরম মন্ত্রে তাঁহার বন্দনা গাহেন। আনন্দমঠের সন্তানদল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে জীবন দানের আদর্শ প্রচার করে। স্বামী সত্যানন্দের "মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন ও মা যাহা হইবেন" বলিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের মন্ত্র হিসাবে বঙ্কিমের সঙ্গীত বন্দেমাতরম সমগ্র জাতিকে নূতন প্রেরণা দেয়। ভগবদ্‌গীতার ধর্ম যুদ্ধের ব্যাখ্যা স্বরাজ লাভের জন্য সংগ্রাম ও সশস্ত্র আন্দোলনের পথ নির্দেশ করে। রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা জাতীয়তাবাদের (Nationalism) আদর্শকে সক্রিয় করে। তিলক, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতাগণ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করেন। তিলক ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রধান পুরোহিত। তিনি কংগ্রেসের নরমপন্থীগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধিক্কার জানাইয়া সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ লাভের লাভের আহ্বান জানান। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও আদর্শের উপর আস্থা রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভারত গড়ার জন্য তিনি ডাক দেন। তিনি শিবাজী ও গণপতি উৎসবের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেন।



বিপিনচন্দ্র পাল

লাল-বাল-পালের প্রভাব

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের জন্য কংগ্রেসের নরমপন্থীগণের ব্যর্থতা প্রধানতঃ দায়ী ছিল। ঐতিহাসিক অনিল শীলের মতে নরমপন্থীগণ ছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত, ব্যারিস্টার, উকিল শ্রেণীর লোক। ইঁহারা কর্তাভজা, ধামাধরা নীতি লইয়া ইংরাজ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন জানাইয়া বিফলতা বরণ করেন। ক্রমে নরমপন্থীগণের রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি জাতির মনে বিরাগ দেখা দেয়। তাছাড়া নরমপন্থীগণের সহিত ভারতের বৃহত্তর জনগণের কোন সংযোগ না থাকায় তাঁহাদের আন্দোলনের পশ্চাতে গণ সমর্থন ছিল না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন চরমপন্থীদের নিকট স্বরাজ লাভের নূতন পথের সন্ধান দেয়। ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীদের সহিত চরমপন্থীদের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হইলে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়া উঠে।

নরমপন্থী আন্দোলনের বিফলতা : বঙ্গভঙ্গ

ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতি এবং লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসননীতি ভারতবাসীর মর্মে আঘাত করে। ইংরাজ শিল্পের স্বার্থে ভারতের শিল্পগুলিকে ধ্বংস করায়, সরকারী চাকুরীতে ভারতবাসীর প্রবেশে বাধা দেওয়ায় ভারতীয়গণের মনে

ইংরাজের সদিচ্ছার প্রতি মোহ নষ্ট হয়। বিলাতের মিল মালিকরা যাহাতে ভারতীয় ক্রেতাকে ভালভাবে শোষণ করিতে পারে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার শুল্ক আইন রচনা করেন। শুল্ক ও কার্পাস আইনের (১৮৯৪, ১৮৯৬ খ্রীঃ) ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রানাড়ে, গোখেল, নোওরোজী প্রভৃতি নেতারা এজন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহাদের প্রতিবাদের ফলে ইংরাজ শাসন সম্পর্কে জাতির মোহ বিনষ্ট হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণী সরকারের অর্থনীতির প্রতি আস্থা হারায়। কৃষকেরা অতিরিক্ত করের চাপে ধুঁকিতে থাকে। ইহার ফলে সক্রিয় আন্দোলনের জমি তৈয়ারী হয়। বয়কট ও স্বদেশী নীতি জনপ্রিয়তা পায়। লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত লইলে বাঙালী জাতি শিহরিয়া উঠে। ইহার প্রতিবাদে বাংলায় স্বতস্ফুর্তভাবে "বয়কট, স্বদেশী আন্দোলন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সশস্ত্র বিপ্লব" আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন দেখা যায় তাহা ক্রমে সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে। ভারতবাসী বুঝিতে পারে যে আবেদন ও ভিক্ষা ছাড়িয়া আত্মশক্তিতে জাতিকে স্বরাজ অর্জন করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, ১৯০৪-৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিস্ময়কর জয়লাভ এশিয়াবাসীদের মনে আত্মশক্তি সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করে। জাপানের দৃষ্টান্তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজ শক্তিতে স্বরাজ অধিকারের সংকল্প নেয়। এছাড়া ইটালী ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধে পিছাইয়া পড়া আবিসিনিয়ার হাতে ইটালীর পরাজয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উৎসাহ দেয়। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যৌবনের খরদীপ্ত ও তেজ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবাসী আপন অধিকার আদায়ের জন্য আত্মত্যাগের সাধনায় নামিয়া পড়ে।

ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতি : বঙ্গভঙ্গ আন্তর্জাতিক প্রভাব

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রীঃ) : ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি

(Partition of Bengal : British Policy of Divide and Rule)

ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি (British Policy of Divide and Rule) : ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিলে পরাধীন জাতির মধ্যে ভেদনীতি খাটাইয়া নিজ আধিপত্য কায়েম করিয়া থাকে। ইংরাজেরাও ভারতবাসীগণের মধ্যে ভেদনীতি চালাইয়া তাহাদের সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বহু ধর্ম ও বহু গোষ্ঠী থাকায় ইংরাজ সরকারের পক্ষে ভেদনীতি

ইংরাজের ভেদনীতি

খাটাইয়া এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দেওয়া সহজ হয়। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে কাঁচা, ক্ষুদ্র বুদ্ধি কিছু কিছু ভারতবাসী ইংরাজের এই ভেদনীতির শিকার হইয়া দেশের বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রাচীন রোমের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ এই ভেদনীতি (Divide and Rule) সার্থকভাবে তাঁহাদের সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করেন। ১৮২১ খ্রীঃ এশিয়াটিক জার্নাল পত্রিকায়, জনৈক ইংরাজ কর্মচারী রোমের অনুকরণে ভারতে ইংরাজ সরকারকে ভেদনীতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। স্যার জন স্ট্র্যাচির ন্যায় দক্ষ ইংরাজ কর্মচারী ভারতীয়গণের ধর্মগত বিভেদের সুযোগ গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ পর ইংরাজের হিন্দু তোষণ নীতি

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পরে ইংরাজ সরকার এই নীতি লইয়া মুসলিমগণের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়কে সমর্থন করেন। ইংরাজ সরকারের ধারণা হয় যে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের জন্য প্রধানতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ই দায়ী। সুতরাং মুসলিম সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেদের সরকারী চাকুরীতে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করেন। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেদের উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়।

মুসলিম তোষণ নীতি

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুগণ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টরী আদর্শে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন দাবী করে। ইংরাজ সরকার শিক্ষিত হিন্দুগণের এই দাবীকে দমাইয়া দেওয়ার জন্য এইবার মুসলিম সম্প্রদায়কে হিন্দুগণের বিরুদ্ধে কাজে লাগান। ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি এইভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে। ইংরাজেরা বলিতে আরম্ভ করে যে, জাতীয় কংগ্রেসের দাবীর পিছনে ভারতের মুসলিমগণের সমর্থন নাই। জাতীয় কংগ্রেস হইল কেবলমাত্র হিন্দুগণের প্রতিনিধি। লর্ড ডাফরিন ভেদনীতি খাটাইবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে "ভারতের ৫ কোটি মুসলমান হইল একটি আলাদা জাতি।"[১]

আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলনের অন্য মুসলিম নেতাগণ ইংরাজের সমর্থন পাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার স্বপক্ষে ঘোর প্রচার চালান। লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করিয়া হিন্দু-মুসলিম ভেদনীতি খাটাইবার জন্যও চেষ্টা করেন। এইভাবে ইংরাজের ভেদনীতি ভারতের জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে।

বাংলায় জাতীয়তাবাদ

বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal)ঃ ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া বাংলায় যে নব জাগরণ ঘটে ক্রমে তাহা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন গঠনে বাঙালী নেতা সুরেন্দ্র নাথ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মুখ্য ভূমিকা নেন। ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাংলা

১. Modern Review 1911. I. P. 330.

দেশেই ছিল সর্বাধিক। বাংলার সংবাদপত্রগুলির সরকারের সমালোচনা ছিল নির্ভীক ও তীব্র।

লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া (১৮৯৯ খ্রীঃ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করিবার সংকল্প নেন। যেহেতু মারাঠীগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ তীব্র ছিল, সেহেতু তিনি মারাঠীগণকে দুর্বল করিবার জন্য মারাঠীভাষী বেরার প্রদেশকে হিন্দুভাষী মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করেন। বাংলাদেশ ছিল কংগ্রেস আন্দোলন ও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের পীঠস্থান। এজন্য তিনি বাঙালী জাতির উপর খড়গহস্ত ছিলেন। তিনি শিক্ষিত বাঙালীর মাতৃস্বরূপিণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াইয়া দেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত হইয়া বাঙালী নেতাগণ পার্লামেণ্টারী নির্বাচন দাবী করায়, তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের উপরও সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ান। শিক্ষিত বাঙালীগণের প্রতি তিনি ঘোর বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। ভারতবাসীর স্বরাজ দাবীকে তিনি রাজদ্রোহ বলিয়া মনে করিতেন। লর্ড কার্জন বাংলা ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিবার সংকল্প নেন। তিনি মনে করিতেন যে, মুসলমান-প্রধান পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে পূর্ব বাংলার হিন্দুগণ সংখ্যালঘু হইয়া বিষহীন ঢোঁড়া সাপে পরিণত হইবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগ করিলে ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐক্য মার খাইবে। অপর দিকে পশ্চিম বাংলার বাঙালীগণ বিহার ও উড়িষ্যার সহিত যুক্ত হইয়া সংখ্যালঘু হইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। কার্জনের বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ছিল দূরভিসন্ধিমূলক এবং ভেদনীতির নিকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি "কলিকাতার অনিষ্টকর প্রভাব" হইতে পূর্ব বাংলাকে পৃথক করিতে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে অবশিষ্ট বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করায় ষড়যন্ত্র করেন।"

কার্জনের নীতি

কার্জন ছিলেন খুবই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও জেদী লোক। তিনি যাহা স্থির করিতেন তাহা কিছুতেই ছাড়িতেন না। যদিও মনে মনে তিনি রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নেন, তবুও মুখে তিনি শাসন ব্যবস্থার সুবিধার অজুহাত দেখাইয়া বাংলা ভাগ সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে—(১) বর্তমান বাংলা প্রদেশ অত্যন্ত বড়। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া এই বিরাট প্রদেশে সুশাসন করা কষ্টকর। (২) দুর্গম পূর্ব বাংলাকে কলিকাতা হইতে ভালভাবে শাসন করা সম্ভব নহে। কলিকাতা হইতে পূর্ব বাংলার সমস্যা ঠিকমত না বুঝা যাওয়ায় পূর্ব বাংলা উপেক্ষিত থাকে। (৩) ইহার ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতিকার্য ব্যাহত হয়। (৪) ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ কার্জনের পরামর্শে বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করিয়াছেন। (৫) আসামের ইংরাজ চা বাগিচার মালিকেরা চট্টগ্রাম বন্দরকে আসামের সহিত যুক্ত করার দাবী জানাইয়াছে।

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা

বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে লর্ড কার্জনের যুক্তিগুলি ছিল খুবই অসার। প্রথমতঃ, যদি বিশাল প্রদেশ হিসাবে শাসনকার্যের অসুবিধার কথা ধরা হয়, তবে উড়িয়াভাষী উড়িষ্যা, ও হিন্দীভাষী বিহারকে বাংলা হইতে পৃথক করিলেই চলিত। বাংলার বাঙালীকে ভাগ

করার দরকার ছিল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাংলাকে অক্ষত রাখিয়া বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক করার কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কার্জন তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বাংলার গভর্ণরের কার্যনির্বাহক পরিষদকে শক্তিশালী করিলে পূর্ব বাংলার সুশাসন সম্ভব হইত। ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে ইংরাজ আই-সি-এসগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তগণের উপর চটা ছিল। উহারা বাংলা ভাগের জন্য কয়েকটি গোপন পরিকল্পনা করে। পরে কার্জন ইহাদের সহিত একমত হইয়া বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নেন। এই পরিকল্পনা ছিল মূলতঃ ইংরাজ আই-সি-এসগণের মস্তিষ্ক জাত। যাহা হউক কার্জন যে ইহাকে রাজনৈতিক মতলবে ব্যবহার করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯০৩ খ্রীঃ কার্জনের নির্দেশে স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট রিজলী ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সহিত এবং ছোটনাগপুর জেলাকে মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। রিজলী তাঁহার গোপন রিপোর্টে বলেন যে "বাংলাকে ভাগ করিলে তাহার শক্তি ভাঙিয়া যাইবে।" রিজলী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ উঠিলে তাহা আপাততঃ মুলতুবী থাকে। লোকে মনে করে যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রদ হইয়াছে। লর্ড কার্জন আসলে তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি ভারত সচিবকে ১৯০৪ খ্রীঃ একটি চিঠিতে বলেন যে, "আমরা যদি বাঙালীর চীৎকারে ভয় পাইয়া বাংলা ভাগ না করি তবে ভারতে এমন একটি শক্তি দেখা দিবে যাহা ইংরাজকে বহু অশান্তিতে ফেলিবে। বাঙালীরা নিজেদের একটি জাতি মনে করিয়া ইংরাজকে হঠাইয়া স্বাধীনতা চায়।" লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে পুনরায় তাঁহার বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। লর্ড কার্জন বলেন যে, সাধারণ বাঙালী বঙ্গভঙ্গের বিরোধী নহে। কিছু কংগ্রেস নেতা ও কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি কেবল ইহার বিরোধিতা করিতেছেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে পূর্ব বাংলায় জোর বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে ঢাকা নূতন রাজধানী হইলে পূর্ব বাংলার মুসলিমগণ উপকৃত হইবে।

বঙ্গভঙ্গ, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ খ্রীঃ

লর্ড কার্জনের আদেশে ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ কায়েম হয়। (১) ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম বিভাগ, মালদহ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও আসাম লইয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" গঠিত হয়। (২) অবশিষ্ট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার পূর্ব বাংলার নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি বাঙালী জাতির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলেন যে, "হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় হইল তাঁহার দুয়োরাণী ও সুয়োরাণী।" স্বভাবতই তিনি মুসলিমগণকে "সুয়োরাণীর" মর্যাদা দিয়া হিন্দু-মুসলিম ভেদনীতি এবং বাঙালীর ঐক্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন : বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া
(The Swadeshi Movement : Anti-Partition Agitation)

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন (Swadeshi and Boycott Movement) : লর্ড কার্জন ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ বাংলা ভাগ কায়েম করেন। বাংলা ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে লর্ড কার্জনের দুরভিসন্ধি বাঙালীরা ধরিয়া ফেলে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করিয়া হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাইতেছেন। হিন্দু বাঙালীগণকে উভয় বাংলায় সংখ্যালঘুতে পরিণত করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিতেছেন। কলিকাতার উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি যাঁহারা জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছিলেন তাঁহাদের পূর্ব বাংলার চাকুরী ও ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতেছেন। সর্বোপরি বাঙালীগণ জাতীয় কংগ্রেসে যে উগ্রতা ছড়াইয়াছিল তাহা নষ্ট করিয়া কংগ্রেসকে সমাধি দেওয়ার চেষ্টা কার্জন করিতেছেন ইহা স্পষ্ট হইয়া যায়।

বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে ইংরাজের রাজনৈতিক চক্রান্ত

কার্জনের রাজনৈতিক অস্ত্রাঘাতের বেদনায় জাতি শিহরিয়া উঠে। বেদনা হইতে জাগে ক্রোধ। শেষ পর্যন্ত ক্রোধ, প্রতিশোধ ও প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়। বাঙালী নতশিরে কার্জনের বিধান মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। তাহারা বাংলা ভাগকে "বঙ্গভঙ্গ" নাম দেয়। জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বেঙ্গলী পত্রিকায় "একটি গভীর বিপদ" শিরোনামা দিয়া বঙ্গভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করিয়া দেন। ক্রমে সন্ধ্যা, সঞ্জীবনী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করে। এমন কি কলিকাতার ষ্টেটসম্যান, লণ্ডনের ডেইলি নিউজ, বন্দেমাতরম প্রভৃতি পত্রিকাগুলি জনমত উপেক্ষা করিয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পরিণাম সম্পর্কে সরকারকে সাবধান করিয়া দেয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় প্রায় দুই হাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্র তীব্র ধিক্কার জানান হয়। ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক এই প্রতিবাদের সামিল হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁহার পাশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়ান। সর্বশক্তি দিয়া বঙ্গভঙ্গ রোধ করার আয়োজন করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ সরকারকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, "এখনও সরকার যদি মত না পাল্টান তবে সমগ্র দেশে আগুন জ্বলিবে।"

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমাইবার জন্য পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে আনিবার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহাদের বুঝান যে, ঢাকা নূতন প্রদেশের রাজধানী হইলে তাঁহাদের নানাবিধ চাকুরী ও জীবিকার সুযোগ হইবে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে তিনি নিজ পক্ষে আনেন। কিন্তু বাংলার মুসলিম জনগণের একাংশ কার্জনের

কার্জনের সাম্প্রদায়িক নীতি

কূটচালে বিভ্রান্ত হন নাই। মৌলভী আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে কলিকাতার রাজাবাজারে এক মহতী জনসভার দ্বারা মুসলিম ভ্রাতাগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। তাঁহারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রথম পর্যায়ে প্রতিবাদী আন্দোলনের পালা সাঙ্গ হয়। ক্রমে এই আন্দোলন চরমপন্থীগণের হাতে চলিয়া যায়। বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান।

বয়কট আন্দোলন

বাঙালী জাতি বিলাতী মাল বয়কট করিয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করে। ইংরাজ জাতিকে "হাতে না মারিয়া ভাতে মারার" ব্যবস্থা করা হয়। সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র সর্বপ্রথম বিলাতী মাল বয়কটের আহবান জানান। বয়কট আন্দোলন ছিল একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে ভারতীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিয়া ইংরাজ ভারতের বাজারে তাহার কারখানায় তৈয়ারী বিলাতী মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। তদবধি ভারত হইতে ইংরাজেরা অবাধে মুনাফা লুটিতে থাকে। বিলাতী মাল বয়কট করিয়া সর্বপ্রথম ইংরাজের এই মুনাফাবাজীতে আঘাত হানিবার ব্যবস্থা করা হয়। আবেদন নিবেদন নয়, আত্মশক্তিতে জাতিকে প্রতিরোধের পথ ধরিতে বলা হয়। বয়কট হইল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিস্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বিতীয় অধ্যায়। বয়কটের প্রস্তাব সমগ্র বাংলায় গভীর আগ্রহের সহিত গৃহীত হয়। খুলনার বাগেরহাটে এক বিরাট জনসভায় সর্বপ্রথম বিলাতী মাল বয়কটের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। লালমোহন ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার দ্বারা বিলাতী কাপড় বয়কট করিয়া বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলগুলিকে অচল করিয়া দিতে পরামর্শ দেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে এক মহতী জনসভা আহবান করা হয়। কলিকাতার ছাত্র সমাজ "বন্দেমাতরম্", "বঙ্গভঙ্গ রদ কর" ধ্বনি দিয়া এই সভায় হাজির হয়। লোকের চাপে হলের বাহিরেও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিলাতী মাল বয়কটের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে লওয়া হয়। ইহার পর বাংলার সর্বত্র দাবানলের ন্যায় বিলাতী মাল 'বয়কট' ছড়াইয়া পড়ে। ছাত্র সমাজ স্কুল, কলেজ ছাড়িয়া বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং আরম্ভ করে। বিলাতী কাপড়, চিনি, লবণ, সিগারেট, কাচের চুড়ি প্রভৃতি সকল দ্রব্যই বয়কট করা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বিলাতী জিনিষে তৈয়ারী মিষ্টান্ন পূজায় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। ধোপাগণ বিলাতী কাপড় কাচা বন্ধ করে। মুচিরা বিলাতী জুতা মেরামত করিতে অস্বীকার করে। এইভাবে সকল শ্রেণীর লোক বয়কট আন্দোলনের সামিল হয়। ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ ছাড়িয়া দলে দলে ছাত্ররা বাহির হইয়া আসে। উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ আদালতে ওকালতি বন্ধ করেন। জেলা বোর্ড, পঞ্চায়েৎ ও পৌরসভাগুলির সভ্যপদ ত্যাগ করা হয়। এইভাবে ইংরাজের অর্থনীতি ও শাসনযন্ত্রকে অচল করিবার চেষ্টা চালান হয়।

বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে "স্বদেশীর" আদর্শ গৃহীত হয়। স্বদেশী আন্দোলন বলিতে বিলাতী জিনিষের বদলে দেশে তৈয়ারী জিনিষ ব্যবহারের

আন্দোলন বুঝায়। ইহা ছিল বয়কট আন্দোলনের পরিপূরক। বয়কট ছিল বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী ছিল দেশীয় দ্রব্য গ্রহণ। বয়কট ছিল নেতিবাচক ; স্বদেশী ছিল ইতিবাচক। ইহার আগে হিন্দুমেলায় নবগোপাল ও রাজনারায়ণ "স্বদেশী"র আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাঁতে ও ভারতের কলে তৈয়ারী মোটা কাপড় লোকে স্বদেশী হিসাবে ব্যবহার করে। বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ-দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া "ছেড়ে দাও রেশমী চুঁড়ি বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না" গান গাহিয়া বাংলার মাতৃজাতিকে জাগাইয়া তুলেন। গৃহিণীগণ বিলাতী মিহি কাপড় ছাড়িয়া মোট কাপড় অঙ্গে ধারন করেন। আমেদাবাদ, বোম্বাইয়ের দেশী কাপড়ের কলগুলি বাংলায় কাপড় যোগাইতে থাকে। লোকে সস্তার বিলাতী সিগারেট ছাড়িয়া দেশী তামাক ও বিড়ি খাইতে আরম্ভ করে। বিলাতী ঔষধের বদলে দেশীয় কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' দেশী ঔষধ যোগায়। ছাত্ররা দলে দলে ইংরাজের স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসে। বিলাতী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে জাতীয় শিক্ষা আরম্ভ হয়। সতীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ডন সোসাইটি এই বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর দানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। মাতৃভাষা ও ইংরাজীর মাধ্যমে জাতীয় ভাবের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক ও কারি-গরী শিক্ষা প্রস্তাব লওয়া হয়। জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রীঅরবিন্দ ইহাতে অধ্যক্ষের পদ নেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউশন বা বঙ্গীয় কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। ইহা এখন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে দেশী কাপড়ের কল, দেশী বীমা, ব্যাঙ্কও স্থাপিত হয়।

১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কায়েম হইলে বাঙালী জাতি অরন্ধন, উপবাস করিয়া ইহার প্রতিবাদ জানায়। হিন্দু-মুসলমান ও দুই বাংলার ঐক্যের প্রতীক হিসাবে রাখীবন্ধন পালন করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে "বাংলার মাটি, বাংলার জল" গানে বাঙালীর হৃদয়কে সিঞ্চিত করেন।

বঙ্গভঙ্গ দিবস পালন

বাংলার বাহিরে মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে। তিনি মহারাষ্ট্রে স্বদেশী দ্রব্যের সমবায় ভান্ডার গঠন করেন। পুনায় স্বদেশী কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লাজপৎ রায়, মাদ্রাজে সুব্রহ্মন্য আয়ার, চিদাম্বরম পিল্লাই প্রভৃতি এই আন্দোলন ছড়াইয়া দেন। দিল্লীতে সৈয়দ হায়দর রেজা "বয়কট ও স্বদেশী" আন্দোলন গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকার আন্দোলনের চাপে ১৯১১ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লাগে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে স্বদেশী আন্দোলন হয় তাহা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করে। কংগ্রেসে চরমপন্থীগণ আবেদন নীতি ত্যাগ করিয়া স্বরাজ অর্জনের জন্য কংগ্রেসকে স্বদেশী ও নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি গ্রহণের চাপ দেন। কংগ্রেসের বাহিরে একদল চরমপন্থী সশস্ত্র বিপ্লবের পথে

স্বদেশী আন্দোলনের ফল

নামিয়া পড়ে। বাংলার সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ ভারতের জাতীয়তাবাদকে স্বরাজের জন্য সংগ্রামের পথে চালিত করে। স্বদেশী আন্দোলনের চাপে স্বদেশী শিল্পের বিকাশ হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও মুকুন্দ দাস নূতন স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। এই সঙ্গীতগুলি সাহিত্যের দরবারে চিরদিনের জন্য আদৃত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিপ্লবী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

(Terrorism)

বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব ও উহার আদর্শঃ সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও উহার লক্ষ্য (Birth of Terrorism and its aims) ঃ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। যথা, নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সশস্ত্র বিপ্লব।[১] সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে (পৃঃ ২০৯ দেখ) বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা নিস্ক্রিয় প্রতিরোধে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা বয়কট, স্বদেশী, পিকেটিং প্রভৃতি দ্বারা ইংরাজকে শায়েস্তা করার কথা ভাবেন। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীগণের অপর এক সম্প্রদায়ের নাম ছিল বিপ্লববাদী বা সন্ত্রাসবাদী। ইঁহারা মনে করিতেন যে, কেবলমাত্র বয়কট ও স্বদেশী অর্থাৎ অর্থনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আনা যাইবে না। সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ইংরাজের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া না লইলে ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীনতা পাইবে না। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে জাতিকে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দেশের জন্য আত্মত্যাগকেই বিপ্লবীগণ পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। ভগবদ্‌গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গকে তাঁহারা বরণীয় মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে যে দেশ জননীর চিত্র আঁকেন ; বিবেকানন্দ যে নব-বেদান্তবাদ এবং গীতার কর্মযোগ প্রচার করেন তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিপ্লবীগণ দেশ-জননীর শিকল ভাঙিবার জন্য জীবন পণ করেন।[২] বলপূর্বক দেশের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে বিপ্লবীরা বদ্ধ-পরিকর হয়। যুগান্তর পত্রিকা বলে যে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ৬০ কোটি হাত যেন প্রতিরোধের জন্য তুলিয়া ধরে। আবেদন ও ভিক্ষার দ্বারা স্বরাজ

সন্ত্রাসবাদের উদ্ভবের কারণ

১. B. Majumdar—Militant Nationalism in India.

২. নলিনীকিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ পৃঃ ১৭-১৮।

লাভ হইবে না বলিয়া তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। চরমপন্থী নেতা লালা লাজপৎ ১৯০৫ খ্রীঃ বারানসী কংগ্রেসে ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা ভিক্ষা করিলে ইংরাজের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। বিপ্লবীগণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে গোরার চরিত্রে এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিপ্লববাদ

কোন কোন লেখক সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে টেররিজম (Terrorism) বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে অভিহিত করেন। ভূতপূর্ব বিপ্লবী ও ঐতিহাসিক নলিনীকিশোর গুহ এই নামকরণের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে টেররিজম বা সন্ত্রাসবাদী নামটি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের দেওয়া। ইংরাজ শাসকেরা সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিয়া বিপ্লবী আন্দোলনকে বিকৃতভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাকে "বিপ্লববাদ" বলাই যুক্তিসঙ্গত।[১]

বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠন

যাহা হউক তিলক, অরবিন্দ, হরদয়াল, সাভারকর, রাসবিহারী প্রভৃতি নেতাগণ ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক। শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য তিনটি পথের সন্ধান দেন, যথা—(১) বয়কট বা নিস্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা ইংরাজ শাসন ব্যবস্থাকে অচল করা; (২) ধর্মঘট ও কৃষক বিদ্রোহের দ্বারা শৃংখলাবদ্ধভাবে সরকারের প্রতিরোধ করা; (৩) সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা শাসনযন্ত্র দখল করা। বিপ্লবী আন্দোলনের সাংগঠনিক কাজে বাংলার রাসবিহারী বসু, ডাঃ যাদুগোপাল, বারীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, মহারাষ্ট্রের বীর সাভারকর, পাঞ্জাবের অধ্যাপক হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। সশস্ত্র বিপ্লবের মানসিক ও দার্শনিক সংগঠনে তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, লালা লাজপৎ, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র, বাংলা, পাঞ্জাব ও ভারতের বাহিরে চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে বিংশ শতকের ত্রিশ দশক পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলভাবে চলে।

মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন: সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম বিকাশ মহারাষ্ট্রে লক্ষ্য করা যায়। মারাঠা জাতি অষ্টাদশ শতকে পেশবাগণের নেতৃত্বে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। ইংরাজ শক্তি মারাঠাদের পরাজিত করিয়া ভারতের শাসন ক্ষমতা ছিনাইয়া নেয়। এই কারণে

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলনের কারণ

মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বিরোধিতা বেশ প্রবল ছিল। মহারাষ্ট্র কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার কেশরী পত্রিকার মাধ্যমে মারাঠা যুবকগণের মধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের বীজ ছড়াইয়া দেন। শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসবের মাধ্যমে তিলক মারাঠাগণকে তাহাদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবাজীকে দেশের মুক্তিযোদ্ধা রূপে গণ্য করিয়া মারাঠা দেশপ্রেমিকগণ দেশের মুক্তির জন্য তাঁহার আদর্শে জীবন দিতে পণ করেন। তিলক ভগবদ্‌গীতার যে ভাষ্য রচনা করেন তাহা মারাঠা দেশপ্রেমিক-

১. বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ।

গণকে নিষ্কাম কর্মে প্রেরণা দেয়। এই কারণে মহারাষ্ট্র বিপ্লববাদের উর্বরা ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে

মহারাষ্ট্রের প্রথম বিপ্লবী ছিলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে। তিনি সরকারী কোষাগার লুঠ করিয়া টাকা যোগাড় করেন। এই টাকার দ্বারা রামোসিস নামক এক সাহসী অনুন্নত শ্রেণীকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করেন। রোহিলা নেতা ইসমাইল খানের সাহায্যে তিনি ৫০০ রোহিলা সেনাও যোগাড় করেন। ধনশালী ব্যক্তিদের বাড়ী ডাকাতি করিয়া তিনি সেনাদলের খরচ যোগাড় করেন। কিন্তু ইংরাজের গুপ্তচর ফাদকের পরিকল্পনার সন্ধান পাইয়া (১৮৭৯ খ্রীঃ) তাঁহাকে বন্দী করে। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কারাগারে যক্ষা রোগে ভুগিয়া এই দেশপ্রেমিকের মৃত্যু হয়। ফাদকে ভারতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন।

বীর সাভারকর ও অভিনব ভারত

ফাদকের মৃত্যুর পরেও মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ অম্লান থাকে। দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক দুই ভাই পুনার অত্যাচারী কমিশনার র‍্যাণ্ড ও তাঁহার সহকারী আয়ার্স্টকে হত্যা করায় (১৮৯৭ খ্রীঃ) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মদান মহারাষ্ট্রে যুব-শক্তির মনে উন্মাদনা জাগায়। বাল সমাজ, আর্য বান্ধব সমাজ প্রভৃতি বিপ্লবী সমিতিগুলি গোপনে বিপ্লবের কাজ চালায়। ঠাকুর সাহেব নামক জনৈক রাজপুত বিপ্লবী একটি গোপন সমিতির সহায়তায় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে মিত্রমেলা ও অভিনব ভারত নামে দুই বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হয়।


বিনায়ক দামোদর সাভারকর

বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন পেশায় ব্যারিষ্টার। তিনি লণ্ডন হইতে ইতালীর বিপ্লবী ম্যাৎসিনীর জীবনী মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া গোপনে দেশে পাঠান। তিনি বোমা তৈয়ারীর নিয়মাবলী ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়া লণ্ডন হইতে স্বদেশে পাঠান। এদিকে মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অভিনব ভারত সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। সাভারকরের প্রেরিত অস্ত্রে বিপ্লবীগণ অত্যাচারী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসনকে হত্যা করেন। মদনলাল ধিংড়া লণ্ডনে কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেন। তলোয়ার নামক পত্রিকার দ্বারা সাভারকর বিপ্লবীগণকে প্রেরণা দেয়। সাভারকর ইতালীর বিপ্লবী ম্যাৎসিনীর ইয়ং ইতালী দলের আদর্শকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে লাগান। দেশবাসী তাঁহাকে বীর সাভারকর উপাধি দেয়।

ইংরাজ সরকার কঠোর হাতে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী আন্দোলন দমাইয়া দেন। মহারাষ্ট্র হইতে বিপ্লবী আন্দোলনের দীক্ষা লইয়া শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় বিপ্লববাদ ছড়াইয়া দেন। মহারাষ্ট্রের বিপ্লববাদ শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় বিপ্লববাদের পথ রচনা করে। তবে মহারাষ্ট্রের বিপ্লববাদ প্রধানতঃ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে।

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবের প্রভাব

বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলনঃ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অন্যতম তীর্থভূমি ছিল বাংলাদেশ। স্বামী বিবেকানন্দের নব বেদান্তবাদ, জাতীয়তাবাদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকার মুক্তির আদর্শ এবং "দেশপ্রেমই ধর্ম" এই বাণী এবং বন্দেমাতরম মন্ত্র বাংলার বিপ্লবীগণের মানস ক্ষেত্র তৈয়ারী করে। রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা এই বিপ্লববাদকে প্রেরণা দেয়। তাছাড়া ইতালী-আবিসিনীয় যুদ্ধে (১৮৯৬ খ্রীঃ) নগ্ন পদ, পিছাইয়া পড়া হাবসীগণের নিকট ইতালীর পরাজয়, রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৫ খ্রীঃ) খর্বকায় জাপানীদের হাতে মহা শক্তিধর রাশিয়ার পরাজয় বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদের মনে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করে। তাহারা মনে করে যে শ্বেতাঙ্গ জাতি সর্বদায় অপরাজেয় একথা ধারণা করিবার কোন কারণ নাই।

বাংলায় বিপ্লবের কারণ

কলিকাতার জেনারেল এ্যাসেম্বিলিজ ইনষ্টিটিউশন অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজের ব্যায়ামাগারে কিছু ছাত্র (১৯০২ খ্রীঃ) অনুশীলন সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের নামেই এই সমিতির নামকরণ করা হয়। পরে মদন মিত্র লেনে সমিতির কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়।[১] এই সমিতির সভ্যগণ মুষ্টিযুদ্ধ, ব্যায়াম প্রভৃতির চর্চা করিতেন এবং ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী পড়িতেন। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় বিপ্লবী সংগঠনের জন্য পাঠান। যতীন্দ্রনাথ বা বাঘা যতীন বরোদা রাজ্যের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়া সামরিক বিদ্যা আয়ত্ব করেন। যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত হন। শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রনাথ বাংলায় আসিলে বিপ্লবী সমিতির কাজ খুবই জোরদার হয়। বারীন্দ্রনাথ যুগান্তর পত্রিকার মাধ্যমে বিপ্লববাদ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে শ্রীঅরবিন্দের প্রচেষ্টায় তাহার নিরসন হয়। শ্রীঅরবিন্দ ভবানী মন্দির নামক পুস্তিকার দ্বারা ধর্মীয় সংগঠনের ছদ্মবেশে বিপ্লবের কাজ চালাইবার পথ নির্দেশ দেন।

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল

১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাংলায় গণবিক্ষোভ দেখা দিলে বিপ্লবীগণ সক্রিয় হইয়া উঠেন। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ৭৫০ টাকা মাহিনার চাকুরী ছাড়িয়া বাংলায় ৭৫ টাকা মাহিনার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের চাকুরী নেন। শ্রীঅরবিন্দের বাংলায় আগমনের ফলে বিপ্লববাদ নূতন প্রেরণা পায়। তিনি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় গীতার কর্মযোগের নব

শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব

১. R. C. Majumdar—History of Freedom Movement.

ব্যাখ্যার দ্বারা বিপ্লবীগণকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। বারীন্দ্রনাথ যুগান্তর পত্রিকায় ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করেন। সন্ধ্যা প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও বিপ্লববাদ প্রচারে আগাইয়া আসে। সন্ধ্যার সম্পাদক ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে স্বদেশের স্বাধীনতা চাহিয়া তিনি বিদেশীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। অনুশীলন সমিতির একটি শাখা বিপ্লবী পুলিন দাসের নেতৃত্বে ঢাকায় স্থাপিত হয়। পরে পূর্ব বাংলার নানা স্থানে ইহার কেন্দ্র ছড়াইয়া পড়ে।


শ্রীঅরবিন্দ

বাংলার বিপ্লবীগণ এই সময় তিনটি উপদলে বিভক্ত ছিলেন। যথা—(১) একদল বিপ্লবী মনে করিতেন যে কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী হত্যা করিলে সন্ত্রাসের ফলে সরকারী শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িবে; (২) অপর একদল মনে করিতেন যে, সম্মুখ যুদ্ধের দ্বারা ক্ষমতা ছিনাইয়া লইতে হইবে; (৩) তৃতীয় দল মনে করিতেন যে, সেনাবাহিনীকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা দখল করিতে হইবে।[1]

বাংলায় বিপ্লবী উপদল

বারীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে হেমচন্দ্র কানুনগো ও উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি মানিকতলার নিকটে মুরারী পুকুরে বোমা বানাইবার কারখানা স্থাপন করেন। বারীন্দ্র অত্যাচারী ইংরাজ কর্মচারীগণকে হত্যা করিয়া শাসনযন্ত্রকে বিকল করিয়া দেওয়ার লক্ষ্য নেন। কিংসফোর্ড নামক জনৈক অত্যাচারী ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার জন্য দুই তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে নিয়োগ করা হয়। কিংসফোর্ড বিপ্লবীগণকে বিচারের সময় সর্বদা সর্বোচ্চ দণ্ড দিতেন এবং কিশোর বালক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার ফলে বিপ্লবীগণ তাঁহাকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা নেন। ইংরাজ সরকার কিংসফোর্ডের প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহাকে মজঃফরপুরে বদলী করেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংস-ফোর্ড নিধনের জন্য ঐ স্থানে যান। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া ভুলক্রমে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল বোমা নিক্ষেপ করিলে (১৯০৮ খ্রীঃ) মিসেস কেনেডি ও তাঁহার কন্যা মিস কেনেডি নামক দুই নিরপরাধা মহিলা মারা পড়েন। প্রফুল্ল ইহার পর নিজ গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯ বৎসর বয়স্ক ক্ষুদিরাম 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়া অকুতোভয়ে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বরণ করেন। ক্ষুদিরামের আত্মদান বাংলার ঘরে ঘরে প্রেরণা সঞ্চার করে। কোন গ্রাম্য কবি ক্ষুদিরামের ফাঁসি উপলক্ষে "এবার বিদায় দাও মা ফিরে আসি" গানটি রচনা করিলে সমগ্র বাংলায় তাহা ছড়াইয়া পড়ে।

সন্ত্রাসের দ্বারা সরকার অচল করার চেষ্টা: ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল

১. বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনী কিশোর গুহ।

ইহার পর পুলিশ মুরারী পুকুরে বোমার আস্থানা ধরিয়া ফেলে এবং শ্রীঅরবিন্দ সহ মোট ৩৬ (বা ৪৭) জন বিপ্লবীকে আসামী করিয়া আলিপুর আদালতে বোমা নির্মাণ ও রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। নরেন গোঁসাই নামে এক দুর্বলচিত্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট সকল গোপন কথা ফাঁস করিয়া দেওয়ায় কানাইলাল ও সত্যেন নামে দুই সহকর্মী বিপ্লবী নরেনকে জেলের মধ্যে গুলি করিয়া মারেন। কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসি হয়। শ্রীঅরবিন্দ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের চেষ্টায় খালাস পান। বারীন্দ্র, উল্লাসকর প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।



ক্ষুদিরাম বসু

ইহার পর শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবের সংস্পর্শ ছাড়িয়া পণ্ডিচেরীতে আধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন হন। আলিপুর বোমার মামলায় মোট ১৬ জন বিপ্লবী দণ্ডিত হন। এই মামলার ফলে বিপ্লবীগণ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহার পর অনুশীলন দল বিপ্লবের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নেয়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯০৭—১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে বিপ্লবীগণ প্রায় ৬৪ জন সরকারী লোককে হত্যা করে। ১৯০৮ খ্রীঃ বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে কলিকাতার ওভারটুন হলে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস নিহত হন।

বাংলার বিপ্লবীগণের অপর দল বিদেশ হইতে অস্ত্র যোগাড় করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চালান। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন, ডাঃ যাদুগোপাল, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বা মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছিলেন এই মতবাদে বিশ্বাসী। ইঁহারা ইংরাজের শত্রু জার্মানীর নিকট অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান। ইতিমধ্যে ইঁহারা কলিকাতার অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর দোকানের ১০ বাক্স মাউজার পিস্তল হাত করেন। ইতিমধ্যে খবর আসে যে, জার্মানী হইতে মাভেরিক ও আরও দুইটি জাহাজে করিয়া অস্ত্র আসিতেছে।

সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচেষ্টা : বাঘা যতীন

এই অস্ত্র সুন্দরবনের রায় মঙ্গল, উড়িষ্যার বালেশ্বরে ও হাতিয়ায় নামাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ এই ছদ্মনাম লইয়া বাটাভিয়া বা জাভাতে যান। বাঘা যতীন তাঁহার সঙ্গীগণকে লইয়া বালেশ্বরে চলিয়া যান। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাজের সহিত কলিকাতার সংযোগ ছিন্ন করিয়া মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় সৈন্য আসার রাস্তা বন্ধ করা। কিন্তু ইতিমধ্যে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হইয়া যায়। মাভেরিক জাহাজ ভারতে আসিতে ব্যর্থ হয়। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট একদল সেনা লইয়া বাঘা যতীনকে বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে ঘিরিয়া ফেলেন। বাঘা যতীন ইংরাজের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে (১৯১৫ খ্রীঃ) প্রাণ দেন।

তাঁহার তিন সঙ্গী ধরা পড়েন। এইভাবে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরাজ শাসন অচল করার চেষ্টা চলে।

১৯১৫-১৯২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত থাকে। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের দিকে জাতি ঝুঁকিয়া পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন বিফল হইলে বিপ্লববাদ পুনরায় মাথা তুলে। ১৯২৪ খ্রীঃ গোপীনাথ সাহা অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এজন্য গোপীনাথের ফাঁসি হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈয়ারী মামলা উপলক্ষে ৮৭ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। সুভাষচন্দ্র বসুকেও এজন্য সন্দেহক্রমে আটক করা হয়। ১৯২০ খ্রীঃ বিনয় বসু ঢাকার পুলিশ সুপার হডসন ও ইনস্পেক্টর লোম্যানকে হত্যা করিয়া কলিকাতায় গা ঢাকা দেন। এই বৎসর বিনয়-বাদল-দীনেশ তিন বিপ্লবী সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে অচল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন। তাঁহারা কারা বিভাগের অধ্যক্ষ সিমসনকে গুলি করেন। কিন্তু টেগার্টের নেতৃত্বে একদল পুলিশ তাঁহাদের ঘিরিয়া ফেলিলে বিনয় ও দীনেশ নিজ মস্তকে গুলি করেন। ইহাতে বিনয়ের মৃত্যু হয়। দীনেশ বন্দী হন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। বাদল ঘটনাস্থলে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন।

বিনয়-বাদল-দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান

বাংলার বিপ্লবীগণের অন্যতম দুঃসাহসিক কাজ ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন। বিপ্লবী শিরোমণি সূর্য সেন বা মাষ্টারদা ছিলেন এই অভিযানের নায়ক। তিনি মনে করিতেন যে, চট্টগ্রামকে বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী পন্থায় দখল করিলে দেশের অন্য স্থানেও অনুরূপ বিপ্লব ঘটিবে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের নির্দেশে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি বিপ্লবী চট্টগ্রামের দুইটি অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ অফিস, রেল ষ্টেশন দখল করেন। সূর্য সেন চট্টগ্রামে ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংরাজ সেনা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিলে বিপ্লবীগণ জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় লইয়া তিন দিন ধরিয়া প্রবল যুদ্ধ চালান। শেষ পর্যন্ত সূর্য সেন ও কয়েকজন পলাইতে সক্ষম হন। জালালাবাদের যুদ্ধে দশ জন বিপ্লবী ও নিকটস্থ কর্ণফুলী নদীর যুদ্ধে ছয় জন বিপ্লবী মারা পড়েন। বহু ইংরাজ পুলিশ নিহত হয়। সূর্য সেন পরে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ খ্রীঃ তাঁহার ফাঁসি হয়। অনন্ত সিংহ প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। চট্টগ্রাম বিপ্লব বাংলার যুব সমাজকে এমনই মাতাইয়া দেয় যে শান্তি ও সুনীতি নামে দুই নারী বিপ্লবী কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেনসকে হত্যা করেন। বীণা দাস (১৯:২ খ্রীঃ) এণ্ডারসনকে

চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন : সূর্য সেন



সূর্য সেন

গুলি করেন। ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বিপ্লবীগণ পেডি, ডগলাস ও বার্জ নামে তিনজন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটকে পর পর হত্যা করেন। ইহার পর বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন: মহারাষ্ট্র ও বাংলার ন্যায় বীরভূমি পাঞ্জাবও বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়। আর্য সমাজ আন্দোলনের কিছু নেতা বাংলার বিপ্লবীগণের সংস্পর্শে আসিয়া পাঞ্জাবে বিপ্লববাদ ছড়ান। এছাড়া লালা লাজপৎ রায়ও বিপ্লববাদকে সমর্থন জানান। পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন অধ্যাপক হরদয়াল। তিনি ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগী। ছাত্রগণের মধ্যে তিনি বিপ্লবী মতবাদ ছড়ান। বাংলার বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্য। তিনি পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা এবং সেনাদলকে বিদ্রোহের জন্য প্রভাবিত করিয়া দেশ-জননীর মুক্তির কথা তিনি ভাবিতেন।

সেনাদলের সাহায্যে বিপ্লব: রাসবিহারী বসু



রাসবিহারী বসু

পাঞ্জাবের বিপ্লবীগণ রাসবিহারীর দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯১২ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতীর পিঠে চড়িয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইলে রাসবিহারী মতান্তরে তাঁহার সহকর্মী বসন্ত বিশ্বাস বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। ইহার পর তিনি পাঞ্জাবে গা ঢাকা দেন। ইহার পর বিদেশ হইতে অস্ত্র আনিয়া বিপ্লব এবং সেনাদলকে বিদ্রোহে নামাইবার জন্য তিনি প্রস্তুতি চালান। এদিকে হরদয়ালের প্রভাবে আমেরিকার গদর পার্টি (বিপ্লবী দল) স্থাপিত হয়। গদর পার্টিও পাঞ্জাবে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়ায়। ভাই পরমানন্দ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন।

রাসবিহারী পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীগণের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা স্থির করেন। ইহাতে ঠিক হয় যে আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডির ভারতীয় সেনাদল ইঙ্গিত পাইলেই দেশের মুক্তির জন্য অস্ত্র ধরিবে। এই সঙ্গে বিদেশ হইতে আনীত অস্ত্র লইয়া বিপ্লবীগণও ইংরাজের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ১৯১৫ খ্রীঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী এই অভ্যুত্থানের দিন ধার্য হয়। ইতিমধ্যে কৃপাল সিং নামে এক বিশ্বাসঘাতক সেনা পরিকল্পনার কথা ইংরাজের নিকট ফাঁস করিয়া দেয়। ফলে

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। ভাই পরমানন্দের ফাঁসি হয়। রাসবিহারী জাপানে পলায়ন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি আজাদ হিন্দ সংঘ স্থাপন করিয়া পুনরায় ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের চেষ্টা চালান।[১] পরে নেতাজী এই দায়িত্ব তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ করেন। এছাড়া রামপ্রসাদ বিসমিল, চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎ সিং ভারতে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র স্থাপনের সংকল্প লইয়া বিপ্লবের পথে নামেন। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ করিলে পুলিশ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও যতীন দাশ প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। ভগৎ সিংহের ফাঁসি হয়। যতীন দাশ ৬৪ দিন অনশন করিয়া আত্মত্যাগ করেন।

রাসবিহারীর বিপ্লব পরিকল্পনা

ভারতের বাহিরে বিপ্লবী আন্দোলন : ভারতবাসীর মুক্তির জন্য যখন বিপ্লবীগণ প্রাণ দেন, তখন কিছু সংখ্যক ভারতীয় দেশপ্রেমী ভারতের বাহিরে থাকিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা চালান। শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে থাকার সময় "পদ্ম ও ছুরিকা" নামে এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। ইহার পর শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মা ও রাণা সিং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে এক বিপ্লবী সমিতি গঠনের চেষ্টা করেন। মাদাম ভিকাজী রুস্তমজী কামা নামে এক ধনী পার্শী মহিলা বিলাতে আসিয়া বিপ্লবীগণের সহিত যোগ দেন। মাদাম কামাকে "ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী" বলা হয়। তাঁহার সহিত বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর, হরদয়াল প্রভৃতি যোগ দেন। ১৯০৭ খ্রীঃ জার্মানীর ষ্টুটগার্ট শহরে মাদাম কামা একটি তিনরঙা পতাকার নীচে বক্তৃতা দেন। এই পতাকার রং ছিল লাল, সবুজ ও হলুদ। ইহাকেই ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা বলা যায়। ইহাতে হিন্দীতে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র লিখিত ছিল। ইংরাজ সরকার সাভারকরকে গ্রেপ্তার করিলে বিলাতে বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার জন্য ছড়াইয়া পড়েন। ১৯০৭ খ্রীঃ বিপ্লবী তারক নাথ দাশ ও তাঁহার সহযোগিরা কালিফোর্নিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে অধ্যাপক হরদয়ালের নেতৃত্বে আমেরিকায় গদর পার্টি স্থাপিত হয়। গদর কথাটির অর্থ হইল 'বিপ্লব'। গদর পার্টির কর্মীগণ বিদেশ হইতে অস্ত্র আনিয়া ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এছাড়া রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, চন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারত-জার্মান সমিতি স্থাপন করিয়া জার্মানীর নিকট হইতে বিপ্লবীগণের জন্য অস্ত্র সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন।

মাদাম কামার গদর পার্টি

বিপ্লবী আন্দোলনের বিফলতার কারণ : ভারতে সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলনের বিফলতার প্রধান কারণ এই ছিল যে, সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে তেমনভাবে প্রভাবিত হয় নাই। বিপ্লবীগণকে সব কাজ গোপনে করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে জনসাধারণকে আন্দোলনের লক্ষ্য ও পন্থা বুঝাইয়া বলা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক, কৃষকগণকে এই আন্দোলনের শরিক না করায় এই আন্দোলনের শিকড় তেমন গভীর ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও

১. কেহ কেহ বলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই সংঘ স্থাপন করেন।

উচ্চবর্ণের লোকেরাই ইহাতে প্রধান অংশ নেন। বাংলার প্রখ্যাত বিপ্লবীগণের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ১৩ জন বৈদ্য, ৮৭ জন কায়স্থ। ফলে এই আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের আন্দোলন। মুসলমান সম্প্রদায় ইহা হইতে দূরে থাকেন। তৃতীয়তঃ, বিপ্লবের পন্থা লইয়া মতভেদ থাকায় এই আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়ে। কেহ কেহ ব্যক্তি হত্যা ও সন্ত্রাসের উপর জোর দেন। অপরদিকে কেহ কেহ সশস্ত্র সংগ্রামের উপর আস্থা স্থাপন করেন। চতুর্থতঃ, বিপ্লবীগণের মধ্যে কেহ কেহ খুবই দাম্ভিক ও অহংকারী চরিত্রের লোক ছিলেন। আবার কেহ নূতন কিছু করিবার নেশায় ইহাতে যোগ দেন। সকল বিপ্লবী আদর্শকে পণ করিয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিতে রাজী ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। পঞ্চমতঃ, ইংরাজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ছিল খুবই পটু। তাহারা বিপ্লবীগণের গোপন খবর বাহির করে। বিপ্লবীগণের পক্ষে এককভাবে ইংরাজকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা : ইংরাজের ভেদনীতি

(Birth of the Muslim League : Policy of Divide and Rule)

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা : সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (Birth of the Muslim League) : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও চরমপন্থীগণ ভারতবাসীর স্বায়ত্ব শাসনের দাবী জানাইলে ইংরাজ সরকার আশঙ্কিত হন। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ফলে ইংরাজ শাসকেরা মনে করেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে উহাকে দমাইতে না পারিলে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব রক্ষা করা যাইবে না। এই কারণে তাঁহারা ভেদনীতি খাটাইয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার ব্যবস্থা নেন। চতুর ইংরাজ শাসকেরা লক্ষ্য করেন যে ভারতীয় জনসংখ্যার বেশ বড় অংশ হইল মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদের যদি কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় তবে জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল হইয়া পড়িবে। চরমপন্থী নেতাগণও হতাশ হইয়া পড়িবেন। এই কথা বুঝিয়া ধুরন্ধর ইংরাজ শাসকগণ মুসলিম সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা চালান। ভারত সচিব স্যার চার্লস উড (১৮৬১ খ্রীঃ) এবং ইংরাজ কর্মচারী হাণ্টার, কর্লভিন প্রভৃতিও ইংরাজ সরকারকে এই নীতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। লর্ড ডাফরিন এই দিকে বিশেষ নজর দেন বলিয়া জানা যায়।[১] ডাফরিন খোলাখুলিভাবে বহু জাতির বাসভূমি ভারতে সকল জাতির প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয়

ইংরাজের ভেদনীতি

১. British Paramountcy and Indian Rennissance

কংগ্রেসকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনের এক সংশোধনী আইন দ্বারা পরোক্ষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ, শিক্ষায় অনগ্রসর, শিল্প বাণিজ্যে পিছাইয়া পড়া মুসলিমগণের উন্নতির জন্য হিন্দু সমাজের কোন মাথাব্যথা ছিল না। দেশের এক অংশ পিছাইয়া পড়িলে অপর অংশ আগাইতে পারে না এই বোধ তাহাদের ছিল না। জওহরলাল নেহরুর মতে "হিন্দুদের সহিত অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ব্যবধান মুসলিমদের মনে ভীতি সৃষ্টি করিত"। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজের লেখা ভারতের ইতিহাসে মুসলিমদের বহিরাগত আক্রমণকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। মুসলিমগণ যে ভারতীয় জনসাধারণের অংশ, ভারতের উন্নতি যে তাঁহাদের বাদ দিয়া হইতে পারে না এবং ভারতবর্ষ তাঁহাদের মাতৃভূমি এই ধারণা বহু হিন্দু মনে রাখেন নাই। ইহার ফলে মুসলিম সমাজে বিচ্ছিন্নতা বোধ বাড়ে। তৃতীয়তঃ, হিন্দু সংস্কারকেরা বেদ ও বেদান্তের আলোকে সমাজের উন্নতির চেষ্টা করিলে স্বভাবতই মুসলিম সংস্কারকেরা মুসলিম আদর্শকে বড় করিয়া ধরেন। ইহার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি ও জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে বাধা পায়। চতুর্থতঃ, সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা হিন্দু ধর্মের আদর্শকে বড় করিয়া ধরায় মুসলিমগণ ভীত হইয়া পড়েন। ধর্ম নিরপেক্ষতার দৃষ্টি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়। ইহার ফলে ইংরাজ ভেদনীতি খাটাইবার সুযোগ পায়। এদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলনের নেতাগণ বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পঙ্গু করিয়া দেন। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেবের (Theodore Beck) প্রভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ জাতীয়তা বিরোধী সাম্প্রদায়িক মত প্রকাশ করিয়া মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করেন। স্যার সৈয়দ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর লোক। ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ সরকারী পদে নিযুক্ত হইলে এবং মুসলিম অভিজাতগণ ইংরাজী না শিখিয়া পিছাইয়া পড়িলে, তিনি মনে করেন যে দেশের শাসন ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে চলিয়া যাইবে। এদিকে জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা দাবী করিলে স্যার সৈয়দ মনে করেন যে শিক্ষিত হিন্দুগণ নির্বাচনে জিতিয়া শাসন ক্ষমতা হাতাইয়া লইবে। সংখ্যালঘু পিছাইয়া-পড়া মুসলিমগণ বঞ্চিত হইবেন। এই কথা মনে করিয়া স্যার সৈয়দ মুসলিম সমাজকে কংগ্রেস আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে বলেন। তিনি মুসলিমগণকে ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানাইয়া নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার পরামর্শ দেন। এমন কি তিনি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে দুই পৃথক জাতি বলিয়া বলেন। কংগ্রেসকে তিনি হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার বিখ্যাত লক্ষ্মৌ বক্তৃতায় (১৮৮৭ খ্রীঃ) বলেন যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসন ব্যবস্থার দাবী ভারতীয় মুসলিমগণের স্বার্থ বিরোধী। কারণ নির্বাচনের দ্বারা সংখ্যাগুরু হিন্দুগণ সংখ্যালঘু মুসলিমগণের উপর নিজ আধিপত্য চাপাইয়া

হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ; স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলিগড় আন্দোলন

দিবে। স্যার সৈয়দের এই বিচ্ছিন্নবাদী মতবাদ ভারতীয় মুসলিম সমাজের উঁচু তলার বহু নেতাকে প্রভাবিত করে। মুসলিম নবাব, জমিদারগণ স্যার সৈয়দের মতে প্রভাবিত হইয়া জাতীয়তা ও কংগ্রেস বিরোধী মত প্রচারে নামিয়া পড়েন।[১] ইংরাজ সরকার আলিগড় সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদকে বিশেষ কাজে লাগান।

বঙ্গভঙ্গ নীতি কার্জনের ভেদনীতি

লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হইয়া বিলাতে মুসলিম সমাজের বিশেষ অধিকার সমর্থন করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দমন করার চেষ্টা করেন।[২] তিনি বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পূর্ব বাংলায় একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করিয়া মুসলিম সমাজে বিচ্ছিন্নতাবাদকে দৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে তিনি বহু টাকা সরকারী ঋণ দিয়া সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নবাদের সমর্থকে পরিণত করেন। লর্ড কার্জন যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ান তাহা পূর্ব বাংলার নূতন লাট ব্যামফিল্ড ফুলার আরও বিষাইয়া তুলেন। তিনি মুসলিমগণকে তাঁহার "সুয়োরাণী" বলিয়া তাহাদের স্বার্থ সাধনের বিশেষ প্রতিশ্রুতি দেন। বরিশাল ও খুলনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে।

আগা খাঁর দৌত্য: লর্ড মিণ্টোর ভেদনীতি

ইতিমধ্যে ইংরাজ সরকার নূতন শাসন সংস্কার চালু করিবেন বলিয়া জানা যায়। আলিগড় বা বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম নেতাগণ ইহাতে ভয় পান যে, নূতন শাসন সংস্কার চালু হইলে হিন্দুগণের হাতে সকল ক্ষমতা চলিয়া যাইবে। এজন্য তাঁহারা মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রীঃ সিমলায় বড়লাট মিণ্টোর নিকট এক আর্জি পেশ করেন। আলিগড় কলেজের নূতন অধ্যক্ষ আর্চিবল্ড সাহেব এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। আগা খাঁ তাঁহার আর্জিতে ভারতীয় মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দাবী জানান। মুসলিম নেতাগণের এই আলাদা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব দেখিয়া চতুর লর্ড মিণ্টো মুসলিমগণকে হিন্দু আধিপত্য হইতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। লর্ড মিণ্টোর এই আশ্বাসের ফলে হিন্দু-মুসলিম ভেদনীতির বীজ ভালভাবে রোপিত হয়। মুসলিম নেতাগণের স্বতন্ত্র দাবীর কথা জোর গলায় প্রচার করিয়াই ইংরাজ সরকার ইহার পর বলিতে থাকেন যে জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমগণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

আগা খাঁর আত্মজীবনী হইতে জানা যায় যে, সিমলায় থাকিবার সময় মুসলিম নেতাগণ উপলব্ধি করেন যে তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন না করিলে মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র দাবী-দাওয়া আদায় করা যাইবে না।[৩] সম্ভবতঃ লর্ড মিণ্টো এই বিষয়ে মুসলিম নেতাগণকে গোপনে উৎসাহ দেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র দল স্থাপিত হইলে জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল হইয়া পড়িবে। এদিকে মুসলিম নেতা আমীর আলি

১. History of Pakistan—Gankovosky and Polonkaya.
২. Tripathy—The Extremist Challenge.
৩. Tripathy—The Extremist Challenge.

তাঁহার পত্রিকায় (Nineteenth Century) স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনৈতিক দল স্থাপনের দাবী জানান। নবাব সলিমুল্লাহ বিশিষ্ট মুসলিম নেতাগণের নিকট একটি মুসলিম রাজনৈতিক দল স্থাপনের প্রস্তাব পাঠান। ১৯০৬ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকা শহরে সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সর্বভারতীয় লীগ নামে দল গঠিত হয়। মহামান্য আগা খাঁ ইহার সভাপতি, মহসীন উল-মুলক ও ভিকার উল-মুলক ইহার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগের সংবিধানে এই দলের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লওয়া হয়, যথা (১) ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্থাপন ; (২) ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা এবং সরকারের নিকট এ বিষয়ে দরবার করা ; (৩) লীগের উপরোক্ত আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরীভাবের নিরসন করা।

লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব

মুসলিম লীগ স্থাপিত হইবার ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ উগ্র হইয়া উঠে। ইংরাজ শাসকগণের গুপ্ত প্ররোচনায় এবং কিছু সংখ্যক নেতার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রভাবে লীগ নিজেকে ভারতীয় মুসলিমগণের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে দাবী করে। জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমগণের প্রতিনিধি নহে ইহাই লীগের বক্তব্য হয়। এছাড়া লীগ ১৯৩৭ খ্রীঃ মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করিয়া ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুই পৃথক জাতি বলিয়া ঘোষণা করে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভারত ব্যবচ্ছেদ দাবী করে। ইহার ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে বহু স্বচ্ছ বুদ্ধি, উদার প্রাণ, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা লীগের সাম্প্রদায়িক আদর্শে বিশ্বাস করিতেন না। মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, বদরুদ্দিন তায়েবজী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতাগণ লীগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার ইঁহাদের মত উপেক্ষা করিয়া লীগের নেতাগণকেই প্রাধান্য দিয়া ভেদ নীতি খাটান।

মুসলিম লীগের কার্যকলাপ, ১৯০৬—১৯১৯ খ্রীঃ (Early activities of the Muslim League) ঃ ১৯০৬ খ্রীঃ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছুকাল লীগের নেতৃত্ব আলিগড় সম্প্রদায়ের হাতে থাকে। এই সম্প্রদায় ইংরাজ সরকারের প্রতি অচলা ভক্তি এবং মুসলিমগণের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে মুসলিম লীগের শাখা স্থাপিত হইলে উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমগণ প্রায় সকলেই লীগের আদর্শকে সমর্থন জানান। ১৯০৮ খ্রীঃ লীগের প্রাদেশিক শাখা স্থাপিত হয়। ধনী মুসলিম জমিদারগণ ইহার নেতৃত্ব দেন।[১] ১৯১৯ খ্রীঃ মর্লি-মিণ্টো আইনে মুসলিমগণের স্বতন্ত্র নির্বাচন চালু হইলে লীগ নেতাগণ গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, মুসলিমগণের স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া ক্ষুন্ন করা হইয়াছে।

লীগের সাম্প্রদায়িক দাবী : মর্লি-মিণ্টো আইন

---

১. History of Pakistan—Gankovsky ও Polonskaya.

ইতিমধ্যে মুসলিম লীগে একশ্রেণীর উগ্রপন্থী মধ্যবিত্ত মুসলিম নেতা ঢুকিয়া পড়েন। ইঁহারা পুরাতন ইংরাজভক্ত অভিজাত শ্রেণীর কর্তাভজা নীতিতে বিশ্বাস করিতেন না। লেমানী, শিবলী, মহম্মদ আলি প্রভৃতি নবীন নেতাগণ দাবী করেন যে মুসলিম লীগ ইংরাজ ভজনা করিয়া জাতীয় আন্দোলন হইতে অনর্থক দূরে থাকিতেছে। লীগের উচিত জাতীয় আন্দোলনের সামিল হওয়া। এই নেতাগণ আগা খাঁ প্রভৃতি পুরাতন নেতাগণকে ক্রমে কোণঠাসা করিয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে বলকান যুদ্ধের ফলে ইসলামীয় ধর্ম জগতের খলিফা তুরস্কের সুলতানের রাজ্য আক্রান্ত হইলে এবং ইংরাজ সরকার সুলতানের বিরোধিতা করিলে ভারতীয় মুসলিম নেতাগণের ইংরাজ ভক্তি কমিয়া যায়। ফলে ১৯১২ খ্রীঃ লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে লীগের সংবিধান পাল্টাইয়া ফেলা হয়। অবিমিশ্র ইংরাজ ভক্তি বাদ দিয়া ভারতে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠাকেই লীগের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়।[১] নবীন মতের নেতাগণ লীগের নেতৃত্ব লাভ করেন।

লীগে নবীন নেতৃত্ব
স্বায়ত্ব শাসন দাবী

ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিলে একটি নূতন যুগের সূচনা হয়। জিন্নাহ ছিলেন তীক্ষ্ম বুদ্ধিধর আইনজীবি। তিনি প্রথমে কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি কংগ্রেস নেতাগণকে বুঝান যে মুসলিমগণের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী না মানিয়া লইলে মুসলিম নেতাগণের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না। অপর দিকে লীগ নেতাগণকে তিনি বুঝান যে জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগিতা না করিলে ভারতের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী কোনদিনই পূর্ণ হইবে না। এদিকে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে তুরস্কের সুলতানের বিরোধিতা করায় লীগ নেতাগণ ইংরাজ সরকারের উপর ক্ষেপিয়া যান। সুতরাং জিন্নাহর চেষ্টায় কংগ্রেস ও লীগ লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রীঃ) সম্পাদন করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার ⅓ আসন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কংগ্রেস আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য মুসলিমগণের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী মানিয়া নেয়। কংগ্রেস ও লীগ যুগ্মভাবে ভারতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বায়ত্ব শাসন লাভের জন্য আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। কংগ্রেস ও লীগ দাবী করে যে আইন সভার ⅘ সভ্যকে নির্বাচিত করিতে হইবে। এছাড়া দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া সমস্ত বিষয়ে আইন সভাকে ক্ষমতা দিতে হইবে। ক্রমে লীগের নেতৃত্ব মহম্মদ আলি জিন্নাহর হাতে পড়ে।

লীগ-কংগ্রেস ঐক্য
লক্ষ্ণৌ চুক্তি: মহম্মদ
আলি জিন্নাহ

———

১. History of Pakistan.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা

(Separate Electorate)

স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা (The System of Separate Communal electorate) : ভারতের জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকগণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আমদানী করেন। ইংরাজ শাসকেরা বুঝিতে পারেন যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন, ভারতীয়গণকে উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগ প্রভৃতি যে সকল দাবী করিতেছে তাহা পূরণ করিলে ইংরাজ আধিপত্য বিনষ্ট হইবে। কংগ্রেসের এই সকল দাবী বানচাল করিবার জন্য তাঁহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ান। তাঁহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু নেতাকে এই কথা বুঝান যে ভারতে হিন্দুগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন চালু হয় তবে হিন্দুগণ বেশী ভোট ও বেশী আসন পাইয়া ক্ষমতা দখল করিবে। ফলে মুসলিম সম্প্রদায় অধিকারহীন হইয়া কোনঠাসা হইয়া পড়িবে, মুসলিম সম্প্রদায় যথোচিত সুযোগ পাইবে না। যদি মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করিয়া স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় তবে তাহাদের দাবাইয়া রাখা যাইবে না।

ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সাম্প্রদায়িক নীতি

স্যার সৈয়দ আহমদ, মহসীন উল-মুলক প্রভৃতি মুসলিম নেতাগণও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া ইংরাজের এই পরামর্শ শিরোধার্য করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন যে হিন্দু ও মুসলিম হইল পৃথক জাতি। কংগ্রেস মুসলিমদের প্রতিনিধি নহে। স্যার সৈয়দ ও তাঁহার সমর্থকেরা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র নির্বাচন ও আইনসভায় আসন সংরক্ষণের দাবী জানান। আগা খাঁর নেতৃত্বে এক মুসলিম প্রতিনিধি দল ১৯০৬ খ্রীঃ বড়লাট মিন্টোর নিকট মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র স্বার্থ রক্ষার আবেদন জানান। আগা খাঁ বলেন যে (১) হিন্দুগণের ভোটে হিন্দু ও মুসলিম ভোটে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) সংখ্যালঘু মুসলিমগণের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা হিন্দু প্রতিনিধির অনুপাতে বাড়াইতে হইবে। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্কিবল্ড সাহেব আগা খাঁর আবেদন পত্রের খসড়া রচনা করেন।

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দাবী

১৮৯২ খ্রীঃ ভারতীয় কাউন্সিল আইনের এক সংশোধনীতে ইংরাজ সরকার সর্বপ্রথম মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের সূত্রপাত করেন। ইহার পর মুসলিম লীগ নেতা আমীর আলি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করিয়া বিলাতে জোর

প্রচার চালান। বিলাতের টাইমস পত্রিকা এই দাবীর সমর্থনে প্রচার চালায়। বড়লাট লর্ড মিণ্টোও ভারতীয় মুসলিমদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি ভারত সচিবকে বলেন যে কেবলমাত্র মুসলিম ভোটে মুসলিম প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করিতে হইবে।[১] ইহার ফলে ১৯০৯ খ্রীঃ মর্লি-মিণ্টো আইনে মুসলিমগণের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন চালু হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভায় ৬ জন মুসলিম সভ্যকে কেবলমাত্র মুসলিম ভোটে নির্বাচিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতেও অনুরূপ-ভাবে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন চালু হয়। ভারতীয়গণের জাতীয়তাবাদী ঐক্যে কুঠারাঘাত পড়ে। মহাত্মা গান্ধী এজন্য মন্তব্য করেন যে "মর্লি-মিণ্টো সংস্কার আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে।"[২] দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম সম্প্রদায়ের নজির ধরিয়া ভারতের শিখ ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবীর কথা উঠে। ভারতের জাতীয় ঐক্যে এই ফাটল সৃষ্টি বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস ও লীগ ১৯১৬ খ্রীঃ লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির দ্বারা কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইন সভার ⅓ সভ্যের আসন মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ছাড়িয়া দেয়। কংগ্রেস আপাততঃ পৃথক নির্বাচনের দাবী মানিয়া নেয়।

মর্লি-মিণ্টো আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচন লক্ষ্ণৌ চুক্তি

কিন্তু লক্ষ্ণৌ চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি এই সমঝোতাকে ভাঙিয়া দেয়। ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনেও সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বহাল রাখা হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম ভোটে ৩০ জন মুসলিম সভ্য ও শিখ ভোটে ২ জন শিখ সভ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। প্রাদেশিক আইন সভায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা বহাল থাকে। জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরাজের এই ভেদনীতির তীব্র নিন্দা জানায়। কিন্তু পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকে।

মণ্ট-ফোর্ড আইন; স্বতন্ত্র নির্বাচন

কুটবুদ্ধি ইংরাজ জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করার এই সুযোগ ছাড়ে নাই। মুসলিম সম্প্রদায়ের তথাকথিত স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান ইহা প্রমাণ করার মিথ্যা চেষ্টা চলে। দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম নেতাগণ ইংরাজের প্রতি অনুগত থাকেন। তৃতীয়তঃ, কংগ্রেসের আদর্শ যথা হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই এবং তাহারা একই ভারতীয় জাতি তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ, মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমে জাতীয় জীবনস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র অধিকারের কথা ভাবিতে আরম্ভ করেন। মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমে পৃথক রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে আরম্ভ করেন। পরিণামে ভারত ব্যবচ্ছেদ হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। ইংরাজের ভেদনীতি সফল হয়।

স্বতন্ত্র নির্বাচনের কুফল

---

১. Tripathy—Extremist Challenge.

২. "The Morley-Minto Reforms have been our undoing."

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা আন্দোলন : অহিংস অসহযোগ : খিলাফৎ আইন অমান্য আন্দোলন

(Towards Freedom : Non-Violent Non-Co-operation : Khilafat : Civil Disobedience Movement)

অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন ১৯২০—২২ খ্রীঃ (Non violent, Non-co-operation Movement) : ১৯২০ খ্রীঃ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাহার ৩৫ বৎসরের পুরাতন "আবেদন নীতি" বা "রাজনৈতিক ভিক্ষা বৃত্তি"কে ত্যাগ করিয়া সক্রিয় অহিংস আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। এই আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল অহিংসা ও অসহযোগ। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের সেনাপতি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর স্বরাজ লাভ।

অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০ খ্রীঃ) পশ্চাতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক কারণ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবাসী ইংরাজকে যুদ্ধ জয়ে বিশেষ সাহায্য করে। ভারত সরকার এই যুদ্ধে ভারতীয় রাজস্ব হইতে ১২ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করেন। এছাড়া ভারতীয়গণ ইংরাজ সরকারকে ৬ কোটি ২১ লক্ষ পাউন্ড চাঁদা যুদ্ধ বাবদ দেয়। ১২½ লক্ষ ভারতীয় সেনা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইংরাজের হইয়া লড়াই করে এবং ১০ হাজার ভারতীয় সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। ভারতীয়গণ আশা করে যে ইহার বিনিময়ে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিবে। ১৯১৯ খ্রীঃ মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। স্বায়ত্ব শাসন দানের পরিবর্তে ডায়ার্কী বা দ্বৈরাজ্য বা দ্বৈত শাসন এবং সাম্প্রদায়িক ভোট প্রচলন করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মণ্ট-ফোর্ড আইন কুঠারাঘাত করে। কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে এই আইনকে "অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও হতাশাময়" (Inadequate, un-satisfactory and dissapointing) বলা হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসকে দাবী আদায়ের জন্য সক্রিয় আন্দোলনের পথ ধরিতে হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর প্রত্যাশা পূরণে মণ্ট-ফোর্ড আইনের ব্যর্থতা

এদিকে যুদ্ধের দরুন দরকারী জিনিষপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হইয়া পড়ে। পাইকারী মালের দাম ১০০% ভাগ বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দাম ৯৩% বাড়ে। ইহার ফলে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ লোকের পক্ষে সংসার নির্বাহ কঠিন হইয়া পড়ে। চাকুরীজীবিগণ নির্দিষ্ট আয়ে সংসার প্রতিপালন করিতে হিমসিম খায়। এদিকে ভূমি রাজস্বের বর্ধিত হারের ফলে চাষী নিঃস্ব হইতে থাকে। যুদ্ধের সময় শিল্পপতিগণ মাল বেচিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিলেও

যুদ্ধকালীন মূল্য বৃদ্ধি ও জনসাধারণের অসন্তোষ

শ্রমিককে খুবই নীচু হারে মজুরী দেওয়া হয়। এজন্য শ্রমিকেরা অসন্তুষ্ট ছিল। যুদ্ধের পর প্রচণ্ড মন্দা দেখা দিলে ভারতীয় কলকারখানাগুলি বন্ধ হইতে থাকে। ফলে শ্রমিক ছাঁটাই আরম্ভ হয়। এই সকল অর্থনৈতিক কারণে সকল শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

রাউলাট আইন ও জালিওয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য সরকার রাউলাট আইন (১৯১৯ খ্রীঃ) নামে এক প্রচণ্ড উৎপীড়নমূলক আইন চালু করেন। এই আইনের বলে বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ বিচারে দণ্ড দেওয়া যাইত। এই রায়ের উপর কোন আপীল করা চলিত না। রাউলাট আইনের স্বেচ্ছাচারকে নিন্দা জানাইয়া জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৯ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল "ভারত বন্ধ" আহবান করে। রাউলাট আইনের প্রতিবাদের জন্য পাঞ্জাবের একটি জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাচীর ঘেরা স্থানে ১৩ই এপ্রিল একটি শান্তিপূর্ণ সভা করে। ইংরাজ সেনাপতি মাইকেল ডায়ার এই নিরস্ত্র ও নিরীহ জাতির উপর নির্মম গুলি বর্ষণ করিলে শিশু, নারীসহ প্রায় এক হাজার লোক নিহত হয়। এছাড়া পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করিয়া লোকজনকে বেত্রাঘাত, নির্যাতন এবং শহরে জল ও বিদ্যুৎ বন্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। ৫১ জন লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায় সমগ্র দেশ শিহরিয়া উঠে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই বর্বরতার প্রতিবাদে ইংরাজ সরকারের নেওয়া "নাইট" উপাধি ত্যাগ করেন। জাতীয় কংগ্রেস এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করে। এই বীভৎসতার প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসকে কর্মপন্থা স্থির করিতে হয়।

খিলাফৎ সমস্যা

ইতিমধ্যে খিলাফৎ প্রশ্নে ভারতীয় মুসলিমগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। গান্ধীজী মনে করেন যে খিলাফৎ সমস্যা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, "মুসলিমদের যদি আমাদের ভাই মনে করি তবে তার বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য"। গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস খিলাফৎ দাবীকে সমর্থন জানায়। ইহার ফলে খিলাফৎ সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেসকে কর্মপন্থা স্থির করিতে হয়।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব

এই সংকট সময়ে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের হাল ধরেন। মহাত্মা ইহার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের উপর শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ জানাইয়া সফলতা লাভ করেন। ভারতে আসিয়া তিনি চম্পারণ, খয়রা ও আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ করেন। এই সকল সত্যাগ্রহে তিনি অত্যাচারী নীলকর, স্থানীয় সরকার ও মিল মালিকদের বিরুদ্ধে অহিংস পন্থায় আন্দোলন করিয়া অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেন। সত্যাগ্রহের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গান্ধীজী জনসাধারণ ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধী সংগ্রামের জন্য অহিংস হাতিয়ার আবিষ্কার করিয়া স্বভাবতই জাতির নেতৃত্ব লাভ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'গান্ধী যুগের' আরম্ভ হয়। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের

কাছের মানুষে পরিণত হন। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিরাও গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া নেয়।

মণ্ট-ফোর্ড আইনে ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দানে বঞ্চনা কংগ্রেস ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বরাজ দাবী আদায়ের জন্য অহিংস হাতিয়ার সৃষ্টি করিলে জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। ১৯১৯ খ্রীঃ অমৃতসর কংগ্রেসে ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ১৯২০ খ্রীঃ কলিকাতা কংগ্রেসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ দাবী



মহাত্মা গান্ধী

কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ লাভের জন্য আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে, "মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা কংগ্রেসে নিপুণভাবে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী ভাবের মিশ্রণ ঘটান।" মধ্যপন্থীদের ভাবধারা অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে স্বরাজ বা স্বায়ত্ব শাসন এবং চরমপন্থীদের মত অনুযায়ী অসহযোগ কর্মসূচী নেওয়া হয়। এই সঙ্গে খিলাফৎ সমস্যার সমাধানও দাবী করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লব ভারতের স্বাধীনতা-কামীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। রুশ শ্রমিক ও জনসাধারণ এই বিপ্লবে যে নব অধিকার পান তাহা ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের প্রভাবিত করে। আয়ারল্যাণ্ডে মাইকেল কলিন্সের নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ ও আইরীশ বিদ্রোহীদের সিনবোইন আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের নিস্ক্রিয় চেতনাকে চঞ্চল করিয়া তুলে। মিশরের জাতীয় নেতা আদ জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের গণ অভ্যুত্থান ও ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতাকামীদের মনে নূতন আশা জাগায়। তুরস্কের নব নেতা মুস্তাফা কামাল পাশা তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মিত্র শক্তির সহিত যে আপোষহীন সংগ্রাম চালান তাহার দৃষ্টান্ত জাতীয় কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে।

এই সকল কারণে জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মার নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীঃ স্বরাজ লাভের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়।

গান্ধীজী বলেন যে, অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ দুইটি লক্ষ্য লইয়া চালিত হইবে ; প্রথম, স্বরাজ লাভ এবং দ্বিতীয়, দেশের সমাজ ব্যবস্থা হইতে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করা। গান্ধীজী বলেন যে, যতদিন অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি পাপ জাতিকে আচ্ছন্ন রাখিবে ততদিন দেশের প্রকৃত ঐক্য ও স্বাধীনতা আসিবে না। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য—(১) সরকারী খেতাব বর্জন ; (২) ছাত্র-ছাত্রীগণের স্কুল-কলেজ বর্জন ; (৩) আইনজীবিগণের আদালত বর্জন ; (৪) আইন সভার সভ্যপদ বর্জন ; (৫) বিলাতী কাপড় ও দ্রব্য বর্জন ও হাতে কাটা খাদি পরিধান ; (৬) সরকারী খাজনা বর্জনের পন্থা নির্দেশ

অহিংস অসহযোগ নীতি

করেন। গান্ধীজী আশ্বাস দেন যে "তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী চলিলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ হইবে।" তিনি দেশবাসীকে পূর্ণ অহিংসা লইয়া অসহযোগ আন্দোলন চালাইতে সতর্ক করেন।

গান্ধীজীর ডাকে দেশবাসী অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। ইহার আগে ভারতে এইরূপ গণজাগরণ কখনও দেখা যায় নাই। জনগণ বিলাতী কাপড় পোড়াইয়া, ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া, নেতাগণ আইনসভা ছাড়িয়া গান্ধীজীর ডাকে আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। দেশের সর্বত্র "বন্দেমাতরম", "গান্ধীজী কি জয়" ধ্বনিতে কম্পিত হয়। চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল বহু লক্ষ টাকার আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. চাকুরী ছাড়িয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার লোক অহিংসভাবে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ইংরাজ সরকার গুলি ও লাঠির সাহায্যে অহিংস জনতাকে শায়েস্তা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মহাত্মা বড়লাটকে জানাইয়া দেন যে সাত দিনের মধ্যে যদি সরকার বর্বর দমন নীতি না ছাড়েন তবে তিনি জনগণকে খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দিবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ করিবেন। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে "ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-মহিলা, হিন্দু-মুসলমান, রক্ষণশীল-উদারপন্থী সকলেই এই আন্দোলনে প্রভাবিত হন"। মহিলারা দলে দলে পর্দা ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দেন। খিলাফৎ কমিটি মুসলিমগণকে সেনাদলে যোগ না দিতে বলে। গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন ব্যাপক ছড়াইয়া পড়ে। রায়বেরিলী ও গুণ্টুর জেলায় খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ হয়। ছোটনাগপুরে আদিবাসীরা ভগৎ আন্দোলন দ্বারা অহিংস আন্দোলনের সামিল হন। চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতারা গ্রেপ্তার বরণ করেন।

অসহযোগ আন্দোলন

ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে জনতা পুলিশের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া (১৯২২ খ্রীঃ) থানায় আগুন লাগাইয়া ২২ জন পুলিশকে পুড়াইয়া মারে। গান্ধীজী এই ঘটনায় মর্মাহত হন। তিনি মনে করেন যে আন্দোলনে হিংসা ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তিনি অসহযোগ আন্দোলন রদ করেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

চৌরীচৌরা ঘটনা; আন্দোলন প্রত্যাহার

অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কায় ইংরাজ সরকার বেশ কাবু হইয়া পড়েন। গান্ধীজী ইহা হঠাৎ রদ করায় দেশের সর্বত্র আশাভঙ্গের ছায়া নামে। কেহ কেহ বলেন যে "গান্ধীজি একটি স্থানের জনতার পাপের জন্য সমগ্র দেশকে শাস্তি দেন"। সুভাষচন্দ্র আন্দোলন রদের সিদ্ধান্তকে "দুর্ভাগ্যজনক" বলেন। কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন যে আন্দোলন তাহার পথ হইতে সরিয়া যাইতেছে। যাহা হউক এই আন্দোলন উপলক্ষে যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ ঘটে এবং হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্বের যে চিত্র দেখা যায় তাহা ইংরাজ শাসনের ভিত কাঁপাইয়া দেয়। বিপান চন্দ্রের মতে "এই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের শক্তির পরিচয় দেয়"। কংগ্রেস অতঃপর জনসাধারণের সমর্থন-পুষ্ট হইয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মহাত্মা ইহার পর অস্পৃশ্যতা বর্জন ও সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ফলাফল

খিলাফৎ আন্দোলন (Khilafat Movement) : প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান ইংরাজের শত্রু জার্মানীর কাইজারের পক্ষে যোগ দেন। ইংরাজ সরকার তুরস্ককে জব্দ করিবার জন্য তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত মিশর ও মরক্কো অধিকার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হইলে সেভরের সন্ধি দ্বারা তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় মুসলিমগণ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বা ধর্মগুরু বলিয়া মনে করিতেন। Pan Islam বা বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদ অনুযায়ী তাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমগণের ইসলামীয় ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তুরস্কের মুসলিমগণ ও খলিফার প্রতি দুর্ব্যবহারে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হন। ভারতীয় মুসলিম নেতা মৌলনা সৌকত আলি, মহম্মদ আলি, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি খলিফা বা খিলাফৎ সমস্যা লইয়া ইংরাজের বিরোধিতা করার সংকল্প নেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের দ্বারা খিলাফৎ দাবী সমর্থন করিয়া ভারতীয় মুসলিমগণকে কংগ্রেসের সমর্থকে পরিণত করার অপূর্ব সুযোগ দেখিতে পান। মহাত্মা মনে করেন যে খিলাফৎ উপলক্ষ্যে ইংরাজের ভেদনীতিকে ধ্বসাইয়া কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গঠন করিতে পারিবে। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মহাত্মা বলেন যে, "মুসলমান আমার ভাই। সুতরাং তার বিপদে সাহায্য করা কর্তব্য।" এই কথা মনে করিয়া তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে সভাপতি হন। জাতীয় কংগ্রেস খিলাফৎ দাবী না মেটা পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চালাইতে সংকল্প নেয়। এইভাবে মহাত্মা মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল করেন। খিলাফৎ উপলক্ষে বহু মুসলিম অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। পরে তুরস্কের নবীন নেতাগণ বা তরুণ তুর্কীগণ কামাল পাশার নেতৃত্বে খালিফার পদ লোপ করিলে ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন চাপা পড়িয়া যায়।

খিলাফৎ আন্দোলন

কোন কোন লেখক মনে করেন যে, মহাত্মা খিলাফৎ দাবীকে সমর্থন করিয়া পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেন। ইহা ভারতের জাতীয়তাবাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। তাছাড়া খিলাফৎ প্রশ্ন ছিল একটি অন্য দেশের সমস্যা। ভারতের মুসলিমগণ এই সমস্যায় জড়াইয়া পড়ায় তাঁহাদের ইসলামীয় ভ্রাতৃত্বই প্রকাশিত হয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি ইহার দ্বারা আস্থা প্রকাশিত হয় নাই। অনেক লেখক এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে খিলাফৎ প্রশ্নে ইংরাজের ভেদনীতিকে ব্যর্থ করার সুযোগ দেখা দেয়। ইহার ফলে শহুরাঞ্চলের মুসলিমেরা কংগ্রেস পতাকার পাশে আসিয়া দাঁড়ান।

ফলাফল

আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩০—৩৪ খ্রীঃ (The Civil Disobedience Movement) : অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার (১৯২২ খ্রীঃ) ফলে জাতীয় জীবনে কিছুকালের জন্য অবসাদ ঘনাইয়া আসে। মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ থাকায় এই সময়ে জাতিকে নেতৃত্ব দিতে উপযুক্ত লোকের অভাব হয়। এই সময়ে স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের নির্দেশে স্বরাজ্য দল ১৯১৯ খ্রীঃ আইন অনুসারে নির্বাচনে জিতিয়া আইন

স্বরাজ্য দল

সভায় দাঁড়ায়। আইন সভায় এই নেতাগণ সরকারের বিরোধিতা করিয়া সরকারকে হায়রানি করিবার নীতি নেন। অবশ্য ১৯২৩ খ্রীঃ নির্বাচনে স্বরাজ্য দল জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহারা আইনসভা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কারণ নেতারা বুঝিতে পারেন যে আইন সভায় গোলমাল করিয়া কিছু করা যাইবে না। ইতিমধ্যে ১৯২৮ খ্রীঃ মহাত্মার কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হইলে[১] তিনি পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। মহাত্মা জাতিকে নবতম সংগ্রামের ডাক দেন।

সাইমন কমিশন ও নেহেরু রিপোর্ট

এদিকে শাসন সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ইংরাজ সরকার ১৯২৭ খ্রীঃ সাইমন কমিশন নিয়োগ করেন। সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয়কে সভ্য হিসাবে গ্রহণ না করায় ভারতীয় নেতাগণ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ফলে সাইমন কমিশনকে সকল দল বয়কট করে। দেশের সর্বত্র "সাইমন ফিরিয়া যাও" (Go back Simon) ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে ঝিমাইয়া পড়া জাতীয়তাবাদ পুনরায় চাঙ্গা হইয়া উঠে। "সাইমন ফিরিয়া যাও" আন্দোলন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বামপন্থী ছাত্রসংস্থা স্টুডেণ্টস ফেডারেশনের জন্ম হয়। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতবাসীকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে "সংবিধান রচনা সহজ কাজ নয়। যদি ভারতীয়গণ সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করিতে পারেন তবে তিনি তাহা সমর্থন করিবেন।" লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জের জবাবে মোতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটিকে সংবিধানের খসড়া রচনার ভার দেওয়া হয়। এই কমিটি নেহেরু রিপোর্ট নামে (১৯২৮ খ্রীঃ) এক সংবিধানের খসড়া রচনা করে। ইহাতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের ভিতর থাকিয়া ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনের আদর্শ গৃহীত হয়। ভারতে নির্বাচিত পার্লামেণ্টের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়। সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য আইন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।



মোতিলাল নেহেরু

কলিকাতার কংগ্রেস (১৯২৮ খ্রীঃ) অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হয়। নেহেরু রিপোর্টে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের কথা বলা হইলেও, তরুণ কংগ্রেস নেতা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ণ স্বরাজ দাবীর জন্য কংগ্রেসকে আন্দোলন চালাইতে

১. ব্রিটিশ সরকার মহাত্মাকে ১৯২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত কারাদণ্ড দিলেও ১৯২৪ খ্রীঃ তাঁহাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু মহাত্মা বলেন যে তিনি মুক্তি পাইলেও আইনতঃ তিনি ১৯২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত মেয়াদ পালন করিবেন। এই সময়ের মধ্যে নিজেকে বন্দী ভাবিয়া কোন জাতীয় আন্দোলনে তিনি যোগ দিতেন না।

চাপ দেন। পুরাতনপন্থী নেতাগণ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দাবীকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণের জন্য বলেন। শেষ পর্যন্ত মহাত্মার মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, যদি এক বছরের মধ্যে ইংরাজ সরকার ভারতীয়গণকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস না দেন তবে এক বৎসর পর কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজকে লক্ষ্য লইয়া আন্দোলনে নামিবে। তখন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস আর গ্রহণ করা হইবে না।

কলিকাতা কংগ্রেস ১৯২৮ খ্রীঃ

বড়লাট লর্ড আরউইন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া (১৯২৯ খ্রীঃ) ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দানের প্রতিশ্রুতি দেন। আরউইনের এই ঘোষণার ফলে ভারতে সর্বত্র গভীর প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিলাতের রক্ষণশীল দলের বিরোধিতার ফলে লর্ড আরউইন এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ইহার ফলে কংগ্রেস নেতাগণের মনে গভীর হতাশা জাগে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে বিনা আন্দোলনে ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে কোন দাবী আদায় করা যাইবে না। মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেন যে, "আর আমার ফিরিবার পথ নাই। সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী (I have burnt my boat)।" ইংরাজ সরকারের এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া পড়ে। ১৯২৯ খ্রীঃ কংগ্রেসের পক্ষে আন্দোলনে নামিয়া পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে যে উদ্দীপনা দেখা দেয় তাহাকে কাজে না লাগাইয়া নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত ছিল না। পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়ের সাইমন বিরোধী মোর্চায় পুলিশের লাঠির আঘাতে মৃত্যু হইলে লোকে উত্তেজিত হয়। এই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদীগণ নির্বিচারে পুলিশ ও সরকারী কর্মচারী হত্যা করিয়া আন্দোলনকে হিংসার পথে ঠেলিয়া দিতেছিল। কংগ্রেসের তরুণ নেতা সুভাষ ও জওহরলাল প্রভৃতি সক্রিয় আন্দোলনের জন্য প্রবল দাবী জানান। এমতাবস্থায় সকল দ্বিধা ত্যাগ করিয়া সক্রিয় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস লইতে বাধ্য হয়।

আরউইন ঘোষণা : নেতাগণের হতাশা

লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯ খ্রীঃ) পূর্ণ স্বরাজ আদর্শ গৃহীত হয়। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবীকে নাকচ করা হয়। জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাহীনভাবে জাতিকে লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতে আহ্বান জানায়। মহাত্মা গান্ধীকে এই আন্দোলন চালাইবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহাত্মার নেতৃত্বে নিরস্ত্র ভারতবাসী কেবলমাত্র আত্মিক শক্তির জোরে বলদর্পী ইংরাজের হাত হইতে তাহাদের নায্য অধিকার আদায় করিতে শপথ নেয়।

লাহোর কংগ্রেস ১৯২৯ খ্রীঃ, আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২৯ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া দিয়া আন্দোলনের সূচনা করেন। যতদিন না জাতি স্বাধীনতা লাভ করে ততদিন প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করার সংকল্প নেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী মহা-সমারোহে পালিত হয়। স্বাধীনতা দিবসের শপথ-নাম গ্রামে গঞ্জে-শহরে সর্বত্র পাঠ করা হয়। এই শপথনামায় বলা হয় যে, "আমরা

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন

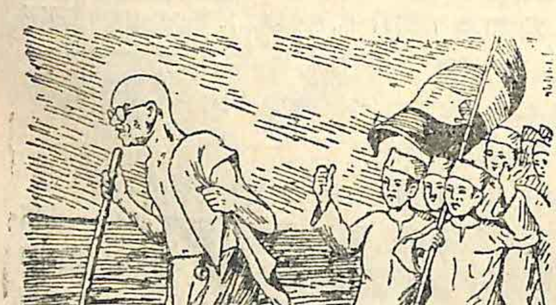
বিশ্বাস করি, ভারতবাসী তথা সমগ্র মানব জাতির স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার মৌলিক অধিকার আছে।" এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাত্মা ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বলেন যে, সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায় আইন অমান্য আন্দোলন চলিবে। পূর্ণ স্বরাজ লাভ এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

লবণ-আইন ভঙ্গ : ডাণ্ডি অভিযান

মহাত্মা সর্বপ্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরাজের আইনে দরিদ্র ভারতবাসী দেশী লবণ তৈয়ারী করিতে পারে না। লবণ আইন ভাঙিলে জনতার সাড়া ভালভাবে পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি বুঝিয়া ফেলেন। মহাত্মা সাবরমতী আশ্রম হইতে ৭৯ জন সত্যাগ্রহী লইয়া গুজরাটের সমুদ্রতীরে ডাণ্ডি নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করিতে পদযাত্রা করেন। ইতিহাসে ইহা 'ডাণ্ডি অভিযান' নামে খ্যাত। ১৯৩০ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে সমুদ্র জল হইতে লবণ তৈয়ারী করিয়া মহাত্মা আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন।

বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন

ডাণ্ডি অভিযানের কাহিনী দেশের সর্বত্র অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে, ডাণ্ডির পথে গান্ধীজী লাঠির উপর ভর দিয়া শীর্ণ কৃষকের মত যে পদযাত্রা করেন তাহা সাধারণ লোককে ভীষণ নাড়া দেয়। মধ্যবিত্ত, মহিলা, দরিদ্র কৃষক ইহার ফলে আইন ভঙ্গের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে। গান্ধীজী মহিলাদের চরকায় সুতা কাটা এবং বিলাতী মালের দোকানে পিকেটিং করার আবেদন জানান। ফলে, মহিলারা দলে দলে আগাইয়া আসেন। বহু মহিলা কারাবরণ করেন। মেদিনীপুরের কাঁথি, চব্বিশ পরগণার মহিষবাথান, গুজরাটের ধারসানা ও ওয়াডালায় লবণ আইন ভঙ্গ ও সত্যাগ্রহ চলে। গান্ধীজী ধারসানা সত্যাগ্রহের জন্য গ্রেপ্তার হইলে আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে। ধারসানার সত্যাগ্রহে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়া অশেষ খ্যাতি পান। কলিকাতার মেয়র জে. এন



ডাণ্ডি অভিযান

সেনগুপ্ত নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পুস্তক পড়িয়া আইন ভাঙেন। বিলাতী কাপড় ও মদের

দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়। মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমার প্রতি গ্রামে লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া প্রতিবাদ জানান হয়। মেদিনীপুর জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন তীব্রভাবে দেখা দেয়। সরকার বর্বর অত্যাচার করিলেও জনতা অহিংস-ভাবে আন্দোলন চালায়। সত্যাগ্রহীগণের গৃহদাহ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। হিজলীর বন্দীশিবিরে নিরস্ত্র বন্দীগণের উপর গুলি চালান হয়। মেদিনীপুরবাসীর আত্মত্যাগ সমগ্র ভারতে প্রশংসা পায়। ইতিমধ্যে সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন।

বাংলার বাহিরে আইন অমান্য আন্দোলন

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে খোদাই খিদমৎগার নামক লাল কোর্তা পরা পাঠান স্বেচ্ছাসেবকগণ অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। প্রচণ্ড পুলিশী নির্যাতনেও তাহারা শান্ত থাকে। খান আবদুল গফুর খান এজন্য "সীমান্ত গান্ধী" নামে অভিহিত হন। দিল্লীতে প্রায় দেড় হাজার নরনারী কারা-বরণ করেন। নারীগণ গৃহকোণ ছাড়িয়া দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন। বোম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার সর্বত্র আন্দোলন ব্যাপক আকার ধরে। সরকার প্রায় ৯০ হাজার লোক গ্রেপ্তার করিলেও আন্দোলন নব শক্তিতে জাগিয়া উঠে। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা, পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জে এবং বেরারের বুলডাঙ্গায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৃষকেরা সরকারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করে।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি : আইন অমান্য স্থগিতের সিদ্ধান্ত

আইন অমান্য আন্দোলন হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে বুঝিয়া ব্রিটিশ সরকার বিলাতে গোল টেবিল বৈঠক ডাকিয়া আলোচনার জন্য কংগ্রেসকে যোগ দিতে আহবান জানান। ১৯৩০ খ্রীঃ সাইমনের পরামর্শে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে কংগ্রেস যোগ না দেওয়ার ফলে বৈঠক নিস্ফল হয়। সরকার বুঝিতে পারেন যে কংগ্রেস যোগ না দিলে এই বৈঠক সার্থক হইবে না। যাহাতে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেয় এজন্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাট লর্ড আরউইনের এক চুক্তি (১৯৩১ খ্রীঃ) স্বাক্ষরিত হয়। ইহা গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুযায়ী সরকার আপাততঃ রাজবন্দীদের মুক্তি দেন ও দমনমূলক আইন রদ করেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব প্রভৃতির প্রাণদন্ড মকুব করিতে গান্ধীর অনুরোধ বড়লাট অগ্রাহ্য করেন। এই চুক্তির পর গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। গান্ধীজী দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়া খালি হাতে ভারতে ফিরিয়া আসেন। মহাত্মা গান্ধীর স্বায়ত্ব শাসন দাবী এই বৈঠকে স্বীকৃত হয় নাই। মহাত্মা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করিলেও ব্রিটিশ সরকার তাহাতে কান দেয় নাই। ইংরাজের চক্রান্তে মুসলিম নেতাগণ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ অধিকার আগে দাবী করিলে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ সরকার তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক ডাকিলে কংগ্রেস তাহা বয়কট করে। ফলে এই বৈঠকও ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন পরিকল্পিতভাবে দমন নীতি চালাইয়া

আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভাঙিয়া দেন। তিনি গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভাঙিয়া প্রচণ্ড ধরপাকড় চালান। এই অবস্থায় কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয়। বড়লাটের আদেশে মহাত্মা গান্ধী, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি বহু নেতা গ্রেপ্তার হন। সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়। বড়লাট চারটি কুখ্যাত অর্ডিনান্স দ্বারা আন্দোলন দমাইয়া দেন। কংগ্রেস কার্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কংগ্রেস কর্মীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, জনসাধারণের উপর শাস্তিমূলক গণকর চাপান হয়। নিরস্ত্র ও অহিংস জনতার উপর বর্বর আক্রমণ চালান হয়।

আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ ; ইংরাজের দমন নীতি

আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ড "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" জারী করেন। ইহাতে বলা হয় যে মুসলমান, শিখ, তপশিলী হিন্দুগণকে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে। এই ঘোষণা ভারতের জাতীয় ঐক্যকে ভাঙিয়া দেওয়ার উপক্রম করে। মহাত্মা ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন করেন। শেষ পর্যন্ত পুণা চুক্তি দ্বারা বর্ণ হিন্দু ও তপশিলী অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে এক রফা হয়। তপশিলী নেতা ডাঃ আম্বেদকরকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে অনুন্নত শ্রেণীকে আইন সভায় সরকার যত আসন নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা দুই গুণ বেশী আসন দেওয়া হইবে। ইহার ফলে অনুন্নতশ্রেণী পৃথক নির্বাচনের দাবী ত্যাগ করে। গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজীকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ইংরাজ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা : পুণা চুক্তি

ইহার পর আইন অমান্য আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। গান্ধীজী কিছুকাল ব্যক্তিগত আইন অমান্য চালাইয়া কারাবরণ করেন। অবশেষে কংগ্রেসের নির্দেশে ১৯৩৪ খ্রীঃ আইন অমান্য আন্দোলন রদ করা হয়। মহাত্মা কংগ্রেসের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া হরিজন আন্দোলন ও গ্রামসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর প্রভাবে সকল হিন্দু মন্দিরের দরজা হরিজনদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন জাতির মনে যে রাজনৈতিক চেতনা জাগায় তাহা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পথ তৈয়ারী করে।

আইন অমান্য আন্দোলনের বিফলতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ত্রাসবাদ : কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন

(Terrorism : Peasant's and Workers' Movement)

সন্ত্রাসবাদের পুনরারম্ভ : বিপ্লববাদ (Terrorism)

১৯২০ খ্রীঃ মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় সরকার বিপ্লবীগণকে মুক্তি দেন। ১৯২২ খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলন বিফল হইলে দেশে হতাশা নামিয়া আসে। এই কারণে বিপ্লবীগণ পুনরায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জোরদার করেন। বাংলায় এই আন্দোলন

প্রবল আকারে দেখা দেয়। বিনয় বাদল দিনেশ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। বিপ্লবের এই পর্যায়ের বিবরণ নবম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ২২৯ দেখ)।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ঃ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন (Peasants' and Workers' Movements ঃ Trade Union Movement) ঃ ভারতে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হইলে শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ হয়। ফলে শ্রমিক সমস্যাও ধূমায়িত হইতে থাকে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের এমপ্রেস কটন মিলে সর্বপ্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হয় বলিয়া জানা যায়। ১৮৮৪ খ্রীঃ লোখাণ্ডে নামে এক বোম্বাইয়ের পত্রিকা সম্পাদক সর্বপ্রথম শ্রমিক সংগঠনের চেষ্টা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বোম্বাই, কানপুর ও সরকারী রেল কারখানায় শ্রমিকগণ দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট করে। কিন্তু সংগঠিতভাবে কোন শ্রমিক আন্দোলন এই সময় গঠিত হয় নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে শ্রমিক আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধের পর শ্রমিকগণের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ার কমিউনিষ্ট বিপ্লব ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনকে নূতন প্রেরণা দেয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর কিছু লোক এই সময় শ্রমিক সংগঠন গঠনের চেষ্টা করেন। বি. পি. ওয়াদিয়া মাদ্রাজে শ্রমিক সংগঠন (১৯১৮ খ্রীঃ) গঠন করিলে ভারতে প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বাকিংহাম কটন মিলে ১৯২১ খ্রীঃ লাগাতার ধর্মঘট চালায় এবং মিল কর্তৃপক্ষ লক আউট ঘোষণা করে। আমেদাবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শ্রমিকগণ কাপড়ের কলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে। ১৯২০ খ্রীঃ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। বোম্বাইয়ে লালা লাজপৎ রায় ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ঃ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

ইতিমধ্যে এস. এ. ডাঙ্গে প্রভৃতি শ্রমিক নেতা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সমাজতন্ত্রী আদর্শ সঞ্চার করেন। ১৯১৮ খ্রীঃ সর্বভারতীয় শ্রমিক ও কৃষক দল স্থাপিত হয়। এই বৎসর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিও স্থাপিত হয়। শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিষ্ট কর্মীগণ আত্মনিয়োগ করেন। বামপন্থী নেতৃত্বের প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমে সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করে। বোম্বাইয়ের কারখানা শ্রমিকেরা গিরনি-কামগড় শ্রমিক সংগঠন স্থাপন করে। বিভিন্ন মিলে শ্রমিকের দাবী আদায় ও কাজের সময় কমাইবার জন্য ধর্মঘট ডাকা হয়। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থী মার্কসবাদীগণের সহিত দক্ষিণপন্থীগণের বিবাদ দেখা দিলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কিছুকাল ঝিমাইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত উভয় দলে আপোষ হইলে নাগপুর অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জোয়ার দেখা যায়।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বামপন্থী প্রভাব

১৯২৯ খ্রীঃ বোম্বাই শহরে গিরনি-কামগড় কাপড়ের কলের শ্রমিক ইউনিয়ন এবং রেলের শ্রমিক যুগ্মভাবে ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট কলিকাতা ও নাগপুর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এই ধর্মঘট দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ডাঙ্গে, মুজাফর আমেদ প্রভৃতি নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও শ্রমিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকে নাই। কিছু সংখ্যক প্রগতিবাদী কর্মী কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দল নামে জাতীয় কংগ্রেসে ১৯৩৪ খ্রীঃ এক সংগঠন স্থাপন করেন। এই সংগঠনকে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়। এই সংগঠন স্থাপনের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদী দৃষ্টি সঞ্চারিত হয়; জাতীয় কংগ্রেস কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ না করিয়া শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এইভাবে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া উঠে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্টগণ মনে করিতেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালান দরকার। নতুবা স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

কংগ্রেসের সোস্যালিষ্ট দল গঠন

ভারতীয় কৃষক শ্রেণী ইংরাজ আমলে নানাভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয়। কৃষক শ্রেণীই হইল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। সুতরাং কৃষকের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে জাতীয় নেতাগণ উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। জাতীয় কংগ্রেসের নেতাগণ কৃষক সমাজের দুর্দশা দূর করার জন্য কিছু কিছু স্থানীয় আন্দোলন করেন। মহাত্মা গান্ধী চম্পারণে নীলকরগণের অত্যাচার হইতে কৃষকগণকে রক্ষার জন্য ১৯১৭ খ্রীঃ চম্পারণ সত্যাগ্রহ করিয়া সাফল্য লাভ করেন। গুজরাটের খয়রা জেলায় সরকারী কর নীতির বিরুদ্ধে কৃষকগণের পক্ষ লইয়া তিনি কর বন্ধ আন্দোলন করেন। সর্দার প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের বারদোলীতে কৃষকগণের পক্ষ লইয়া সত্যাগ্রহ করেন। মহাত্মার প্রভাবে কৃষকগণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ১৯৩০ খ্রীঃ আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীতে কৃষকদের খাজনা কমাইবার কর্মসূচী গৃহীত হয়। এজন্য দরকার হইলে খাজনা দেওয়া বন্ধ করার কথাও ভাবা হয়। জমিদারদের অত্যাচার হইতে কৃষককে রক্ষা করার কথাও কর্মসূচীতে রাখা হয়। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে অযোধ্যায় কর বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। মানবেন্দ্র নাথ রায় এই সময় গ্রামে গ্রামে প্রচার চালান। পূর্ব বাংলার পাটচাষীরাও খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। মধ্যপ্রদেশের বেরারের তুলাচাষীরাও এই আন্দোলনের সামিল হয়। এই কৃষক আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য কিছু নেতা আগাইয়া আসেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্থানীয় কারণে কৃষক আন্দোলন

১৯৩৬ খ্রীঃ কংগ্রেস সমাজবাদীগণের চেষ্টায় নিখিল ভারত কিষাণ সভা স্থাপিত হয়। ইহার ফলে কৃষক সংগঠন জোরদার হয়। ফৈজপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯৩৬ খ্রীঃ) প্রায় ২০ হাজার কৃষক যোগ দেয়। জাতীয় কিষাণ সভার অধীনে প্রাদেশিক ও জেলা কিষাণ সভা স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে কংগ্রেসের সহায়তায়

কংগ্রেসের নেতৃত্বে কিষান আন্দোলন

কিষাণ আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠে।[১] কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কিষাণ সভার বৈঠকে কিষাণগণের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইলে জাতীয় কংগ্রেস কিষাণ, শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা চাপাইয়া দেওয়া হইলে কিষাণ-শ্রমিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

ভারতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকার দমন নীতির দ্বারা তাহা ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। ১৯২৬ খ্রীঃ ট্রেড ইউনিয়ন আইন রচনা করিয়া ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হয়। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করিয়া চারজন শ্রমিক নেতা যথা ডাঙ্গে, সওকত ওসমানী, মুজাফর আমেদ, ও দাশগুপ্তকে ৪ বৎসরের জন্য জেল দেওয়া হয়। ফসেট কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রমিকগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে কাজের সময় হ্রাস করার জন্য আইন পাশ করা হয়। শ্রমিক বিরোধ মিটাইবার জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়। ১৯২৯ খ্রীঃ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার প্রধান শ্রমিক নেতাগণকে গ্রেপ্তার করেন। ইহার ফলে শ্রমিক নেতাগণের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারত রক্ষা আইন দ্বারা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে দমাইয়া ফেলা হয়।

ইংরাজ সরকারের দমন নীতি : কানপুর ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতার অগ্রগতি ঃ ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন
(Towards Freedom : The Government of India Act of 1935)

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন (The Government of India Act of 1935)ঃ ১৯৩০ খ্রীঃ সাইমন কমিশন ভারতের শাসন সংস্কার সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ইহাতে ইংরাজ শাসনাধীনে এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করা হয়। ইহার পর ভারতের শাসন সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ডাকা হয়। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০ খ্রীঃ) কংগ্রেস বর্জন করিলে ইহা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে লীগ নেতাগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচন দাবী করিলে মহাত্মা ইহার বিরোধিতা করেন। ফলে ইহা বিফল হয়। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩২ খ্রীঃ) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অর্থাৎ মুসলিম

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের পটভূমিকা

১. R. P. Dutt—India Today. P. 257.

সমাজের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী গ্রহণ করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ কার্যকরী হয় নাই। ইতিমধ্যে ভারতের জাতীয়তাবাদকে আরও দুর্বল করার জন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" বা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের কথা বলেন। ইহার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন করিলে বর্ণ হিন্দু নেতাগণের সহিত তপশিলী বা অনুন্নত হিন্দু নেতাগণের আপোষ রফা হয়। ইহার নাম হয় পুণা চুক্তি। পুণা চুক্তির দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আইন সভায় বহু আসন সংরক্ষিত করা হয়। ইহার বিনিময়ে তপশিলী নেতাগণ স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী ত্যাগ করেন। পুণা চুক্তির দ্বারা আপাততঃ ইংরাজের ভেদনীতি ব্যর্থ করা হয়। ইংরাজ সরকার ইহার পর তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশ অনুসারে ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন পাশ করেন। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করা।

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়—(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া কেন্দ্রে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইচ্ছাধীনে যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়। (২) কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রচলিত হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে, কিছু কিছু বিষয় বড়লাটের নিজস্ব এক্তিয়ারে থাকে এবং তাহাতে আইন সভার কোন এক্তিয়ার থাকে না। আবার কিছু বিষয় আইন সভার এক্তিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (৩) সংরক্ষিত বিষয় (Reserved) যথা, দেশরক্ষা, আইন-শৃংখলা, ধর্ম প্রভৃতি বড়লাট ও তাঁহার তিন উপদেষ্টার হাতে থাকে।

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত শর্ত

(৪) হস্তান্তরিত বিষয়গুলির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার হাতে দেওয়া হয়। (৫) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে বড়লাটের আইনসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবার নিয়ম করা হয়। মন্ত্রীগণকে তাঁহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। (৬) বড়লাট দরকার মনে করিলে মন্ত্রীগণকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা পান। (৭) বড়লাট দরকার মনে করিলে হস্তান্তরিত বিষয়ে আইন সভা ও মন্ত্রীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করার অধিকার পান। (৮) বড়লাট তাঁহার কাজের জন্য বিলাতের পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। (৯) কেন্দ্রে দুই কক্ষযুক্ত আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্ন কক্ষে ব্রিটিশ ভারতের ২৫০ জন প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা হয়। (১০) সাম্প্রদায়িক দাবী অনুসারে মুসলিমগণের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। (১১) কেন্দ্রীয় আইনসভায় আইন রচনার জন্য বড়লাটের পূর্ব অনুমতি গ্রহণের বিধি রাখা হয়। বড়লাট অর্ডিনান্স জারীর অধিকার পান।

১৯৩৫ খ্রীঃ আইনে প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন লোপ করা হয়। (১) কেন্দ্রের ন্যায় প্রদেশে আইন-শৃংখলা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় গভর্ণরের সংরক্ষিত দপ্তর হিসাবে রাখা হয়। এ বিষয়ে আইন সভার কোন এক্তিয়ার রাখা হয় না। (২) অপর বিষয়গুলিতে প্রাদেশিক আইনসভার এক্তিয়ার স্থাপিত হয়। (৩) প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ব শাসন চালু

হয়। গভর্ণরকে মন্ত্রীগণের পরামর্শ অনুসারে চলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রাদেশিক শাসন

(৪) আইনসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে গভর্ণর মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করার বিধি রাখা হয়। (৫) আইনসভার সভ্য নির্বাচনের জন্য সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিতে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। মুসলিম সভ্যগণকে মুসলিম ভোটে নির্বাচনের নিয়ম করা হয়। (৬) অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধিকে পুণা চুক্তির ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। আইন রচনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার এক্তিয়ার ঠিক করা হয়। (ক) কতকগুলি বিষয়ে একমাত্র কেন্দ্রীয় আইন সভাই আইন রচনার অধিকার পায়। (খ) কতকগুলি বিষয়ে একমাত্র প্রাদেশিক আইনসভা আইন রচনা করিবার ক্ষমতা পায়। (গ) কতকগুলি যুগ্ম বিষয়ে উভয় আইনসভা আইন রচনা করিবার ক্ষমতা পায়।

এইভাবে ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা হয়। ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এই আইনের কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত ধারাগুলিকে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে। তবে প্রাদেশিক ধারাগুলিকে সর্তসাপেক্ষে আপাতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমালোচনা

কংগ্রেসের বামপন্থী মহল এই আইনের ঘোর নিন্দা করেন। কংগ্রেসের তরফে এই আইনের সমালোচনায় বলা হয় যে ঃ (১) এই আইনে বড়লাটকে অহেতুক অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। (২) দেশীয় রাজ্যগুলির ইচ্ছার উপর যুক্তরাষ্ট্রের গঠন নির্ভরশীল করা হইয়াছে। (৩) প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার হইতে দেশবাসীকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। (৪) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বহাল রাখা হইয়াছে। জওহরলাল নেহেরু এই আইনকে "দাসত্বের এক নূতন অধ্যায়" বলিয়া বর্ণনা করেন। ইংলণ্ডের শ্রমিক দলও এই আইনের সমালোচনা করে। শ্রমিক নেতা লর্ড এটলী বলেন যে, "কংগ্রেসকে শাসন ক্ষমতায় বঞ্চিত করার জন্যই এই আইন রচিত হইয়াছে"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাকিস্তান দাবী ঃ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

(Pakistan Demand : Growth of Communalism)

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তান প্রস্তাব (Growth of communalism leading to the Pakistan Resolution) : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করিলে মহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রভৃতি নেতাগণ বিরক্ত হন। কংগ্রেসের ১৯২০ খ্রীঃ অধিবেশনে তিনি খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। নিয়মতান্ত্রিক

পন্থা ছাড়া অন্য ধরণের আন্দোলনে তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।[১] তাছাড়া দরিদ্র জনসাধারণকে লইয়া গণ আন্দোলন করা তাঁহার নীতি বিরোধী ছিল। এজন্য জিন্নাহ বিরক্ত হইয়া কংগ্রেসের সহিত ১৯২১ খ্রীঃ সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগে যোগ দেন। মুসলিম জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মিঃ জিন্নাহকে মদৎ দেন। তাঁহারা আশা করেন যে, মুসলিম জনসাধারণের পক্ষ লইয়া তাঁহারা ক্ষমতা দখল করিতে পারিবেন।

মহম্মদ আলি জিন্নাহর মুসলিম লীগে যোগদান

১৯২৭ খ্রীঃ সাইমন কমিশন নিযুক্ত হইলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পুনরায় মাথা তুলে। মুসলিম লীগ দিল্লী ইস্তাহার (Delhi Manifesto) দ্বারা জানায় যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ⅓ আসন মুসলিমগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

মুসলিম লীগের দিল্লী ইস্তাহার : সাম্প্রদায়িক দাবী

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য লক্ষ্ণৌ-এ একটি সর্বদলীয় সভা ডাকা হয়। ইহাতে লীগ নেতা মিঃ জিন্নাহ দিল্লী ইস্তাহার গ্রহণের জন্য কংগ্রেসকে চাপ দেন। জাতীয় কংগ্রেস বিশ্বাস করিত যে কংগ্রেস হইল হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং দিল্লী ইস্তাহারে সাম্প্রদায়িক প্রস্তাব ভারতীয় কংগ্রেস নাকচ করে। ১৯২৮ খ্রীঃ কলিকাতায় সর্বদলীয় বৈঠকে নেহেরু রিপোর্ট আলোচিত হইলে মিঃ জিন্নাহের অন্যায্য দাবীর ফলে তাহা কার্যতঃ বানচাল হইয়া যায়। ফলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আরও তীব্র হইয়া উঠে।

সর্বদলীয় বৈঠক : কংগ্রেসের দিল্লী ইস্তাহার নাকচ

মহম্মদ আলি জিন্নাহ অতঃপর সর্বভারতীয় মুসলিম কনফারেন্স (১৯২৯ খ্রীঃ) আহবান করিয়া তাঁহার বিখ্যাত ১৪ দফা দাবী ঘোষণা করেন। ইহার প্রধান দাবীগুলি ছিল—(১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা স্থাপন। (২) সকল অঙ্গ রাজ্যের সমান অধিকার দান। (৩) প্রতি নির্বাচিত সংস্থায় মুসলিম ভোটের ভিত্তিতে উপযুক্ত-সংখ্যক মুসলিম প্রতিনিধির আসন সংরক্ষণ। (৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় ⅓ আসন মুসলিম প্রতিনিধির জন্য সংরক্ষণ। (৫) মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার স্বীকার। (৬) বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিমগণের আইনসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ আসন দান। (৭) পৃথক সিন্ধুপ্রদেশ গঠন। (৮) মুসলিম সংস্কৃতি, ধর্ম ও উর্দুভাষা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান। (৯) সরকারী পদে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম নিয়োগ। (১০) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার ⅓ অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মন্ত্রী হইতে হইবে ইত্যাদি।

মিঃ জিন্নাহের ১৪ দফা দাবী

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন পাশ হইবার পর প্রাদেশিক আইনসভার সভ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। মিঃ জিন্নাহ প্রস্তাব দেন যে ভারতের সকল প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগের যুগ্ম মন্ত্রীসভা গঠন করা হউক। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আদর্শের

১. H. Boliftho—Jinnah P. 84.

সহিত লীগের সাম্প্রদায়িক আদর্শের মিল ছিল না। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস মনে করে যে লীগের সহিত কংগ্রেস জোট বাঁধিলে লীগের সাম্প্রদায়িক নীতিকে সমর্থন করা হইবে। কংগ্রেস লীগের এই প্রস্তাব নাকচ করে। ১৯৩৭ খ্রীঃ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করে। নির্বাচনে হারিলেও লীগ নেতা মিঃ জিন্নাহ মনোবল হারান নাই। তিনি লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া বাংলা, পাঞ্জাব ও আসামে লীগের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজাদল আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়। মুসলিম লীগ কৃষক প্রজাদলের সহিত যোগ দিয়া বাংলার মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং ক্ষমতা করায়ত্ত করে।

১৯৩৭ খ্রীঃ প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচন : লীগের পরাজয় কংগ্রেসের জয় : কংগ্রেস মন্ত্রীসভা

বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলিকে হঠাইবার জন্য মুসলিম লীগ কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে ঘোর অপপ্রচার চালাইতে থাকে। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে কংগ্রেসের ভূমি সংস্কার নীতির ফলে মুসলিম জমিদারেরা ভয় পাইয়া যান। উত্তর প্রদেশের ধনী জমিদার লিয়াকৎ আলী খান প্রভৃতি মিঃ জিন্নাহর ভক্তে পরিণত হন। এই সকল মুসলিম জমিদারেরা মনে করেন যে কংগ্রেস যদি কৃষি সংস্কার আরম্ভ করে তবে দরিদ্র মুসলমানেরা তাঁহাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যাইবে। এজন্য তাঁহারা লীগকে জোর সমর্থন দেন। মিঃ জিন্নাহ অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলিমগণের উপর ঘোর অত্যাচার চলিতেছে। তিনি কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ বলিয়া কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের নিন্দা জানান। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে লীগের অপপ্রচারের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা তদন্ত দাবী করিলে মিঃ জিন্নাহ তাহা অগ্রাহ্য করেন। মিঃ জিন্নাহ পীরপুরের নবাবের নেতৃত্বে পীরপুর রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ প্রকাশ করেন।

কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ভারতবাসীর মতামত না লইয়া ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতকে জড়াইয়া দেন। ভারতবাসীর স্বায়ত্ব শাসন দাবী সম্পর্কে কোন আশ্বাস না দেওয়ায় কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করে। মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্নাহ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া লীগের নেতৃত্বে "নিস্কৃতি দিবস" (Deliverence Day) পালন করেন। তিনি বলেন যে, "এতদিনে মুসলিমগণ কংগ্রেসের অপশাসনের হাত হইতে রক্ষা পাইল"।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ঃ মুসলিম লীগের নিস্কৃতি দিবস পালন

অতঃপর মিঃ জিন্নাহ বলিতে আরম্ভ করেন যে হিন্দু-মুসলিম হইল দুই পৃথক জাতি। মুসলিমগণের জন্য ভারতের একাংশ লইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা পাকিস্তান গঠন করা দরকার। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসকগণ তাঁহাকে গোপনে সমর্থন করেন।

পাকিস্তান দাবী

কবি মহম্মদ ইকবাল লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে (১৯৩০ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম

পাকিস্তান নামে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর একটি মুসলিম প্রধান মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রের কথা বলেন। পাকিস্তান কথার অর্থ হইল পবিত্র স্থান। পরে চৌধুরী রহমৎ আলি নামে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র পাকিস্তান দাবী প্রচার করেন।[১] পাঞ্জাবের (P), আফগানিস্তানের (A), কাশ্মীরের (K), সিন্ধুর (S) ও বালুচিস্থানের (Stan) লইয়া পাকিস্তান শব্দটি রচিত হয়। ১৯৪০ খ্রীঃ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান দাবী গৃহীত হয়। ভারতকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী জানান হয়। ১৯৪১ খ্রীঃ মুসলিম লীগের সংবিধানে দ্বিজাতিতত্ত্ব যুক্ত হয়।[২] ইহার অর্থ হইল হিন্দু ও মুসলিম দুই পৃথক জাতি। মিঃ জিন্নাহ বলেন যে "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভারত ভাগই হইল ভারতের সমস্যার একমাত্র সমাধান" (Partition is the only solution)। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবী আদায়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইতে থাকে। ১৯৪৬ খ্রীঃ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইংলণ্ডের মন্ত্রীমিশন ভারত ব্যবচ্ছেদ বা পাকিস্তান দাবী অগ্রাহ্য করিলে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) ঘোষণা করে। ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আরম্ভ করে। ইহার ফলে প্রায় তিন হাজার লোক প্রাণ হারায়। ব্যাপক লুণ্ঠন ও নির্যাতন চলে। বাংলার লীগ মন্ত্রীসভা ও ইংরাজ গভর্ণর কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে চরম নিষ্ক্রিয়তা দেখান। কলিকাতা হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্ব বাংলা, বিহার, পাঞ্জাবে ছড়ায়। অবশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা থামে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি : ক্রীপস প্রস্তাব
(India and the Second World War : Cripps Mission)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : ব্রিটিশ সরকারের আপোষ নীতি (India and the Second World War : British efforts of conciliation) : ১৯৩৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্মানী পোল্যাণ্ড জয় করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র শক্তিকে আক্রমণ করে। জার্মানীর আক্রমণে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের পতন হয়। ইংরাজ সেনা ডানকার্কের যুদ্ধে হারিয়া প্রাণ লইয়া কোনক্রমে ইংলণ্ডে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। ইহার পর জার্মানী ইংলণ্ড আক্রমণে উদ্যত হয়। ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারেন যে, এই সঙ্কটজনক অবস্থায় ভারতবাসীর সাহায্য ছাড়া ইংলণ্ডের আত্মরক্ষা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ; ইংরাজের প্রাথমিক পরাজয় : ইংরাজ সরকারের ভারতীয় সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

১. Oxford History of India—P. Spear.
২. A History of Pakistan—Gankovsky and Polonskaya.

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির সহিত আলোচনা না করিয়া ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে। ইহাতে কংগ্রেস নেতাগণ ক্ষুব্ধ হন। তাঁহারা বলেন যে এত বড় প্রশ্নে ভারতবাসীর মতামত না লইয়া ইংরাজের এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্যায্য হইয়াছে।

কংগ্রেস প্রস্তাবে বলা হয় যে জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসীবাদী শক্তিগুলির বিরোধী ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেস এই সঙ্গে ইংলণ্ডকে জানাইয়া দিতে চায় যে যদি ব্রিটিশ সরকার তাহাদের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই যুদ্ধ চালান কংগ্রেস তাহাতে যোগ দিবে না। জাতীয় কংগ্রেস দাবী করে যে, যুদ্ধের পর ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে কি অধিকার দিবে তাহা এখনই স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। কংগ্রেস রামগড় অধিবেশনে প্রস্তাব নেয় যে, "স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই ভারতবাসী গ্রহণ করিবে না।" যুদ্ধ চলাকালে একটি অন্তবর্তী সরকার এবং যুদ্ধের পর পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। একমাত্র এই শর্তে কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করিবে।

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী

ইতিমধ্যে যুদ্ধের অবস্থা আরও খারাপ হয়। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ১৯৪০ খ্রীঃ ৮ই আগষ্ট এক ঘোষণা দেন। ইহা আগষ্ট প্রস্তাব নামে খ্যাত। ইহাতে বলা হয় যে —(১) যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেওয়া হইবে। (২) যুদ্ধান্তে সংবিধান রচনার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিগণের এক সংবিধান সভা ডাকা হইবে। এই সভা ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। (৩) এই শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু মুসলিমগণের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। মুসলিমগণ সন্তুষ্ট হইলেই তবে শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবে। (৪) ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধান্তে কেবলমাত্র কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন না। (৫) আপাততঃ যুদ্ধ চলার সময় ভারতীয়গণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাইবে না। বড়লাটের আগষ্ট প্রস্তাব ছিল ঘোর দুরভিসন্ধিমূলক। ইহাতে পরোক্ষভাবে বলা হয় যে, কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধি নহে। তাছাড়া আগষ্ট প্রস্তাবে ভারত বিভাগের গোপন ইঙ্গিত দেওয়া হয়। সংবিধান অপছন্দ হইলে মুসলিম লীগকে ইহা নাকচ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাছাড়া ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই। যুদ্ধ চলার সময় ভারতবাসীকে কোন অধিকার দানের কথাও ইহাতে বলা হয় নাই। এই সকল কারণে জাতীয় কংগ্রেস আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। জওহরলাল নেহেরু বলেন যে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রস্তাব এখন দরজায় পেরেকের ন্যায় মৃত।"

লিনলিথগোর আগষ্ট প্রস্তাব

আগষ্ট প্রস্তাব ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস কিছুকাল ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালায়। ১৯৪১ খ্রীঃ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে ইহা তুলিয়া নেওয়া হয়।

ক্রীপস প্রস্তাব, ১৯৪২ খ্রীঃ (Cripps Mission)ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৪২ খ্রীঃ এক সংকটজনক অবস্থা ধরে। একদিকে জার্মানী ইওরোপে তাহার বিজয় বাহিনী লইয়া ছুটিয়া চলে। অপর দিকে দূর প্রাচ্যে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে

নামিয়া পড়ে। দূর প্রাচ্যে মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবার ধ্বংস করিয়া জাপান বিপুল বিক্রমে ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ফিলিপিন, সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া ব্রহ্মদেশ ও ভারতের দিকে আগাইয়া আসে। এমতাবস্থায় ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া ইংরাজের পক্ষে জাপানকে বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভারতবাসীকে শাসনতন্ত্র ও স্বাধীনতার আশ্বাস না দিলে এই সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না ইহা সকলে বুঝিতে পারে। ইংরাজের মিত্র মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ভারতকে শাসন সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ার জন্য ইংরাজের উপর চাপ দেন। তিনি বলেন যে, ভারতকে শাসনতন্ত্র সংস্কারের আশ্বাস না দিলে যুদ্ধে ভারতবাসীর কোন সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না।[১] এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল ভারতীয় নেতাগণের নিকট একটি প্রস্তাব লইয়া মন্ত্রী সভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ছিলেন নিরামিষ ভোজী, সাত্ত্বিক প্রকৃতির সমাজতন্ত্রবাদী মানুষ। তাঁহার চেহারাটিও ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। এজন্য ভারতে তাঁহার ভাবমূর্তি ভালই ছিল। ঝানু রাজনীতিজ্ঞ চার্চিল এজন্য ক্রীপসের হাত দিয়া প্রস্তাব পাঠান।

ক্রীপস প্রস্তাবের পটভূমিকা



স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস

ক্রীপস প্রস্তাবে বলা হয় যে—(১) যুদ্ধান্তে ডোমিনিয়নের পূর্ণ মর্যাদা লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবে। ইহার অর্থ হইল এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিলেও ভারত, কানাডা প্রভৃতির ন্যায় স্বায়ত্ত্ব শাসন ভোগ করিবে। (২) যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে লইয়া সংবিধান সভা গঠিত হইবে। এই সভা নূতন সংবিধান রচনা করিবে। (৩) বড়লাটের কার্য-নির্বাহক সভায় অধিক সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি নেওয়া হইবে। (৪) ভারতের কোন প্রদেশ যদি ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিতে না চায় তবে তাহা স্বীকার করা হইবে। (৫) কোন দেশীয় রাজা ভারত ইউনিয়নে থাকিতে না চাহিলে তাহা স্বীকার করা হইবে। (৬) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মুসলিম) স্বার্থ রক্ষার জন্য পূর্ব ঘোষিত নীতি বজায় রাখা হইবে। (৭) ভারতবাসীর সহযোগিতা ও সম্পদ যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হইবে। (৮) যুদ্ধকালে ভারতের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সকল দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে রাখিবেন।

ক্রীপস প্রস্তাব

১. Durga Das—India from Curzon to Nehru. P. 200.

ক্রীপস প্রস্তাব যেইদিন প্রকাশ করা হয়, সেইদিন জাপান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। ক্রীপস যেদিন ভারত ত্যাগ করেন, সেইদিন জাপান কলিকাতায় বোমা ফেলে।

যাহা হউক, জাতীয় কংগ্রেস নিম্নলিখিত কারণে ক্রীপস প্রস্তাব নাকচ করে। (১) এই প্রস্তাবে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের কোন আশ্বাস দেওয়া হয় নাই। (২) ইহাতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়। কারণ কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র থাকিবে একথা বলা হয়। ইহার অর্থ হইল মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ ভারত ইউনিয়নের বাহিরে থাকিতে পারিবে। (৩) দেশীয় রাজ্যগুলিকেও বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার দেওয়া হয়। (৪) বড়লাটের পরামর্শ সভায় ভারতীয় সদস্যগণের যুদ্ধ সম্পর্কে মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহা দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতাগণের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করেন। (৫) ক্রীপস প্রস্তাবের সকল প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যতে কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয়। আপাততঃ ইহাতে ভারতবাসীকে কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে ভবিষ্যতে ইংরাজের জয়ের সম্ভাবনা অনিশ্চিত ছিল। মাহাত্মা গান্ধী এজন্য ক্রীপস প্রস্তাবকে "একটি ফেলপড়া ব্যাঙ্কের উপর আগামী তারিখের চেক" (A post dated cheque on a crashing bank) বলিয়া অভিহিত করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও স্বতন্ত্র কারণে ক্রীপস প্রস্তাব নাকচ করে।

কংগ্রেসের ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখানের কারণ

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভারত ছাড় আন্দোলন ঃ স্বাধীনতা আন্দোলন

(Quit India Movement : Freedom Movement)

ভারত ছাড় আন্দোলন, ১৯৪২ খ্রীঃ (Quit-India Movement 1942) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অনুকূল হয়। ইওরোপে জার্মানীর হাতে এবং পূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে মার খাইয়া ব্রিটিশ সিংহের দাপট কমিয়া যায়। ইংরাজের সামরিক শক্তি যে ক্ষয় পাইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস এই সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে মনস্থ করে। ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতায় সারা দেশে ক্ষোভ দেখা দেয়। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও গভীর নৈরাশ্য বোধ করেন। হাতে কলমে কিছু করিয়া স্বাধীনতা আনা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই ইহা সকলে বুঝিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজেরা মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সাম্রাজ্য জাপানী আক্রমণের চাপে ত্যাগ করিয়া পিছাইয়া আসে। কংগ্রেস নেতাগণ আশংকা করেন যে, ইংরাজ শক্তি ভারতে কায়েম থাকিলে

জাপানীরা ভারত আক্রমণের অজুহাত পাইবে। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিলে ভারত জাপানী আক্রমণ হয়ত এড়াইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী এজন্য হরিজন পত্রিকায়[1] বলেন যে, "ইংরাজের এখন উচিত ভারত হইতে চলিয়া যাওয়া। ইংরাজ ভারতে থাকিবার জন্যই জাপান ভারত আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছে। ইংরাজ চলিয়া গেলে ভারত নিরাপদ হইবে।" তৃতীয়তঃ, ইংরাজ সরকার জাপানী আক্রমণের মুখে যদি হঠাৎ ভারত ত্যাগ করে তবে সমগ্র দেশকে ঘোর বিশৃংখলার মধ্যে ফেলিয়া যাইবে বলিয়া কংগ্রেসের আশঙ্কা হয়। পূর্ব এশিয়ায় ইংরাজেরা জাপানী আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য যে 'পোড়া মাটি' নীতি লইতেছিল তাহা জাতীয় নেতাগণকে শিহরিত করে। যদি ইংরাজেরা ভারতে তাহা করে তবে দেশ ছারখার হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় বাংলাদেশে ব্রিটিশ সরকার লক্ষ লক্ষ নৌকা ও সাইকেল দখল করিয়া ধ্বংস করেন। শস্য চলাচলের ব্যাপারেও অনিয়ম সৃষ্টি করা হয়। ইহার ফলে জাপানী আক্রমণ আরম্ভ হইলে কি ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিবে তাহা কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হয়। এমতাবস্থায় মহাত্মা ও কংগ্রেস নেতারা বলেন যে দেশ রক্ষার দায়িত্ব ভারতবাসীর হাতে দেওয়া হোক। ভারতীয়গণ সরকার গঠন করিয়া শত্রুর মোকাবিলা করিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা; কংগ্রেসের আশঙ্কা

ইংরাজ সরকার জাপানীদের হাতে প্রবল মার খাইলেও তখনও আশা করিতেন যে ভারতে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা কায়েম থাকিবেন। এজন্য জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করিবার জন্য তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিভেদ জাগাইয়া রাখেন। জাতীয় কংগ্রেস বুঝিতে পারে যে, যতদিন ইংরাজ ভারতে থাকিবে ততদিন ভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার খেলা চলিবে।

ইংরাজের সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি; কংগ্রেসের হতাশা

রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০ খ্রীঃ) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হইয়াছিল। এই দাবীকে সফল করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও চীনের রাষ্ট্রপতি চিয়াং-কাই-শেক মিত্র রাষ্ট্র ব্রিটেনকে ভারতবাসীর সহিত একটি মীমাংসায় আসিবার জন্য প্রস্তাব দেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আপোষ প্রস্তাব নাকচ করিয়া বলেন যে, "ইংলন্ডের রাজার সাম্রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ লই নাই।" ইহাতে ইংরাজের সহিত আপোষের সকল আশা বিনষ্ট হয়। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী আদায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য বোম্বাইয়ে ১৯৪২ খ্রীঃ কংগ্রেসের এক ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে। এই কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিখ্যাত "ভারত ছাড়" প্রস্তাব দেন। জাতীয় কংগ্রেস "ভারত ছাড়" (Quit India) প্রস্তাব (১৯৪২ খ্রীঃ, ৮ই আগষ্ট) গ্রহণ করিয়া ইংরাজকে ভারত ছাড়ার দাবী জানায়। 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবে বলা হয় যে "ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ভারতে একটি জাতীয় সরকার স্থাপিত হইবে। এই সরকার জাতিসংঘের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবে। যদি

বোম্বাই কংগ্রেস: ১৯৪২ খ্রীঃ ভারত ছাড় প্রস্তাব গ্রহণ

১. হরিজন ১৯৪২, ১৯শে এপ্রিল।

ইংরাজ ভারতবাসীর দাবী না মানে তবে ভারতবাসী তার সর্বশক্তি দিয়া আন্দোলন করিবে।" জাতীয় কংগ্রেস জানায় যে "ভারত ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ হইলে "ভারতের সকল নাগরিক নিজেদের স্বাধীন নাগরিক মনে করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। যতদিন না লক্ষ্য পূর্ণ হয় ততদিন এই আন্দোলন চলিবে।"[1] মহাত্মা গান্ধী জাতিকে করাইয়া দেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই এখন গ্রহণীয় নয়। এই আমাদের শেষ লড়াই। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" (Do or Die)।

কংগ্রেস নেতাগণের গ্রেপ্তার

ভারত ছাড় প্রস্তাব গৃহীত হইলে ৯ই আগষ্ট ১৯৪২ খ্রীঃ সকালে মহাত্মা গান্ধীসহ সকল স্তরের কংগ্রেস নেতাগণ ইংরাজ সরকারের নির্দেশে গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস নেতাগণকে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মস্তিষ্ক নষ্ট করার চেষ্টা করেন। 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ৮ই আগষ্ট গৃহীত হয় বলিয়া, এই আন্দোলনকে আগষ্ট আন্দোলন বলা হয়।

আগষ্ট আন্দোলন : গণবিক্ষোভ

কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব সমগ্র দেশে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নেতাগণের গ্রেপ্তারের সংবাদে জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে। জনসাধারণ অহিংস ও সহিংস উভয় পথেই স্বতস্ফুর্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আসমুদ্র হিমাচল, ঢাকা হইতে লাহোর, দিল্লী হইতে মাদ্রাজ দেশের সর্বত্র গণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। হরিজন পত্রিকায় মহাত্মার ঘোষণা "সারে হিন্দুস্থান মে জ্বালামুখী ফুটেগী" বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। ভারতবর্ষ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরণে উদ্বেল হইয়া উঠে। শতাব্দীর অভিশাপ কাটাইয়া স্বাধীনতা লাভের উদগ্র বাসনায় জাতি অধীর হইয়া পড়ে। ভারতের জনসাধারণ যেন যৌবনের খরতেজে বিকশিত হয়।

জনতার সহিংস আন্দোলন : সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস

ভারতের আকাশ বাতাস "ইংরাজ ভারত ছাড়" ধ্বনিতে মুখরিত হয়। জনতা থানা পোড়াইয়া, রেল লাইন উপড়াইয়া, রাস্তা কাটিয়া, ডাকঘর পুড়াইয়া, কোর্ট-কাছারী ধ্বংস করিয়া, খাজনা বন্ধ করিয়া, ব্রিটিশ পতাকা ফেলিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া ইংরাজ সরকারকে অচল করিয়া দেয়। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে যেমন সব লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যায় তেমনই জনগণের রুদ্ররোষে কিছুদিনের জন্য ইংরাজ শাসনের চিহ্ন লোপ পায়।

বাংলার মেদিনীপুরে আগষ্ট আন্দোলন

'ভারত ছাড়' আন্দোলন ভারতের সর্বত্র প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। বাংলার মেদিনীপুর জেলা এই আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ায়। কলিকাতায় একটি স্বাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। মেদিনীপুরে এই আন্দোলন প্রথমে ধ্বংসকারী ও পরে সাংগঠনিক রূপ লইয়া দেখা দেয়। আগষ্ট বিপ্লব মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় গুরুতর আকার ধরে। এক বিশাল জনতা তমলুক শহরের কোর্ট দখল করিবার জন্য আগাইয়া আসে। বিপ্লবী মাতঙ্গিণী হাজরা মিছিলের পুরোভাগে থাকেন। তিনি ভারতীয় পতাকা হাতে লইয়া

১. Sitarammayya—History of Indian National Congress. Vol. II. P. 342-46.

বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়া ইংরাজের গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়া শহীদ হন।



মাতঙ্গিনী হাজরা

তমলুকের মহিষাদল ও সুতাহাটা থানায় জনতা থানা দখলের চেষ্টা করে। মহিষাদলে পুলিশের গুলিতে অনেকে প্রাণ দেন। সুতাহাটায় বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ অগ্রাহ্য করিয়া জনতা থানা দখল করে। যুক্ত প্রদেশের বালিয়া কিছুদিনের জন্য ইংরাজ শাসন লোপ পায়। বাংলার সতীশ সামন্ত, বিহার ও উত্তর প্রদেশে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাম মনোহর লোহিয়া এবং অরুণা আসফ আলি গুপ্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ইংরাজ সরকার আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভাঙিবার জন্য প্রচণ্ড দমন নীতি গ্রহণ করেন। গুলি ও লাঠি চালাইয়া, ঘর জ্বালাইয়া, ব্যাপক নারী ধর্ষণ করিয়া সরকারী সেনা ও পুলিশ আন্দোলন দমনে বিফল হয়।

ক্রমে আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ ধরে। তমলুকের ৪টি থানা লইয়া স্বাধীন জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়। এই সরকারের তিনটি শাখা ছিল যথা—(১) গেরিলা বাহিনী বা বিদ্যুৎবাহিনী, (২) সংবাদ আইন-প্রদান বিভাগ, (৩) আহত গণের সেবা। এই সরকারের বিপ্লবী নামে এক সংবাদপত্র ও নিজস্ব ডাক ও অর্থ দপ্তর ছিল। ১৯৪২-৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ইহা ইংরাজ সরকারের সহিত সমান্তরালভাবে চলে। পরে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। মেদিনীপুর ছাড়া ফরিদপুর, ঢাকা, খুলনা জেলায় আগষ্ট আন্দোলন চলে।

তমলুকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা

ইতিমধ্যে বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। মেদিনীপুরে এক প্রলয়ঙ্কর সমুদ্র প্লাবনে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে রাস্তাঘাটে লোক অনাহারে মারা পড়ে। ইংরাজ সরকার দেশবাসীর এই দুর্দশার দিকে চক্ষু বুজাইয়া থাকেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

এদিকে ইংরাজ সরকারের দমন নীতিও তীব্র আকার ধরে। দিল্লীতে ১১ই ও ১২ই আগষ্টের গুলি চালনায় ৭৬ জন নিহত হন। মেদিনীপুরে পাইকারী হারে ঘরে আগুন, নারী নির্যাতন ও গুলি চালনা করা হয়। ভারতবাসীকে হিংসাত্মক কাজের জন্য বড়লাট দায়ী করায় মহাত্মা জেলে ২১ দিন অনশন করেন। দমন নীতির চাপে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে ইংরাজ শাসনের ভিত কাঁপিয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মত গণ বিদ্রোহ আর ভারতে দেখা যায় নাই।

আগষ্ট আন্দোলনের বিফলতা

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিফলতার কারণ ও এই আন্দোলনের গুরুত্ব (**Causes of the failure of the Quit India Movement and its significance**)ঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা-বিদ্রোহের পর, ১৯৪২ খ্রীঃ 'ভারত ছাড়' বিপ্লবের ন্যায় গণবিদ্রোহ ভারতে আর দেখা যায় নাই। ইংরাজের প্রচণ্ড দমন নীতির চাপে এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত বিফল হয়। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে "১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর সারা দেশে সরকারী দমননীতির এরূপ ব্যাপক ও নিষ্ঠুর প্রকাশ আর দেখা যায় নাই।" পুলিশ ও সেনার গুলি বর্ষণে প্রায় দশ হাজার ভারতবাসী প্রাণ দেয়। দ্বিতীয়তঃ, নেতাগণকে সর্বাগ্রে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার আন্দোলনের মস্তিষ্ক নষ্ট করিয়া দেন। ফলে আন্দোলন বিভিন্নভাবে চলে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ করিয়া সংগঠন গঠন করা দুষ্কর হয়। নিরস্ত্র জনতাকে পরিচালিত করার উপযুক্ত নেতা না থাকায় প্রাথমিক বিস্ফোরণের পর আন্দোলন ঝিমাইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে কৃষিনির্ভর গ্রাম বাংলার অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা বাংলায় আন্দোলনের গতি কমাইয়া দেয়। চতুর্থতঃ, ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনের সামিল হয় নাই। মুসলীম লীগ চিরাচরিতভাবে এই আন্দোলন হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে। পঞ্চমতঃ, এই আন্দোলনকে দৃঢ় করিবার জন্য কৃষক ও শ্রমিককে সামিল করার চেষ্টা করা হয় নাই। এই সকল কারণে ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব বিফল হয়।

তবে একথা সত্য যে আগষ্ট বিপ্লব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়। বিপানচন্দ্রের মতে "৪২-এর বিদ্রোহকে মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় বলা যায়।" যদিও এই আন্দোলন বিফল হয়, ভারতের স্বাধীনতা যে অচিরেই লাভ হইবে সে সম্পর্কে এই আন্দোলন গভীর প্রত্যাশা লাভ করে। মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে বলেন যে, "এখন হইতে প্রতি ব্যক্তি যেন মনে করেন যে তিনি স্বাধীন। তাঁরা আর সাম্রাজ্যবাদের পদানত নন।" ইংরাজ যে ভারত ছাড়িতে বাধ্য হইবে এ সম্পর্কে আর সন্দেহ ছিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন

(Subhas Chandra Busu and I. N. A.)

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন (**Subhas Charndra Busu and the Azad Hind Movement**)ঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্রিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়, যথা, কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ইংরাজের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার আন্দোলন। শেষের ধারাটির প্রভাব ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহে দেখা

যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সেনাদল দ্বারা ইংরাজের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালান তাহা ছিল এই ধারার শেষ সঙ্গীত।[১]

সুভাষচন্দ্র তাঁহার ছাত্রজীবন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের নব বেদান্তবাদ ও স্বদেশ মন্ত্রে প্রভাবিত হন। ছাত্রজীবন হইতে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপক ওটেন নামক জনৈক ইংরাজ অধ্যাপকের ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্য ছাত্রগণ তাঁহাকে লাঞ্ছিত করে। সুভাষচন্দ্রকে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার জন্য দায়ী করিয়া কলেজ হইতে বহিস্কার করেন। ওটেন ঘটনা হইতে সুভাষচন্দ্রের নির্ভীক ও বিদ্রোহী চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্র বলেন যে, "আমার অধ্যক্ষ আমাকে বহিস্কার করিয়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি স্থির করিয়া দেন।"[২] ইহার পর স্কটিশ চার্চ কলেজের ভারত-প্রেমিক অধ্যক্ষ ডাঃ আর্কট তাঁহাকে কলেজে ভর্তি করেন। দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ এই কলেজ হইতে সুভাষচন্দ্র বি. এ. পাশ করেন। তিনি বিলাতে গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর ডাকে দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. চাকুরী ত্যাগ করিয়া দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনের গঠন



সুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল প্রভৃতি তরুণ নেতাগণ কংগ্রেসে বামপন্থী, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবর্তন করেন। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ছিল সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য। নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাগণের আপোষমুখী মনোভাব এবং ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দাবী তিনি ঘোর অপছন্দ করিতেন। সুভাষ ছিলেন দেশের তরুণ সমাজের আদর্শ। ভারতের যুব শক্তির জাগরণে তাঁহার অবদান ছিল অসীম। কংগ্রেসে যুব গোষ্ঠীর তিনিই ছিলেন নেতা। ১৯৩৮ খ্রীঃ হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হন। এই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য নির্ভীক সংগ্রামের আহ্বান দেন।[৩] হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষদের লইয়া সংগ্রামের কথা

সুভাষচন্দ্রের দ্বারা কংগ্রেসের তরুণ ও বামপন্থী প্রভাবের বৃদ্ধি

১. নলিনী কিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ।
২. "My principal expelled me ; but he made my career".
৩. Amrita Bazar Patrika Febuary 7, 1938.

বলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের দাবীও তিনি করেন। সুভাষের এই বিপ্লবী নীতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাগণের বিরাগ সৃষ্টি করে। পর বৎসর ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হইলেও, দক্ষিণপন্থী নেতাগণের অসহযোগিতার জন্য কংগ্রেস হইতে তিনি পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস ত্যাগের পর তিনি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : বৈদেশিক সাহায্য লইয়া দেশের মুক্তির সঙ্কল্প

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র এই সুযোগে বহিঃশক্তির সহায়তা লইয়া সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা ইংরাজের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার পরিকল্পনা করেন। সুভাষচন্দ্র মনে করেন যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ইংরাজের সদিচ্ছার আশায় বসিয়া থাকিলে ভারতের স্বাধীনতা পিছাইয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই ভুলকে কখনও ক্ষমা করিবে না।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান : জার্মানী আগমন

সুভাষচন্দ্র ইওরোপের অন্যান্য শক্তির সহিত যোগাযোগের চেষ্টায় আছেন ইহা ইংরাজের গোয়েন্দাগণ আবিষ্কার করে। ফলে ইংরাজ সরকার তাঁহাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখে। কিন্তু তিনি ইংরাজ পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া ১৯৪১ খ্রীঃ ১৭ই জানুয়ারী পলায়ন করেন। সুভাষ আফগানিস্থান ও রাশিয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত ইংরাজের ঘোর শত্রু নাৎসী জার্মানীতে আসেন। কোন কোন লেখকের মতে সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তির জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তা আশা করেন। কিন্তু এই সময় রুশ নেতা স্ট্যালিন সুভাষকে সাহায্য দিয়া ইংরাজকে চটাইতে রাজী হন নাই।[১]

জার্মানীতে আজাদ-হিন্দ সংঘ গঠন

জার্মানীতে আসিয়া সুভাষচন্দ্র আফ্রিকার যুদ্ধে জার্মানীর হাতে বন্দী ভারতীয় সেনাদলকে লইয়া আজাদ হিন্দ সেনাদল গঠন করেন। তিনি আজাদ হিন্দ বেতার নামে একটি স্বাধীন বেতার কেন্দ্রও স্থাপন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার চালান। এই বেতার কেন্দ্র হইতে বলা হইত "হে স্বদেশবাসী অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর" (To arms to arms, My countrymen)। নাৎসী নেতা হিটলারের নিকট হইতে সুভাষচন্দ্র তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য পান নাই। ইতিমধ্যে জার্মানী ১৯৪১ খ্রীঃ রাশিয়া আক্রমণ করিলে সুভাষচন্দ্র হতাশ হইয়া পড়েন।

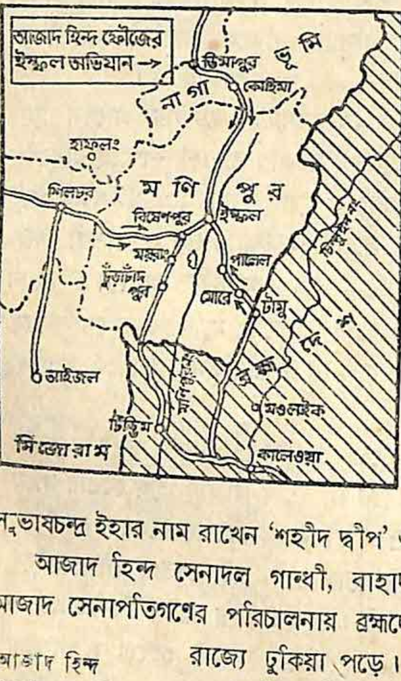
সুভাষচন্দ্রের জাপানে আগমন : জাপানী মিত্রতা লাভ

এদিকে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামিয়া দূর প্রাচ্যে ইংরাজ শক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। সুভাষচন্দ্র বুঝিতে পারেন যে জাপানের সাহায্য লইয়া মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা সহজ হইবে। সুভাষচন্দ্র সাবমেরিণে চড়িয়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়া জার্মানী হইতে জাপানে চলিয়া আসেন। তিনি জাপানের প্রধান সেনাপতি তোজোর নিকট হইতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে জাপানী সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন।

১. কৃষ্ণ বর—ইতিহাসের সন্ধানে।

আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপন

ইংরাজের সহিত যুদ্ধে জাপানের হাতে বহু ভারতীয় সেনা বন্দী হয়। ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এই সেনাদলকে লইয়া ভারতীয় মুক্তি বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই সেনাদল গঠনের দায়িত্ব পান। সুভাষচন্দ্র ব্যাঙককে আসিলে রাসবিহারী তাঁহাকে আজাদ সেনাদলের দায়িত্ব অর্পণ করেন। পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় এবং আজাদ সেনাদলের মনে সুভাষচন্দ্র এক প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টি করেন। ১৯৪৩ খ্রীঃ ২১শে অক্টোবর সিংগাপুরে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করেন। ভারতের জাতীয় পতাকার তলায় দাঁড়াইয়া সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের ঘোষণা পত্র পড়েন। তিনি জাতিকে আহবান করেন, "আমাকে রক্ত দাও ; আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব।" লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এই সমাবেশে আবেগ মন্দ্রিত হৃদয়ে ধ্বনি তুলে "দিল্লী চলো" ও "জয় হিন্দ"। আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধ সঙ্গীত হিসাবে "কদম কদম বড়ায়ে যা" গৃহীত হয়। জাপান, জার্মানী প্রভৃতি ৮টি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। জাপান এই সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ছাড়িয়া দেয়। সুভাষচন্দ্র ইহার নাম রাখেন 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ'।



আজাদ হিন্দ সেনাদলের মণিপুর অভিযান : ইংরাজের সহিত যুদ্ধ : পরাজয়

আজাদ হিন্দ সেনাদল গান্ধী, বাহাদুর, নেহেরু প্রভৃতি ব্রিগেডে বিভক্ত হইয়া আজাদ সেনাপতিগণের পরিচালনায় ব্রহ্মদেশ দিয়া ভারতের পূর্ব সীমান্তে মণিপুর রাজ্যে ঢুকিয়া পড়ে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল যে, ভারতের পূর্ব সীমান্ত দিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে উপনীত হইবেন। আজাদ বাহিনী মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভারতমাতার মুক্তির জন্য ইংরাজ ও মার্কিন বিমান ও সেনাবাহিনীর সহিত প্রবল বিক্রমে লড়াই চালায়। কোহিমা দখল করিয়া আজাদ বাহিনী ইম্ফল অধিকারের জন্য দুই দিক দিয়া সাঁড়াশী অভিযান চালায়। কিন্তু জাপানী সরকার ইহাদের উপযুক্ত বিমান ও ট্যাঙ্ক দিতে বিরত থাকেন। ফলে আজাদ সেনাদলের গতিবেগ কমিয়া যায়। ইতিমধ্যে জাপান যুদ্ধে কাবু হইয়া পড়িয়া পিছু হঠিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জাপান আত্মসমর্পণ করে। ফলে আজাদ সেনাদল অস্ত্র সরবরাহের অভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন হইয়া পড়ে। বহু প্রাণহানির পর আজাদ সেনাদল পিছু হঠিতে বাধ্য হয়। এই সেনাদলের সেনাপতি শাহ নওয়াজ, ধীলন প্রভৃতি ইংরাজের হাতে বন্দী হন। নেতাজীর স্বপ্ন অপূর্ণ থাকে।

সুভাষচন্দ্র ইহার পর রণক্ষেত্র হইতে মাঞ্চুরিয়ার পথে রাশিয়ার দিকে যাত্রা করেন বলিয়া জানা যায়। জাপানী সংবাদসূত্রে জানা যায় যে তাইওয়ান বা ফরমোজার তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে। এই দুর্ঘটনায় নেতাজী প্রাণ হারান। ভারত সরকার নিযুক্ত খোসলা কমিটিও অনুরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন। কিন্তু এই রিপোর্টে বহু অসঙ্গতি থাকায় অনেকে ইহাকে অগ্রাহ্য করেন। অনেকের মতে নেতাজীর মৃত্যুর কাহিনী রহস্যাবৃত।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পর দেশবাসীর নিকট হইতে 'নেতাজী' খেতাব পান। দেশবাসী মহাত্মা গান্ধীকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত 'মহাত্মাজী' নাম দিয়াছে, সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার আত্মদানের জন্য সেইভাবে নেতাজী নাম দিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে সুভাষচন্দ্র জাপানের ফ্যাসিষ্ট শক্তির সাহায্য লইয়া ভুল করেন। যদি জাপান যুদ্ধে জয় লাভ করিত তবে ভারত জাপানের হাতে চলিয়া যাইত। ইহার উত্তরে সুভাষচন্দ্রের সমর্থকগণ বলেন যে—এইরূপ আশংকা ছিল নিতান্তই অমূলক। প্রথমতঃ, নেতাজী জাপানের নিকট হইতে আজাদ হিন্দ সরকারের সার্বভৌমতার স্বীকৃতি আদায় করেন। ফলে জাপানের পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার না করার প্রশ্নই ছিল অবান্তর। দ্বিতীয়তঃ, নেতাজী মনে করিতেন যে আজাদ সেনাদল ভারতের ভিতর ঢুকিতে পারিলে যে ভারতে গণ বিদ্রোহ ঘটিত তাহার ফলে ইংরাজ সরকার উড়িয়া যাইত। ভারতের জনশক্তির উত্থানকে অগ্রাহ্য করা ইংরাজ ও জাপান কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের পর শান্তি বৈঠকে আজাদ হিন্দ সরকার যোগদান করিয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার সুযোগ পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। চতুর্থতঃ, সুভাষচন্দ্র মনে করেন যে যদি জাপান পরাজিত হয়, তবুও বিজয়ী ইংরাজ যুদ্ধে এমনই অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িবে যে ভারতকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। নেতাজীর এই বিশ্লেষণ লইয়া মতভেদ আছে। তবে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের ফলে ভারতে যে জাগরণ ঘটে তাহা কম নহে। লালকেল্লায় বন্দী আজাদ সেনাপতিগণের বিচারের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে ইংরাজের বিরুদ্ধে ধিক্কার দেখা দেয়। বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌ সেনা বিদ্রোহ করে। ভারতীয় সেনাদলে চঞ্চলতা জাগে। মৌলনা আজাদের মতে ইংরাজের ভারতীয় পুলিশগণও চঞ্চল হইয়া উঠে।[১] ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এটলী বলেন যে "আর ভারতীয় সেনা-পুলিশ লইয়া দেশ শাসন করা যাইবে না"। আজাদ হিন্দ আন্দোলন ভারতীয়গণের মনে স্বদেশপ্রেমের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। নেতাজীর আজাদ হিন্দ আন্দোলন ছিল ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়।

আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সমালোচনা ও ফলাফল

---

১. Azad—India wins Freedom.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রীমিশন ঃ স্বাধীনতা লাভ ঃ ভারত ব্যবচ্ছেদ

(Cabinet Mission : Independence and Partition)

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা (Cabinet Mission plan) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ সরকার শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিলেও এই যুদ্ধে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিষহীন ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে বিলাতের নির্বাচনে সাম্রাজ্যবাদীর রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে। উদারপন্থী শ্রমিক দল ক্ষমতা পায়। শ্রমিক দল ছিল ভারতীয়গণের প্রতি সহানুভূতিশীল। এদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের স্বাধীনতা দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। ইহার ফলে ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে। এদিকে ভারতে স্বাধীনতার দাবী উদগ্র হইয়া উঠে। ভারতীয় সেনা ও নৌবাহিনীতে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দেখা দেয়। ১৯৪৬ খ্রীঃ বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌসেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা 'বন্দেমাতরম' ও 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়া অস্ত্র ধরে। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহের গুঞ্জন শোনা যায়। জব্বলপুরে ভারতীয় সিগন্যাল বাহিনী ধর্মঘট আরম্ভ করে। এদিকে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ সেনাপতিগণের বিচারের প্রতিবাদে সারা ভারত ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ইহার ফলে শ্রমিক সরকার বুঝিতে পারে যে, ভারতকে আর দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয়গণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রীর একটি মিশন ১৯৪৬ খ্রীঃ ভারতে পাঠান। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, লর্ড পেথিক লরেন্স ও এ. ভি আলেকজাণ্ডার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের শক্তি ক্ষয়: শ্রমিক দলের ক্ষমতা হস্তান্তর নীতি গ্রহণ

মন্ত্রীমিশন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করিয়া ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৬ই মে তাঁহাদের প্রস্তাব দেন। ইহাতে বলা হয় যে—(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যকে লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। (২) হিন্দু-প্রধান প্রদেশ "ক" শ্রেণী ; মুসলিম-প্রধান প্রদেশ "খ" শ্রেণী এবং বাংলা ও আসাম "গ" শ্রেণীভুক্ত হইবে। (৩) এই তিন অঞ্চলের ও দেশীয় রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া সংবিধান সভা বা গণপরিষদ গঠিত হইবে। গণপরিষদকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। (৪) "ক" "খ" ও "গ" শ্রেণীভুক্ত প্রদেশগুলি ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ এলাকার জন্য আলাদা শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার পাইবে। অর্থাৎ হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের জন্য ও মুসলিম-প্রধান অঞ্চলের জন্য আলাদা শাসনতন্ত্র গঠনের অধিকার স্বীকার করা হইবে। (৫) যতদিন না সংবিধান রচিত হইবে, ততদিন শাসনকার্য চালাইবার জন্য ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার গঠন করা হইবে। (৬) গণ পরিষদের নির্বাচন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে করা হইবে। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের পর

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব

ব্রিটিশ সরকার আর একটি ঘোষণা দ্বারা (১৯৪৬ খ্রীঃ, ৬ই ডিসেম্বর) বলেন যে, গণপরিষদ যদি সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করে তবেই তাহা স্বীকৃত হইবে। কোন বিশেষ শ্রেণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবিধান চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না। এই ঘোষণার অর্থ এই ছিল যে, মুসলিম লীগ যদি পাকিস্তান দাবী ছাড়া আর কিছু না মানে এবং সংবিধানে আপত্তি জানায় তবে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে।

এদিকে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবীতে মুখর হইয়া উঠে। পাকিস্তান আদায়ের জন্য লীগ "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" বা Direct action-এর ডাক দেয়। ফলে ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। বাংলার লীগ মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি ও বাংলার গভর্ণর এই দাঙ্গা দমনে নিশ্চেস্ট থাকেন। এই দাঙ্গা ক্রমে পূর্ব বাংলার নোয়াখালি ও বিহারে ছড়াইয়া পড়ে। বহু হিন্দু মুসলমান নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পটভূমিকায় মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নেহেরু, প্যাটেল প্রভৃতি এবং লীগের পক্ষ হইতে লিয়াকৎ আলি খান প্রভৃতি মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। কিন্তু গণপরিষদের অধিবেশন বসিলে লীগ তাহা বর্জন করে। পাকিস্তান দাবী পূরণ ছাড়া আর কোন শর্ত গ্রহণে লীগ অরাজী হয়। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লীগ মন্ত্রিরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে অপারগ হন। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেন যে ভারতে যাহাই ঘটুক না কেন ১৯৪৮ খ্রীঃ জুন মাসের মধ্যে ইংরাজ ভারত ছাড়িবে। যদি এই সময়ের মধ্যে সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য সংবিধান না রচিত হয় তবে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছামত যে কোন রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইংরাজ সরকার লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট নিয়োগ করেন।

অন্তর্বর্তী সরকার : এটলীর ভারত ত্যাগের ঘোষণা

ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঃ পাকিস্তান গঠন ঃ ভারত স্বাধীন আইন, ১৯৪৭ খ্রীঃ (The Independence of India : Foundation of Pakistan : Indian Independence Act, 1947) ঃ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীঃ বড়লাটের পদে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেস ও লীগ নেতাগণকে বুঝান যে ইংরাজ শীঘ্রই নিশ্চিতভাবে ভারত ছাড়িবে। যেহেতু কংগ্রেস ও লীগ একমত হইতে অসমর্থ সেহেতু মুসলিম প্রধান অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নতুন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও ও অরাজকতায় দেশ ছারখার হইয়া যাইবে। পাঞ্জাবের বীভৎস দাঙ্গা নেতাগণকে শিহরিত করে। ফলে মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তি কংগ্রেস ও লীগ নেতাগণের মনে ধরে। মহাত্মা গান্ধী প্রথমে ভারত বিভাগে আপত্তি করিলেও শেষ পর্যন্ত ইহাতে সায় দেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত ব্যবচ্ছেদের জন্য সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য এক খসড়া রচনা করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা, কংগ্রেস ও লীগ এই খসড়া অনুমোদন করে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি "অখণ্ড ভারত" দাবী ত্যাগ করে। মুসলিগ লীগও তাহার অধিকাংশ দাবী স্বীকৃত হওয়ায় ও পাকিস্তান স্থাপনের সুযোগ পাইয়া সন্তুষ্ট হয়।

মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে, ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ করে। এই আইনে বলা হয় যে—(১) ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই দুই রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয় পরিচালনা করিবে। (২) সিন্ধু, বালুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইবে। আসামের শ্রীহট্ট জেলা গণভোট সাপেক্ষে পাকিস্তানে যাইবে। গণভোট পাকিস্তানের অনুকূলে গেলে শ্রীহট্ট পাকিস্তানে যুক্ত হয়। সামান্য অংশ ভারতের সহিত যুক্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গণভোট সাপেক্ষে পাকিস্তানে যোগ দেয়। (৩) অবশিষ্ট ব্রিটিশ ভারত, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব লইয়া ভারতীয় ডোমিনিয়ন গঠিত হইবে। (৪) বাংলা ও পাঞ্জাবে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইবে। এই কমিশন বাংলা ও পাঞ্জাবের কোন অঞ্চল কোন রাষ্ট্রে পড়িবে তাহা ঠিক করিয়া দিবে। (৫) ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মধ্যে থাকিবে। উভয় ডোমিনিয়নে ব্রিটিশ সরকার গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করিবেন। (৬) প্রতি ডোমিনিয়নের আইন সভা সেই ডোমিনিয়নের জন্য আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা পাইবে। (৭) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইন ১৫ই আগষ্টের পর ভারতবর্ষে বলবৎ থাকিবে না। (৮) প্রতি ডোমিনিয়নের গণ পরিষদ সেই ডোমিনিয়নের জন্য সংবিধান রচনা করিবে। (৯) দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ নিজ এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতা পাইবে। এই রাজ্যগুলি নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিবে। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট নেওয়া হয়। সীমান্ত গান্ধী দাবী করেন যে এই প্রদেশের পাঠানদের স্বতন্ত্র পাকতুনিস্তান গঠনের অধিকার দিতে হইবে। লীগ তাহা স্বীকার না করায় লালকোর্তা দল গণভোট বর্জন করে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যুক্ত হয়। অনুরূপভাবে শ্রীহট্টের বৃহদংশ গণভোটের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ খ্রী: পাকিস্তান সৃষ্টি

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হইবার পর ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খ্রীঃ মধ্যরাত্রে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লালকেল্লায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামাইয়া স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া দেন। অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ ধরিয়া ভারতের সভ্যতা আবার নূতন উদ্যমে আগাইতে আরম্ভ করে। পাকিস্তানেও ১৪ই আগষ্ট অনুরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

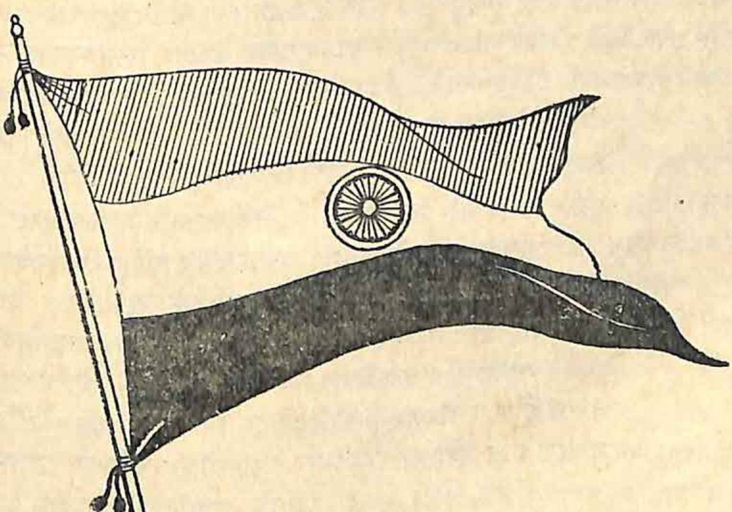
সংবিধান রচনা : স্বাধীন ভারতের সংগঠন

(Framing of a Constitution : Consolidation of Independence)

সংবিধান রচনা (Framing of a Constitution) : মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ আহূত হয়। এই গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয়। স্বাধীনতা লাভের পর ইহরে নাম হয় সংবিধান সভা (Constituent Assembly)। ১৯৪৮ খ্রীঃ হইতে দুই বৎসর কাজ করার পর সংবিধান সভা ভারতের সংবিধান রচনা করে। ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর ছিলেন সংবিধান খসড়ার রচয়িতা। ভারতীয় সংবিধান রচনায় তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯৫০ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী সংবিধান প্রবর্তিত হয়। এজন্য ২৬শে জানুয়ারী দিনটি 'প্রজাতন্ত্র দিবস' (Republic Day) হিসাবে স্বাধীন ভারতে উদযাপিত হইয়া থাকে।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি "স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, সংবিধানের দ্বারা ভারতীয় নাগরিকগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার ভোগ করিবে। স্বাধীনভাবে চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমান সুযোগ ভোগ করিবে। ভারতবাসী জাতীয় ঐক্য

সংবিধানের প্রস্তাবনা



জাতীয় পতাকা

ও ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি করিবে। ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে গৈরিক, শ্বেত ও সবুজ

ত্রিবর্ণ পতাকা ও মধ্যে অশোক চক্র থাকিবে। ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হইলেও ইহা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে সার্বভৌম ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে।

ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা হইয়াছে। এজন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় তিনটি বিভাগ আছে, যথা শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। পার্লামেণ্টের উভয় সভার সদস্য ও অঙ্গরাজ্যগুলির আইন সভার সদস্য লইয়া রাষ্ট্রপতির নির্বাচক মণ্ডল গঠিত হয়। এই নির্বাচক মণ্ডল হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। রাষ্ট্রপতি সংবিধান পালনের জন্য আনুগত্যের শপথ নেন। তিনি যদি সংবিধান ভাঙেন তবে পার্লামেণ্টে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যায় এবং ⅔ সভ্য তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার পরামর্শে চলেন। তিনি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি অন্য মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করেন। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হন। তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকেন এবং এই অধিবেশন মুলতুবী বা পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিতে পারেন। সকল আইন তাঁহার সম্মতিতে কার্যকরী হয়। প্রয়োজন হইলে তিনি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। ভারতীয় সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতিও ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তিনি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার: রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হইলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্তম্ভ। লোকসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চলেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় শাসন যন্ত্র চলিয়া থাকে। তিনিই সরকারী নীতি স্থির করেন এবং পার্লামেণ্টে সেই অনুযায়ী আইন পাশ হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলিও পরোক্ষভাবে তাঁহার কথামতই চলে।

প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় আইন সভা বা পার্লামেণ্ট লোকসভা ও রাজ্যসভা এই দুই কক্ষে বিভক্ত। লোকসভার ৫২৫ জন সদস্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সভার কাজ চালাইবার জন্য সদস্যদের মধ্য হইতে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। কোন কেন্দ্রীয় আইন লোকসভার বিনা অনুমতিতে পাশ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা লোকসভার আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কাজকর্মের জন্য লোকসভার নিকট দায়ী থাকে। রাজ্যসভার ২৫০ জন সদস্যের অধিকাংশ সভ্য পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। প্রতি ২ বৎসর অন্তর ⅓ সভ্য অবসর গ্রহণ করেন। সংবিধানে রাজ্যসভাকে সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট

ভারতের প্রধান বিচারালয় হইল সুপ্রীম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি লইয়া এই কোর্ট গঠিত। সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বিচার, অঙ্গরাজ্য বনাম অঙ্গরাজ্যের বিরোধের নিষ্পত্তি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার আপীলের বিচার করিতে ও সরকারকে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত এবং অন্য বিচারপতিগণ প্রধান বিচারপতির সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন।

সুপ্রীম কোর্ট

ভারতীয় সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা রাজ্যের শাসনকার্য চালান। রাজ্যের আইনসভার সভ্যগণ গণভোটে নির্বাচিত হন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী প্রাদেশিক সরকার ও আইনসভার নেতৃত্ব করেন। মুখ্যমন্ত্রীগণ প্রদেশে বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজ্যপাল তাঁহার পরামর্শে চলেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ৫ বৎসর অন্তর ভোট দিয়া কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। ভারতীয় নাগরিকগণ মৌলিক অধিকার যথা—(১) জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার, আইনের চক্ষে সমান অধিকার, বাক স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার পাইয়াছেন। (২) যে কোন জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা তাঁহারা ভোগ করেন। (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকারও সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে।

নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার

সংবিধানে নির্দেশক নীতির দ্বারা জনকল্যাণমূলক নির্দেশক নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে। অধুনা নির্দেশক নীতিকে বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রবণতা দেখা যায়। নাগরিকগণের অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে। এইভাবে ভারতীয় সংবিধান ভারতে গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দিয়াছে।

নির্দেশক নীতি

১৯৭৬ খ্রীঃ ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৮ খ্রীঃ পুনরায় সংবিধান সংশোধন করিয়া এই পরিবর্তনের কিছু অংশ রদ করা হইয়াছে। ১৯৭৮ খ্রীঃ সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় ও সামগ্রিক স্বার্থের জন্য ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য সম্পত্তির অধিকার হরণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি : স্বাধীন ভারতের সংগঠন

(Integration of Indian states : Consolidation of Independence)

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি (Integration of Indian states) : সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার একদিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালু করিয়া ভারত ব্যবচ্ছেদ করে। অপরদিকে তাহারা দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বতন্ত্র অধিকার দিয়া ভারতের ঐক্যকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় থাকে। ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে ইংরাজ সরকার দেশীয় রাজ্যের স্বতন্ত্রতা দানের চেষ্টা করে। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতীয় স্বাধীনতা আইনেও এই ভেদ নীতির ব্যবস্থা বহাল থাকে। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ব্রিটিশ পর্লামেণ্ট ব্যবস্থা করে যে ইংরাজ ভারত ছাড়িলে দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ নিজ সার্বভৌম অধিকার পাইবে। তাহারা ইচ্ছামত ভারত, পাকিস্তানে যোগ দিতেও পারে অথবা স্বতন্ত্র থাকিতে পারে। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করার সময় দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬২টি। উপরের আইনের বলে ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য সার্বভৌম অধিকার পায়। তাহার অর্থ হইল ভারতবর্ষ ৫৬২টি আলাদা রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং তদুপরি ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ইংরাজ সরকারের কূটচালে ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য বিপন্ন হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ একটি দুর্বল দেশে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন : দেশীয় রাজ্যের সার্বভৌমত্ব লাভ

স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই অবস্থার প্রতিকারের দিকে বিশেষ নজর দেন। সর্দার প্যাটেল ছিলেন



জওহরলাল নেহেরু



সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

"লৌহ মানব" (Iron man)। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য শক্ত হাতে হাল ধরেন। সর্দার প্যাটেলের সচিব ভি. পি. মেনন এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন।

সর্দার প্যাটেলের নীতি

দেশীয় রাজ্যগ্নলির জনমত ভারতভুক্তির পক্ষে ইহা লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের রাজা ভারতভুক্তি গ্রহণ করেন। রানা প্রতাপের বংশধর শিশোদিয়া বংশীয় মেবারের মহারানা অপর্ব স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়া সর্বপ্রথমে স্বইচ্ছায় ভারতভুক্তির দলিলে সহি করেন। অন্যান্য রাজন্যগণও মহারানার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্টের আগেই ভারতভুক্তি গ্রহণ করেন। ভারত সরকার রাজ্যত্যাগী রাজাগণকে বৃত্তি (Privy Purse) দানের প্রতিশ্রুতি দেন। যে দলিল অনুযায়ী ভারতভুক্তি স্বীকৃত হয় তাহার নাম ছিল Instrument of Accession and Stand Still Agreement। সর্দার প্যাটেলের প্রচেষ্টায় দেশীয় রাজাগণ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ভারতভুক্তি (full integration) স্বীকার করিয়া তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনের অধিকার ত্যাগ করেন। পরে সংবিধানে এই রাজ্যগ্নলিকে লইয়া বৃহত্তর রাজ্য গঠন করা হয়, যথা, রাজস্থান প্রভৃতি। এইভাবে অধিকাংশ রাজ্য ভারতে যোগ দেয়।

দেশীয় রাজাগণের ভারতভুক্তি

হায়দরাবাদের নিজাম, জনাগড়ের নবাব, ভুপাল, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি আরও ২৬টি রাজ্য ভারতে যোগ দিতে টাল বাহানা করে। এছাড়া কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংও স্বতন্ত্র থাকিতে মনস্থ করেন। হায়দরাবাদের নিজাম তাঁহার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার জন্য ভারত-বিরোধী কাজে লিপ্ত হন। প্রথমতঃ, তিনি রাজাকার নামে এক সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাসেবক দল গড়েন। কাশিম রিজভী নামে এক সাম্প্রদায়িক লোক রাজাকারগণের নেতৃত্ব দেয়। দ্বিতীয়তঃ, নিজাম ব্রিটেনের নিকট স্বাধীন হায়দরাবাদের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেন। তিনি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেরও সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন। পর্তুগীজ সরকারের সহযোগিতা লাভেরও চেষ্টা তিনি চালান। তৃতীয়তঃ, বিদেশ হইতে বিমান যোগে হায়দরাবাদে অস্ত্র আমদানী আরম্ভ হয়। ভারত সরকার বার বার ভারতে যোগদানের আহ্বান জানাইলেও নিজাম তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এমতাবস্থায় সর্দার প্যাটেল ও প্রধানমন্ত্রী নেহের হায়দরাবাদে ভারত-বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থার (Policy Action) জন্য জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর নেতৃত্বে (১৯৪৮ খ্রীঃ) এক সেনাদল পাঠান। ভারতীয় সেনাদল হায়দরাবাদ দখল করে এবং হায়দরাবাদে গণভোট হইলে ভারতভূক্তি সমর্থিত হয়। নিজামও ক্রমে ভারত সরকারের সহিত সহযোগিতা করেন। জনাগড়ের নবাব ভারত বিরোধিতা করিলেও প্রজাগণের চাপে জনাগড় রাজ্য ভারতভুক্ত হয়। ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি ভারতে যোগ দেয়।

হায়দরাবাদের নিজামের বিচ্ছিন্নতা-বাদ; ভারত সরকারের সামরিক অভিযান

কাশ্মীরের মহারাজা কিছুকাল স্বতন্ত্র থাকেন। এদিকে পাকিস্তান আগাগোড়া কাশ্মীর অধিকারের জন্য লালায়িত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের কিছু পরেই পাকিস্তানী হানাদার ও সেনাদল কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া হত্যা ও নৃশংস অত্যাচার চালায়। এমতাবস্থায় মহারাজা হরি সিং (২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৮ খ্রীঃ) ভারতে যোগ দেন। ভারতীয় সেনাদল তড়িৎ গতিতে বিমান যোগে কাশ্মীরে আসিয়া

পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতিপুঞ্জে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জাতিপুঞ্জের আদেশে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রীঃ যুদ্ধবিরতি ঘটে এবং যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়। ইহার ফলে কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানের হাতে থাকিয়া যায়। অদ্যাবধি জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর সমস্যার নিষ্পত্তি না হইবার ফলে কাশ্মীর সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অশান্তির মূল কারণ হিসাবে রহিয়া গিয়াছে। এইভাবে সর্দার প্যাটেলের দূরদর্শিতার ফলে ইংরাজের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতভুক্ত হয়। বিসমার্ক যেমন জার্মানীর ঐক্য সাধন করেন, সর্দার প্যাটেল সেইরূপ ভারতের ঐক্য সাধন করেন। এজন্য তাঁহাকে 'ভারতীয় বিসমার্ক' বলা যায়।

কাশ্মীর সমস্যা : পাকিস্তানী আক্রমণ

এছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান যাহা অষ্টাদশ শতক হইতে ফরাসী অধিকারে ছিল তাহা ফরাসী সরকার ভারতকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি যথা গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থান পর্তুগীজ সরকার ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করেন। এমন কি পর্তুগীজ সরকার বিশেষ আইন দ্বারা এই স্থানগুলিকে পর্তুগীজের অংশ বলিয়া ঘোষণা করেন। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণকে পর্তুগালের ডিক্টেটর ডাঃ সালাজার পর্তুগালে কারারুদ্ধ করেন। অবশেষে ভারত সরকার গোয়া দখলের জন্য এক সামরিক অভিযান পাঠান। এই অভিযানের ফলে ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি ভারতভুক্ত হয়।

ফরাসী ও পর্তুগীজ উপনিবেশের ভারতভুক্তি

———

আদর্শ প্রশ্নমালা (Model Questions)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (বাংলায় ইংরাজ শক্তির উত্থান)

১। এক কথায় উত্তর দাও :—(ক) ঔরঙ্গজেবের কত খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় ? (খ) ফররুখশিয়ার কোন খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ফর্মান দেন ? (গ) নাদির শাহ কোন মুঘল বাদশাহের আমলে ও কোন খ্রীঃ দিল্লী আক্রমণ করেন ? (ঘ) বাংলার স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ঙ) আলিবর্দী খান কাহাকে নিহত করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসেন ? (চ) বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হুসেন আলির সহিত কোন খ্রীঃ সন্ধি করেন ? (ছ) পেশবা প্রথম বাজীরাও কোন খ্রীঃ সিংহাসনে বসেন ? (জ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কোন খ্রীঃ কাহাদের মধ্যে ঘটে ?

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) মুঘল অভিজাতগণের অপদার্থতা (খ) বাংলায় স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠা (গ) হিন্দু-পাদ-পাদশাহী (ঘ) প্রথম বাজীরাও (ঙ) আহমদ শাহ আবদালী (চ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ।

৩। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বৈদেশিক আক্রমণ কিরূপ দায়ী ছিল তাহা আলোচনা কর।

৪। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজেব ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের দায়িত্ব এবং মুঘল অভিজাতগণের অযোগ্যতা আলোচনা কর।

৫। মুর্শিদকুলি খাঁ হইতে আলিবর্দী খাঁ পর্যন্ত বাংলার নবাবের ইতিহাস আলোচনা কর।

৬। তিন পেশবার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান এবং তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে তাহার পরিণতি আলোচনা কর।

৭। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিকা ও ফলাফল আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পলাশী হইতে বক্সার)

১। এক কথায় উত্তর দাও :—(ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোন খ্রীঃ কলিকাতা অধিকার করেন ? (খ) কলিকাতার নাম আলিনগর কে কখন এবং কেন রাখেন ? (গ) অন্ধকূপ হত্যা কবে ঘটে বলিয়া বলা হয়। (ঘ) আলিনগরের সন্ধি কোন খ্রীঃ হয় ? (ঙ) পলাশীর যুদ্ধ কত খ্রীঃ কত তারিখে ঘটে ? (চ) বক্সারের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে কত খ্রীঃ হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক। (খ) অন্ধকূপ হত্যা। (গ) পলাশীর যুদ্ধের কারণ। (ঘ) পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফল। মীরকাশিমের সহিত কোম্পানীর বিরোধের কারণ। (ঙ) বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব কি ? (চ) বক্সারের যুদ্ধের সময় বাংলার নবাব কে ছিলেন ?

৩। পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

৪। পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৫। আলিবর্দীর পর হইতে মীরজাফরের সিংহাসনারোহন পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বাংলার নবাবের সম্পর্ক আলোচনা কর।

৬। সংক্ষেপে ১৭৫৬—১৭৬৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার নবাবের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত এবং ধারাবাহিক বিবরণ দাও।

৭। আলিনগরের সন্ধি কেন ভঙ্গ হয়? পলাশীর যুদ্ধের জন্য কে বিশেষভাবে দায়ী ছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি?

৮। মীরকাশিমের নীতি ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। সিরাজের সহিত মীরকাশিমের তুলনা কর।

৯। পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে আলোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ)

১। নিম্নলিখিত তারিখগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় কর :—(১) ১৭৫৭ খ্রীঃ, ১৭৬৪ খ্রীঃ, ১৭৬৫ খ্রীঃ।

২। সংক্ষেপে বিবরণ দাও :—(ক) কোম্পানীর দ্বৈতশাসন বলিতে কি বুঝায়?

৩। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও তাহার ফলাফল আলোচনা কর।

৪। দ্বৈতশাসন কাহাকে বলে? ইহার কি ফল দেখা দেয়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)

১। এক কথায় উত্তর দাও :—(ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কোন সালে এবং ইংরাজী কোন সালে ঘটে?

২। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—(ক) আমিনী কমিশন কে নিয়োগ করেন? (খ) কোন গভর্ণর জেনারেল সর্বপ্রথম বিচার বিভাগের সংস্কার করেন? (গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে কবে এবং কাহার দ্বারা প্রচলিত হয়? (ঘ) সদর দেওয়ানী আদালত কে প্রতিষ্ঠা করেন? (ঙ) পাঁচসালা বন্দোবস্ত কে প্রচলন করেন? (চ) দ্বৈত শাসন কে লোপ করেন? (ছ) কলিকাতা মাদ্রাসা কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ) সূর্যাস্ত আইন কে প্রচলন করেন? (ঝ) জেমস গ্রাণ্ট কে ছিলেন? (ঞ) দুই পয়সার পোষ্টকার্ড কে চালু করেন? (ট) বাংলাদেশে জেলা ভিত্তিক শাসন প্রথম কে চালু করেন? (ঠ) কোন গভর্ণর জেনারেল ফার্সি ভাষার স্থলে সরকারী কাজে ইংরাজী ভাষার প্রচলন করেন? (ড) "আধুনিক পাঞ্জাবের জনক" কাহাকে বলা হয়? (ঢ) ভারতে রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ কোন গভর্ণর জেনারেল প্রবর্তন করেন? (ণ) কোন গভর্ণর জেনারেলের আমলে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়?

২। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করঃ—(ক) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কে অবসান করেন? ইহার বদলে কি ব্যবস্থা করা হয়? (খ) ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর। (গ) কোড কর্ণওয়ালিস কাহাকে বলে? কর্ণওয়ালিসের শাসন বিভাগীয় সংস্কার কি ছিল? (ঘ) কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার কি ছিল? (ঙ) শোর-গ্রাণ্ট-কর্ণওয়ালিস রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পর্কে কি ভিন্ন ভিন্ন মত দেন। (চ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভাবক কে? (ছ) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসন ও অন্যান্য সংস্কার আলোচনা কর। (জ) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের ও লর্ড ডালহৌসীর জনহিতকর সংস্কারগুলি আলোচনা কর। (ঝ) শাসন পরিচালনায় কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩। "রাষ্ট্র গঠনের কাজে ক্লাইভ অপেক্ষা তাঁহার পরবর্তী শাসক অনেক গভীরতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন"—স্যার আলফ্রেড লায়ালের এই উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

৪। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর।

৫। ওয়ারেন হেস্টিংসের সংস্কারের ত্রুটি আলোচনা কর। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহা দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেন।

৬। কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সুফল ও কুফলগুলি দেখাও।

৭। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিস কি বন্দোবস্ত করেন?

৮। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড ডালহৌসীর শাসন ও অন্যান্য সংস্কার আলোচনা কর।

৯। শাসন সংস্কারের কাজে জেলা শাসনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১০। "পাশ্চাত্যপন্থী ভারতের প্রধান সংস্কারক"—লর্ড ডালহৌসী সম্পর্কে এই উক্তির যৌক্তিকতা বিচার কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ)

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ—(ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কোন খ্রীঃ কে স্থাপন করেন? (খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কে ছিলেন? (গ) হেইলেবেরী কলেজ কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয়? (ঘ) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কোন আইনে চালু করা হয়?

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাওঃ—(ক) লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কর্মচারী নিয়োগে কি নীতি গ্রহণ করেন? (খ) কভেন্যাণ্টেড সিভিল সার্ভিস কাহাকে বলে? (গ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সম্পর্কে কি জান লিখ। (ঘ) হেইলেবেরী কলেজ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ কেন স্থাপিত হয়? সিভিল সার্ভিস গঠনে তাহাদের ভূমিকা আলোচনা কর। অথবা, ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ কি উদ্দেশ্যে ও কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কতদূর সার্থক হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ভারতীয়গণের নিয়োগ)

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—(ক) লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতীয়গণকে চাকুরীতে নিয়োগে কি নীতি নেন ? (খ) চার্টার আইনে (১৮৩৩ খ্রীঃ) ভারতীয়গণকে চাকুরীতে নিয়োগের কি বিধান দেওয়া হয় ?

২। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে কোম্পানীর শাসনের অবসান কাল পর্যন্ত কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হয় তাহা আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (ভারতের জাগরণের সূচনা)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কি ? কিসের ভিত্তিতে ইহাদের অন্য শ্রেণী হইতে পৃথক করা হয় ? (খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ কিভাবে হয় ? (গ) কলিকাতা শহরের উন্নতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ঘ) ঊনবিংশ শতকে কলিকাতার সমাজ সম্পর্কে কি বিবরণ পাওয়া যায় ?

২। ইংরাজ শাসনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও তাহার প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কি ?

৩। কলিকাতা শহরের অগ্রগতি এবং বাংলার জাগরণে তাহার অবদান আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) শ্রীরামপুর কলেজ কবে ও কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ? এশিয়াটিক সোসাইটি কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয় ? (খ) রেভারেণ্ট ডাফ কোন খ্রীঃ জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ? (গ) হিন্দু কলেজ কোন খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ? (ঘ) স্কুল বুক সোসাইটি কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয় এবং কে ইহার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। অথবা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ? ইহার কি লক্ষ্য ছিল ? (ঙ) বেথুন স্কুল কোন খ্রীঃ কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ? (চ) মেকলে তাহার শিক্ষা বিষয়ক স্মারকলিপি কোন খ্রীঃ দেন ? (ছ) উডস্ ডেসপ্যাচ কোন খ্রীঃ প্রকাশিত হয় ? (জ) কলিকাতা মাদ্রাসা কবে, কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে মিশনারীগণের ভূমিকা কি ছিল ? (খ) রাজা রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার জন্য কি কাজ করেন ? (গ) হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ঘ) প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীগণের মতবিরোধ ও মেকলের ভূমিকা আলোচনা কর। (ঙ) উডস ডেসপ্যাচ কি ছিল ? ইহার কি ফল হয় ? (চ) স্যার চার্লস উড কে ছিলেন ? তিনি কিসের জন্য বিখ্যাত ?

৩। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার কিভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর। ইহার ফল কি হয় ? অথবা, ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন এবং ভারতীয় সমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (খ্রীষ্টধর্ম ও নব্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—(ক) খ্রীষ্টান মিশনারীগণের প্রচারের ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে কি প্রতিক্রিয়া হয় ? (খ) ডিরোজিওর কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (গ) নব্যবঙ্গ দল বা ইয়ং বেঙ্গল দল কাহাকে বলে ? ইহাদের আদর্শ কি ছিল ? ইহার কি ফল হয় ?

২। ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ দলের প্রভাব ও ফলাফল আলোচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন)

১। এক কথায় উত্তর দাও :—(ক) আত্মীয় সভা কে ও কবে প্রতিষ্ঠা করেন ? (খ) ব্রাহ্ম সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (গ) ব্রাহ্মসমাজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? (ঘ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কোন খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন ? (ঙ) কেশবচন্দ্র সেন কোন খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন ? (চ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয় ? (ছ) প্রার্থনা সমাজ কবে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ? (জ) আর্য সমাজ কবে এবং কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ? (ঝ) রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম কোন খ্রীঃ হয় ? (ঞ) শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ কোন খ্রীঃ ভাষণ দেন ? (ট) সতীদাহ নিবারণ আইন কোন খ্রীঃ পাশ হয় ? (ঠ) বিধবা বিবাহ আইন কোন খ্রীঃ পাশ হয় ? (ড) কোন আইনে নারীগণ ভোটাধিকার পান ? (ঢ) থিওসফিক্যাল সোসাইটি কবে কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়।

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) রাজা রামমোহনের ধর্মমত ও ধর্ম সংস্কারের চেষ্টার বিবরণ দাও। (খ) দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন গঠনে কি কাজ করেন ? (গ) ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের ফলাফল আলোচনা কর। (ঘ) দয়ানন্দের ধর্মমত কি ছিল ? ইহার সহিত রামকৃষ্ণের তুলনা কর। (ঙ) আর্য সমাজ আন্দোলনের ফল কি হয় ? (চ) রামকৃষ্ণ ভারতীয় ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাহার ফল কি হয় ? (ছ) স্বামী বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (জ) সমাজ সংস্কারের কাজে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা কর। (ঝ) নব্যবঙ্গ দল রক্ষণশীলতা দমনের জন্য কি কাজ করে ? (ঞ) "নব্যবঙ্গ" প্রসঙ্গের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (ট) অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীর অবদান আলোচনা কর।

৩। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ও ইহার ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। রাজা রামমোহনকে "আধুনিক ভারতের পিতা" কেন বলা হয় তাহা আলোচনা কর।

৫। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে কেশবচন্দ্রের দান কি ছিল ? এই আন্দোলন বাংলা ও বাংলার বাহিরে কি ফল লাভ করে ?

৬। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতবাদ কি ছিল ? আর্য সমাজ আন্দোলন ভারতে কি প্রভাব সৃষ্টি করে ?

৭। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভারতের নব জাগরণের জন্য কি কাজ করেন ?

৮। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মসাধনা এবং নবভারত ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনে তাঁহার প্রভাব আলোচনা কর।

৯। ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের বিকাশ)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) শকুন্তলা ও সীতার বনবাস কাহার রচনা ? (খ) আলালের ঘরের দুলাল কাহার রচনা ? (গ) বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বপ্রথম কে প্রবর্তন করেন। (ঘ) বাংলা সাহিত্যের কোন কবি নোবেল পুরস্কার পান ? (ঙ) ভারতের 'বুল বুল' কাহাকে বলা হয় ? (চ) সুব্রহ্মণ্য ভারতী কোন ভাষার কবি ? (ছ) সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন ? (জ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কে প্রকাশ করেন ? (ঝ) সংবাদ কৌমুদী কে প্রকাশ করেন ? (ঞ) "সারে জাঁহে সে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা" সঙ্গীত কাহার রচনা ? (ট) আনন্দমঠ উপন্যাস ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত কাহার রচনা ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনায় বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান আলোচনা কর। (খ) বাংলা কাব্য সাহিত্যে মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কিভাবে অগ্রগতি হয় ? (গ) বাংলা উপন্যাস ও নাটক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিকাশ আলোচনা কর।

৪। ঊনবিংশ শতকে কিভাবে জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ হয় তাহা আলোচনা কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (সংবাদপত্রের বিকাশ)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) বেঙ্গল গেজেট কে প্রকাশ করেন ? (খ) সমাচার দর্পণ কোন খ্রীঃ প্রকাশিত হয় ? (গ) হিন্দু পেট্রিয়ট কোন খ্রীঃ কাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ? (ঘ) "ভারতীয় সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা" কাহাকে বলা হয় ? (ঙ) ষ্টেটসম্যান পত্রিকা কিভাবে প্রকাশিত হয় ? (চ) যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পত্রিকার নাম কি ছিল ? (ছ) সোম প্রকাশের সম্পাদক কে ছিলেন ? (অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ)। (জ) কেশরী পত্রিকা কে সম্পাদনা করেন ? (ঝ) অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কি ছিল ? (অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ)।

২। মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি ও বাংলা সংবাদপত্রের বিকাশ সম্পর্কে যাহা জন লিখ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি)

১। কোম্পানীর শাসনে ভারতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কি উন্নতি ঘটে ? ইহার কি ফল হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (রাজনৈতিক সমিতি গঠন)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয় ? (খ) সাধারণ জ্ঞানার্জনী সভা কোন খ্রীঃ কাহাদের দ্বারা স্থাপিত হয় ?

(গ) ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কোন খ্রীঃ কাহার সম্পাদনায় স্থাপিত হয় ? (ঘ) ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন কোন খ্রীঃ কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ? (ঙ) ইলবার্ট বিল কোন বড়লাটের আমলে রচিত হয় ? (চ) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন কোন খ্রীঃ কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? (ছ) কোন খ্রীঃ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হয় ? (জ) ভারতীয় হোমরুল লীগ কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয় ? (ঝ) কোন খ্রীঃ, কোথায়, কাহার সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে ? (ঞ) নীলদর্পণ নাটক কাহার রচনা অথবা নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের কাহিনী কোন গ্রন্থে চিত্রিত হয় ? গ্রন্থকারের নাম কি ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য কি ? (খ) জাতীয়তার উন্মেষে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব কি ছিল ? (গ) সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তার উন্মেষে কি সাহায্য করে ? (ঘ) জাতীয় সাহিত্য জাতীয়তার উন্মেষে কি সাহায্য করে ? (ঙ) সমিতির যুগ বলিতে কি বুঝায় উদাহরণ সহ আলোচনা কর। (চ) সিভিল সার্ভিস ও সংবাদপত্র দমন আইনের বিরুদ্ধে কিরূপ প্রতিবাদ উত্থিত হয় ? (ছ) ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও উহার তাৎপর্য আলোচনা কর। (জ) হোমরুল লীগ ও বাল গঙ্গাধর তিলকের ভূমিকা আলোচনা কর। (ঝ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তিতে হিউম ও ডাফরিনের ভূমিকা কি ছিল ? (ঞ) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণা কতদূর কাজ করে ?

৩। উনবিংশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ কর। এই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে স্বামী বিবেকানন্দের কি অবদান ছিল ?

৪। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বুঝায় ? ইহার উদ্ভবের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আলোচনা কর।

৫। সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গঠনে কি ভূমিকা নেন ?

৬। সিভিল সার্ভিস, সংবাদপত্র দমন ও ইলবার্ট বিল আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক জাগরণে কি সহায়তা করে ?

৭। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কিভাবে স্থাপিত হয় ?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) কোন সন্ধির দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয় ? (খ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয় ? (গ) কোন সন্ধির দ্বারা তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের কোন খ্রীঃ অবসান হয় ?

২। ১৭৬৬-১৭৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। হায়দর আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কেন ভাঙিয়া যায়? টিপুর সহিত ইংরাজের সম্পর্ক আলোচনা কর।

৫। টিপুর চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। হায়দর আলির সহিত টিপুর তুলনা কর।

৬। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের অধীনে মহীশূরের ইতিহাসের বিবরণ দাও। মহীশূরের পতনের কারণ দেখাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কোন খ্রীঃ হয়? (খ) সুরাট ও পুরন্দরের সন্ধি কোন খ্রীঃ সম্পাদিত হয়? (গ) সলবাইয়ের সন্ধি দ্বারা কোন খ্রীঃ কোন যুদ্ধের অবসান হয়? (ঘ) নানা ফড়নবীশের কোন খ্রীঃ মৃত্যু হয়? (ঙ) মহাদজী সিন্ধিয়া কোন খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন? (চ) বেসিনের সন্ধি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (ছ) বেসিনের সন্ধি কাহারা স্বাক্ষর করেন? (জ) পুনার সন্ধি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) পেশবা মাধব রাওয়ের কৃতিত্ব আলোচনা কর। (খ) সুরাটের সন্ধি কি ছিল? ইহা কলিকাতা কর্তৃপক্ষ কেন নাকচ করেন? (গ) "মহারাষ্ট্রের ম্যাকিয়াভেলী" কাহাকে বলা হয়? তাঁহার কৃতিত্ব কি ছিল? (ঘ) "মহারাষ্ট্রের শেষতম নায়ক" কাহাকে বুঝায়? তাঁহার কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ঙ) বেসিনের সন্ধি কিভাবে স্বাক্ষরিত হয়। বেসিনের সন্ধির শর্ত কি ছিল? (চ) পুনার সন্ধির গুরুত্ব কি?

৩। সুরাটের সন্ধি হইতে সলবাইয়ের সন্ধি পর্যন্ত ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক আলোচনা কর। অথবা, প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

৪। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের জন্য কে দায়ী ছিল? সলবাইয়ের সন্ধির গুরুত্ব কি?

৫। নানা ফড়নবীশ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার কৃতিত্ব তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। বেসিনের সন্ধি ও উহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৭। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলাফল বিচার কর।

৮। পিণ্ডারী যুদ্ধ ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কেন ঘটে?

৯। মারাঠা শক্তির পতনের জন্য মারাঠা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কিরূপ দায়ী ছিল?

১০। ১৭৬১ হইতে ১৮১৮ সালের মধ্যে মারাঠাগণের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত কর। ১৭৬১ খ্রীঃ মারাঠা শক্তি কি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (নেপাল ও ব্রহ্ম যুদ্ধ)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) সগৌলির সন্ধি কাহাদের মধ্যে কবে স্বাক্ষরিত হয়? (খ) ইয়ান্দাবুর সন্ধি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (গ) কোন খ্রীঃ ইংরাজ

সরকার পেগু অধিকার করেন ? (ঘ) ব্রহ্মদেশ কোন খ্রীঃ সম্পূর্ণভাবে ইংরাজের অধিকারে আসে ?

২। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৩। লর্ড ডাফরিনের ব্রহ্ম নীতি কি ছিল ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (শিখ শক্তির উত্থান ও পতন)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) শিখগণ কোন খ্রীঃ তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ? (খ) শিখগণ কয়টি মিসলে বিভক্ত ছিল ? (গ) অমৃতসরের সন্ধি কোন্ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয় ? এই সন্ধি কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঘ) লাহোরের সন্ধি কোন্ খ্রীঃ সম্পাদিত হয় ? (ঙ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ কে ঘোষণা করেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) রঞ্জিৎ সিংহের উত্থানের পূর্বে শিখগণের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর। (খ) মিসল যুগে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। (গ) রঞ্জিৎ সিংহের শতদ্রু নীতি পর্যালোচনা কর। (ঘ) রঞ্জিৎ সিংহের শাসন ও সামরিক সংগঠন সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ। (ঙ) প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের জন্য ইংরাজের দায়িত্ব আলোচনা কর। (চ) লাহোরের সন্ধি ভঙ্গের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (ছ) শিখ সাম্রাজ্য কেন স্থায়ী হয় নাই ?

৩। রঞ্জিৎ সিংহের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। শিখ শক্তির উত্থান ও পতনের জন্য রঞ্জিৎ সিংহের দায়িত্ব আলোচনা কর।

৫। অমৃতসরের সন্ধি হইতে লাহারের সন্ধি পর্যন্ত ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক আলোচনা কর।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের কারণ ও শিখ শক্তির পতনের কারণ আলোচনা কর। অথবা, ১৮০৭ খ্রীঃ হইতে ১৮৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক আলোচনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (সিন্ধু বিজয়)

১। সিন্ধুদেশে ব্রিটিশ শক্তির কিভাবে বিস্তার হয় ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি)

১। স্বত্ব-বিলোপ নীতি বলিতে কি বুঝায় ? লর্ড ডালহৌসী ইহা কিভাবে ব্যবহার করেন ?

২। লর্ড ডালহৌসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কি কাজ করেন ? তাঁহার নীতির সমালোচনা কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (বশ্যতামূলক মিত্রতা হইতে সার্বভৌমত্ব লাভ)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতির উদ্ভাবক কে ? এই নীতির ব্যাখ্যা কর। (খ) লর্ড হেস্টিংস কিভাবে সার্বভৌমত্ব স্থাপন করেন ? (গ) কোম্পানীর অধীনে আসিবার পর দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ হয় ?

২। লর্ড ওয়েলেসলি হইতে লর্ড হেস্টিংস পর্যন্ত কোম্পানীর ক্ষমতা বিস্তার নীতির পর্যালোচনা কর।

৩। বশ্যতামূলক নীতি বলিতে কি বুঝায়? লর্ড ওয়েলেসলি ইহা কিভাবে প্রয়োগ করেন এবং তাহাতে কি ফল হয়?

"লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের মধ্যস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কিভাবে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যে" পরিণত করে তাহা দেখাও।

৪। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপনের কি ফল দেখা যায়?

৫। বশ্যতামূলক নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা কোম্পানীর রাজ্য কিভাবে বিস্তৃত হয়?

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ)

১। এক কথায় উত্তর দাও:—(ক) হিজলীর লবণ গোলার বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়? (খ) চুয়ার বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ এবং কোথায় হয়? (গ) সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়? (ঘ) ভীল বিদ্রোহ কোথায় এবং কোন খ্রীঃ হয়? (ঙ) খাসী বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়? (চ) সাঁওতাল বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়? (ছ) সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নেতার নাম কর। (জ) বাংলায় নীল বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:—(ক) ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ আলোচনা কর। (খ) সন্ন্যাসী ও সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে যাহা জান আলোচনা কর। (গ) নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের কাহিনী কোন গ্রন্থে চিত্রিত হয়? গ্রন্থকারের নাম কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:—(ক) শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও সৈয়দ আহমদের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর। (খ) ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি কি ছিল? (গ) দুধু মিঞা ও তিতুমির সম্পর্কে কি জান লিখ।

২। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ওয়াহাবি আন্দোলন কিভাবে গঠিত হয়? ইহার লক্ষ্য ও আদর্শ কি ছিল?

৩। ফরাজি আন্দোলন কাহাকে বলে? এই আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। অথবা ফরাজি আন্দোলনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কি ছিল?

৪। ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি আলোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহ)

১। এক কথায় উত্তর দাও:—(ক) ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়? (খ) ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহে কোন নারী ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দান করেন? (গ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহী সিপাহীগণ কাহাকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে? (ঘ) নানা সাহেব কে ছিলেন? (ঙ) ১৮৫৭ খ্রীঃ যে কার্তুজ সিপাহীগণ ব্যবহার করিতে অস্বীকার করে তাহার নাম কি? (চ) ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম একক

বিদ্রোহ কোথায় কে করেন ? (ছ) ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম কোথায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (জ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর কোন আইন দ্বারা কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটান হয়।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের আগে অন্যান্য সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান লিখ। (খ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডাল-হৌসীর রাজ্যগ্রাস নীতি কিরূপ দায়ী ছিল ? (গ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ঘ) ১৮৫৭ খ্রীঃ উত্থান ও পতন আলোচনা কর। (ঙ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায় কিনা ? (চ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিফলতার কারণ কি ছিল ?

৩। ১৮৫৭ খ্রীঃ মহা বিদ্রোহকে একটি সামরিক অভ্যুত্থান বলা সঙ্গত কিনা বিচার কর। এই বিদ্রোহের ফলাফল কি ছিল ?

৪। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ কি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বলিয়া মনে কর ? কারণ ও যুক্তি সহকারে আলোচনা কর।

৫। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে সিপাহী ছাড়া সাধারণ লোক কেন যোগ দেয় তাহা বিশ্লেষণ কর।

৬। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি আলোচনা কর। ইহার ফলাফল কি ছিল ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (ভারতে ইংরাজ শাসনের বিবর্তন)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন ? কোন্ আইনে এই পদ সৃষ্ট হয় ? (খ) ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারত সচিবের দপ্তর কিভাবে গঠিত হয় তাহার বিবরণ দাও। (গ) ১৮৬১ খ্রীঃ ভারতীয় কাউন্সিল আইন ও ১৮৯২ খ্রীঃ ভারতীয় কাউন্সিল আইনে বড়লাটের আইন পরিষদে কি পরিবর্তন সাধন করা হয় ? ইহাতে ভারতীয়গণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরিত হয়। (ঘ) মর্লি-মিণ্টো আইন দ্বারা ইংরাজ সরকার কিভাবে ভেদনীতি প্রয়োগ করেন তাহা দেখাও। (ঙ) মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার আইনে কিভাবে সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার ও দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা হয় তাহা দেখাও। (চ) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন কাহাকে বলে ? ১৯০৯ ও ১৯১৯ খ্রীঃ আইনে ইহা কিভাবে কায়েম হয় ?

২। "১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে সরাসরি শাসনভার হস্তান্তর ছিল একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র"। এই মন্তব্যের তাৎপর্য আলোচনা কর।

৩। ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে কি পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই আইনের অব্যবহিত পরে ১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন কেন পাশ করার দরকার হয় ?

৪। কি কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬১, ১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন পাশ করেন ? ইহার দ্বারা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে পূরণ হয় ?

৫। ১৯০৯ খ্রীঃ মর্লি-মিণ্টো আইনের পটভূমি ও শর্তাবলী আলোচনা কর।

৬। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার দ্বারা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন সাধন করা হয়? ইহা ভারতবাসীকে কিভাবে সন্তুষ্ট করে?

৭। ১৮৬১ খ্রীঃ—১৯১৯ খ্রীঃ প্রধান শাসন সংস্কারগুলি আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের বিকাশ)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইন সর্বপ্রথম কোন খ্রীঃ পাশ হয়? (খ) জেলা বোর্ড কোন খ্রীঃ সর্বপ্রথম চালু হয়? (গ) লর্ড রিপন স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাব কোন খ্রীঃ গ্রহণ করেন? (ঘ) কোন আইনে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরে পরিণত করা হয়? (ঙ) ভারতীয় সংবিধানের কত নং ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও গ্রামীন স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলা হইয়াছে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) লর্ড রিপনের স্বায়ত্ব শাসন আইন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (খ) ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার কি বিধান ছিল?

৩। ঊনবিংশ শতকে স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা কর।
অথবা, লর্ড মেয়ো ও লর্ড রিপনের স্বায়ত্ব শাসনমূলক সংস্কারগুলি পর্যালোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (সরকারী চাকুরীর ভারতীয়করণের দাবী)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) কোম্পানীর আমলে সরকারী কাজে ভারতীয় নিয়োগের জন্য কি নীতি গ্রহণ করা হয়? (খ) মহারানীর ঘোষণাপত্রে সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের নীতি কিভাবে কার্যকরী করা হয়? ইহার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ কি প্রতিবাদ জানান? (গ) জাতীয় কংগ্রেস সরকারী চাকুরীর ভারতীয় করণের জন্য কি দাবী জানান? ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয়? (ঘ) মণ্ট-ফোর্ড আইন ও ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে ভারতীয়গণকে উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগের কি ব্যবস্থা করা হয়?

২। সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কি নীতি নেন? ইহার বিরুদ্ধে ভারতীয় কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতাগণ কি প্রতিবাদ জানান?

৩। লর্ড লিটন সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগে কি নীতি নেন? ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (অর্থনৈতিক শোষণ নীতি)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) ১৮৫৮ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ সরকার কিভাবে ভারতে অর্থনৈতিক শোষণ চালান তাহার বিবরণ দাও। (খ) রেলপথ নির্মাণে গ্যারাণ্টি প্রথার ফলাফল বর্ণনা কর। (গ) ব্রিটিশ সরকারের সেচ নীতির বর্ণনা দাও। (ঘ) ভারতে আধুনিক শিল্প কিভাবে গড়িয়া উঠে? (ঙ) ব্রিটিশ আমলে শুল্ক ও মুদ্রা নীতি পর্যালোচনা কর। (চ) প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ছ) ভারত সরকারের দুর্ভিক্ষ নীতি সম্পর্কে আলোচনা কর। (জ) হোম চার্জ কাহাকে বলে?

২। ১৮৫৮ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে যে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেন তাহা পর্যালোচনা কর। ভারতীয় রেলপথ ও জলসেচের বিষয়ে শোষণ নীতি কিভাবে প্রকট হইয়া উঠে তাহা দেখাও।

৩। ভারতীয় রেল, জলসেচ ও শুল্ক নীতি ব্রিটিশ আমলে কিভাবে পরিচালিত হয় তাহা আলোচনা কর।

৪। ভারতে শিল্প কিভাবে গড়িয়া উঠে? ইংরাজ সরকার শিল্প সম্পর্কে কি নীতি ও শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন?

৫। ভারত সরকারের দুর্ভিক্ষ নিরোধ ও প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে আলোচনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (অ-ব্রিটিশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ)

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ—(ক) "Poverty and Un-British Rule in India" কাহার রচনা? (খ) ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস কাহার রচনা?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ—দাদাভাই নওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্তের কথা কি প্রসঙ্গে পড়েছ? (খ) অব্রিটিশ শাসন বলিতে কি বুঝায়? (গ) রাণাড়ে অব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে কি বলেন? দাদাভাই নওরোজীর এবিষয়ে কি মন্তব্য আছে?

৩। Un-British Rule বা অব্রিটিশ শাসন বলিতে কি বুঝায়? এ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতাগণ কি বলেন?

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (বৈদেশিক ও সীমান্ত নীতি)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ—(ক) নেপিয়ার সিষ্টেম বলিতে কি বুঝায়? (খ) সিন্ধু নীতি কি? (গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লর্ড লিটন কি নীতি নেন ও ইহার কি ফল হয়? (ঘ) ডুরাণ্ড লাইন কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে গঠিত হয়? (ঙ) লর্ড কার্জনের সীমান্ত নীতি কি ছিল? (চ) লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্থান কেন আক্রমণ করেন? (ছ) "দক্ষতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা নীতির" উদ্ভাবক কে? (জ) গণ্ডামাকের সন্ধির শর্ত কি ছিল? ইহা কোন খ্রীঃ সম্পাদিত হয়।

২। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি কিভাবে পরিচালিত হয়? লর্ড কার্জন কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করেন?

৩। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধে ইংরাজের কি বিপর্যয় হয়? অথবা লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান নীতি আলোচনা কর।

৪। "Masterly Inactivity" বা "দক্ষতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা" বলিতে কি বুঝায়? এই নীতির কি ফল হয়? লর্ড লিটন এই নীতি কেন ত্যাগ করেন?

৫। "অগ্রগামী নীতি" বলিতে কি বুঝায়? লর্ড লিটন এই নীতিকে আফগানিস্থানে কিভাবে প্রয়োগ করেন? ইহার কি ফল হয়?

৬। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সরকারের আফগান নীতি পর্যালোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (ব্রহ্ম সীমান্ত নীতি)

১। ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মদেশকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কি নীতি নেন ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (তিব্বত নীতি)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) দালাই লামা কাহাকে বলা হয় ? (খ) ইয়ংহাজব্যান্ড মিশন কে পাঠান এবং কোথায় পাঠান হয় ? (গ) ভারত-তিব্বত সন্ধি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়।

২। লর্ড কার্জনের তিব্বত নীতি আলোচনা কর। ইহার কি ফল হয় ?

৩। তিব্বতে ইয়ংহাজব্যাণ্ড দৌত্য কেন পাঠান হয় ? ইহার কি ফল হয় ?

৪। ভারত-তিব্বত সম্পর্ক আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণ)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন খ্রীঃ, কোন বড়লাটের আমলে স্থাপিত হয় ? (খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কবে স্থাপিত হয় ? (গ) লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন কোন খ্রীঃ পাশ করেন ? (ঘ) স্যাডলার কমিশন কোন খ্রীঃ নিযুক্ত হয় ? (ঙ) স্যাডলার কমিশনের ভারতীয় সভ্যের নাম কর। (চ) ভারতী পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন ? (ছ) বেথুন স্কুল কবে স্থাপিত হয়। (জ) কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ কবে স্থাপিত হয়।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন হয় ? (খ) লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি আলোচনা কর। (গ) ১৯০৪ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। ঘ) স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা কর। (ঙ) উডের ডেসপ্যাচ ও হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে কি সুপারিশ করা হয় ? (চ) কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে কি জান লিখ।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে কি জান লিখ।

৪। স্ত্রীশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) স্যার সৈয়দ আহমদের কোন খ্রীঃ জন্ম হয় ? (খ) আলিগড় কলেজ কবে স্থাপিত হয় ? (গ) ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন কবে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ? (ঘ) আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের নাম কি ? (ঙ) আলিগড় আন্দোলনে কি মতবাদ প্রচার করা হয়।

২। স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য কি কাজ করেন ? তাঁহার রাজনৈতিক মত কি ছিল ? এ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর আলিগড় মতবাদের প্রভাব পর্যালোচনা কর। অথবা, ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভূমিকা নির্ণয় কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (প্রতিবাদী সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব)

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (ক) "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" কবিতাটি কাহার রচনা? (খ) নীল দর্পণ নাটক কাহার রচনা? (গ) বন্দেমাতরম সঙ্গীত কোন উপন্যাসে কে রচনা করেন? (ঘ) কমলাকান্ত শর্মার চরিত্র কাহার রচনা? (ঙ) আনন্দমঠ কাহার রচনা? (চ) হিন্দু মেলা কে প্রতিষ্ঠা করেন? (ছ) "ন্যাশান্যাল মিত্তির" কে? (জ) "মিলে সব ভারত সন্তান" গান কে কোন উপলক্ষে রচনা করেন? (ঝ) "বাংলার মাটি, বাংলার জল" গানখানি কবে কাহার দ্বারা কি উপলক্ষে রচিত হয়? (ঞ) "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" গানখানি কাহার রচনা? (ট) "কারার ঐ লৌহ কপাট" ও বিদ্রোহী কবিতা কাহার রচনা?

২। বাংলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব আলোচনা কর।

৩। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের রচনায় স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (প্রাচ্য শিল্পরীতির বিকাশ)

১। প্রাচ্য শিল্প কলা ও তাহার বিকাশ আলোচনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগতি)

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ—(ক) জনবুল পত্রিকা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (খ) টাইমস অব ইণ্ডিয়া কবে প্রকাশিত হয়? (গ) হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্পাদকের নাম কর। (ঘ) সোমপ্রকাশ কে প্রকাশ করেন? (ঙ) বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কে ছিলেন? (চ) অমৃতবাজার পত্রিকা কবে সর্বপ্রথম কাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়? (ছ) লর্ড লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন কবে পাশ হয়? (জ) দি হিন্দু পত্রিকা কবে বাহির হয়? (ঝ) কেশরী পত্রিকা কে প্রকাশ করেন?

২। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনা ও জনমত গঠন করে তাহা আলোচনা কর।

৩। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন কি ছিল? ইহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অমৃতবাজার ও হিন্দু পত্রিকাদ্বয় ইহাতে কি ভূমিকা নেয়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব)

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ—(ক) "স্বরাজ হইল আমার জন্মগত অধিকার" এই কথাটি কে বলেন? (খ) লাল-বাল-পালের রাজনৈতিক মতবাদকে কি নাম দেওয়া হয়? (গ) সুরাট কংগ্রেস কোন খ্রীঃ অনুষ্ঠিত হয়? (ঘ) "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত" কাহার বাণী ছিল? (ঙ) রাজ নারায়ণ বসু ও নব গোপাল মিত্র কি সংগঠনকে জোরদার করেন?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ—(ক) চরমপন্থী মত কি এবং কাহারা এই মতের প্রচারক ছিলেন? (খ) চরমপন্থী ও নরমপন্থীগণের মধ্যে কি প্রভেদ ছিল? (গ) সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বুঝায়? (ঘ) তিলক ও বিপিনচন্দ্রের মতবাদ

আলোচনা কর। (ঙ) সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে স্বামী বিবেকানন্দের কি অবদান ছিল? (চ) বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে কি ভূমিকা নেন?

৩। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বুঝায়? ইহার উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর।

৪। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি কি ছিল? বঙ্কিম ও দয়ানন্দের ভাবধারা এই জাতীয়তাবাদকে কিরূপ প্রভাবিত করে?

৫। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ কি সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট ছিল? তিলক ও বিবেকানন্দ এই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে কি প্রভাব বিস্তার করেন?

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (বঙ্গভঙ্গ)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) প্রথম বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কোন খ্রীঃ করা হয়? (খ) লর্ড কার্জন এই ব্যবচ্ছেদের জন্য কি যুক্তি দেখান? (গ) বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে কার্জনের কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?

২। লর্ড কার্জন কি অভিসন্ধি লইয়া কিভাবে বঙ্গ বিভাগ করেন? ইহার প্রতিবাদে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে হয়?

৩। বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জনের দায়িত্ব আলোচনা কর। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে গড়িয়া উঠে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে বাংলা পত্রিকাগুলি প্রবল প্রচার চালায় তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটির নাম কর। (খ) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কোন মুসলিম নেতা মুখর হইয়া উঠেন? (গ) কলিকাতার কোন সভায় স্বদেশী দ্রব্য চালাইবার ও বিলাতী কাপড় বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (ঘ) বঙ্গভঙ্গের উপলক্ষে বাংলার কোন চারণ কবি গ্রামে স্বদেশী প্রচার করেন? (ঙ) ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? (চ) বেঙ্গল কেমিক্যাল কবে কি উপলক্ষে স্থাপিত হয়? (ছ) যাদবপুর কলেজ কবে স্থাপিত হয়? (জ) বঙ্গভঙ্গ কবে রদ হয়? (ঝ) পূর্ব বাংলার ছোটলাটের নাম কি ছিল? (ঞ) অশ্বিনী কুমার দত্ত কে ছিলেন? (ট) ফেডারেশন হলের ভিত্তি কে স্থাপন করেন? (ঠ) রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে কি গান রচনা করেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) বয়কট আন্দোলন কিভাবে চলে? (খ) স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ইহার কি ফল হয়?

৩। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত হয়? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?

৪। 'স্বদেশী' আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (বিপ্লবী আন্দোলন)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) শিবাজী ও গণপতি উৎসব কে প্রবর্তন করেন? (খ) মহারাষ্ট্রের প্রথম বিপ্লবী নেতা কে ছিলেন? (গ) কমিশনার র‍্যাণ্ড

কাহাদের হাতে নিহত হন ? (ঘ) বীর সাভারকর কি বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেন ? (ঙ) অনুশীলন সমিতি কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয় ? (চ) শ্রীঅরবিন্দ কি পত্রিকার সম্পাদনা করেন ? (ছ) সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন ? (জ) বিপ্লবী ক্ষুদিরাম কাহাকে হত্যার চেষ্টা করেন ? (ঝ) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম কি ? (ঞ) বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে যুদ্ধে কে প্রাণ দেন ? (ট) বিনয়-বাদল-দীনেশ কোন খ্রীঃ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন ? (ঠ) মাষ্টারদার প্রকৃত নাম কি ? (ড) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কোন খ্রীঃ হয় ? (ঢ) 'মাষ্টার দা' কোন বিপ্লবী অভিযানের মস্তিষ্ক ছিলেন ? (ণ) মানিকতলা বোমার মামলায় কাহারা অভিযুক্ত হন ? (ত) ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কে ছিলেন ? (থ) বিপ্লবী বীণা দাশ কাহাকে গুলি করেন ? (দ) বাংলায় বিপ্লবীদের সংগঠিত দুইটি গুপ্ত সমিতির নাম বল।

২। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) অধ্যাপক হরদয়াল কোন প্রদেশে বিপ্লবী আন্দোলন গঠন করেন ? (খ) লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কোন খ্রীঃ বোমা ছোঁড়া হয় এবং কে এই বোমা ছোঁড়েন ? (গ) গদর পার্টি কে গঠন করেন ? (ঘ) রাসবিহারী বসু সশস্ত্র বিপ্লব কবে আরম্ভ করার চেষ্টা করেন ? (ঙ) ভগৎ সিং কিজন্য অভিযুক্ত হন ? (চ) ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী কাহাকে বলা হয় ? (ছ) সর্বপ্রথম কোন খ্রীঃ স্বাধীন ভারতের পতাকার পরিকল্পনা করা হয় ?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) বিপ্লববাদের উদ্ভবের কারণ কি ছিল ? (খ) মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন কেন দেখা দেয় ? মহারাষ্ট্রের বিপ্লবের বর্ণনা দাও। (গ) বাংলায় বিপ্লববাদের উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর। (ঘ) বাংলায় বিপ্লববাদ কি কি উপদলে বিভক্ত ছিল ? শ্রীঅরবিন্দ এই বিপ্লব গঠনে কি ভূমিকা নেন ? (ঙ) সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা সরকার দখলের জন্য বাঘা যতীন প্রভৃতি কি চেষ্টা করেন ? (চ) মাষ্টারদা বিপ্লবের জন্য কি কাজ করেন ? (ছ) রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী জীবনের বিবরণ দাও। (জ) ভারতের বাহিরে বিপ্লবী আন্দোলন কিভাবে গঠিত হয় ?

৪। বিপ্লবী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ বলা সঙ্গত কিনা তাহা আলোচনা কর। এই আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ কি ? বাংলার এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। মহারাষ্ট্রে ও বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন কিভাবে চলে। ইহার ব্যর্থতার কারণ কি ?

৬। পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন এবং রাসবিহারী বসুর কার্যকলাপ আলোচনা কর।

৭। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের মুক্তির জন্য কি আদর্শ প্রচার করেন ? বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান ও পতন আলোচনা কর। ইহা কেন ব্যর্থ হয় ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা)

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—(ক) আলিগড় কলেজের প্রথম ইংরাজ অধ্যক্ষ কে ছিলেন ? (খ) স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁহার লক্ষ্ণৌ বক্তৃতা কবে দেন ? (গ) লর্ড মিণ্টোর

নিকট আগা খাঁ দৌত্য কোন খ্রীঃ করা হয় ? (ঘ) কোন খ্রীঃ কাহার দ্বারা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ? (ঙ) লক্ষ্মৌ চুক্তি কোন খ্রীঃ হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—(ক) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও দ্বিজাতি তত্ত্ব সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (খ) মর্লি-মিণ্টো আইনে ও মণ্টফোর্ড আইনে কিভাবে লীগের দাবী রক্ষা করা হয় ?

৩। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। ভারতের রাজনীতির উপর ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত উহার প্রভাব পর্যালোচনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা)

১। স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ও ইংরাজের ভেদনীতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। ১৮৯২ খ্রীঃ হইতে ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা এবং ইহার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা দেখাও।

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (অহিংস, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন)

১। এক কথায় উত্তর দাও :—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কবে হয় ? (খ) রাউলাট আইন কবে পাশ হয় ? (গ) জালিয়ানওয়ালাবাগের গুলি চালান কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। (খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন ? (ঙ) দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী আন্দোলন কোন খ্রীঃ এবং কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ? (চ) অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে কে আই. সি. এস. চাকুরী ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দেন। (ছ) চৌরীচৌরা ঘটনা কোন খ্রীঃ ঘটে ? (জ) সাইমন কমিশন কবে নিযুক্ত হয় ? (ঝ) নেহেরু রিপোর্ট কবে কাহার দ্বারা রচিত হয় ? (ঞ) লাহোর কংগ্রেসে কি আদর্শ গৃহীত হয় ? (ট) ২৬শে জানুয়ারী কি দিবস উদযাপনে শপথ নেওয়া হয় ? (ড) গান্ধী-আরউইন চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয় ? সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কে জারি করেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—(ক) রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড এবং ইহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (খ) খিলাফৎ আন্দোলন ও ইহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (গ) অসহযোগের কর্মসূচী কি ছিল ? (ঘ) খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল ? (ঙ) মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসকে সামিল করায় কি ফল হয় ? (চ) আইন অমান্য আন্দোলনের কেন প্রয়োজন হয় এবং ইহার কি ফল হয় ?

৩। (ক) অসহযোগ আন্দোলনের কারণ ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ। (খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ সমস্যা এবং স্বরাজ দাবী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (গ) সাইমন কমিশন কি কারণে ভারতবাসীর অপ্রিয় হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত

হয় ? (ঘ) অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল ? এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—(ক) ভারতে সর্বপ্রথম শ্রমিক ধর্মঘট কোথায় ও কবে হয় ? (খ) ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সর্বপ্রথম কোথায় ও কবে সূত্রপাত হয় ? (গ) ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোথায় আরম্ভ হয়। (ঘ) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা কবে হয় ?

২। ভারতে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (স্বাধীনতার অগ্রগতি)

১। ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ও প্রাদেশিক শাসনের কি ব্যবস্থা ছিল ?

২। ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের পটভূমিকা ও শর্তাবলী আলোচনা কর। এই আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা পূরণে কেন ব্যর্থ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (সাম্প্রদায়িক রাজনীতি)

১। এক কথায় উত্তর দাও :—(ক) মহম্মদ আলি জিন্নাহ কবে মুসলিম লীগে যোগ দেন ? (খ) জিন্নাহর ১৪ দফা দাবী কবে ঘোষিত হয় ? (গ) 'নিস্কৃতি দিবস' কাহারা পালন করেন ? (ঘ) পাকিস্তান কথাটি কে রচনা করেন ? (ঙ) মুসলিম লীগ কবে দ্বিজাতি তত্ব ও পাকিস্তান দাবী করে ?

২। মুসলিম লীগের নীতি ও পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—(ক) লিনলিথগোর আগষ্ট প্রস্তাব কি ছিল। (খ) ক্রীপস প্রস্তাব কি ছিল এবং কেন ব্যর্থ হয় ?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করেন ?

৩। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ক্রীপসের মারফৎ কি প্রস্তাব দেন ? ইহা কেন ব্যর্থ হয় ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (ভারত ছাড় আন্দোলন)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কি নীতি গ্রহণ করে এবং তাহার কি ফল হয় ? (খ) ভারত ছাড় আন্দোলনের কারণ এবং এই আন্দোলনের বিবরণ দাও। ইহা কেন বিফল হয় ?

২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সপ্তম পরিচ্ছেদ (সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী জীবনের গঠন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার অবদান আলোচনা কর। (খ) সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং জার্মানী ও জাপানে আজাদ হিন্দ আন্দোলন গঠনের কথা আলোচনা কর। (গ) আজাদ হিন্দ অভিযান ও ইহার ফলাফল আলোচনা কর। (ঘ) আই. এন. এ. কে ও কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন ? (ঙ) ত্রিপুরী কংগ্রেসে কে সভাপতি হন ? নির্বাচনে তিনি কাহাকে পরাস্ত করেন ?

২। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতার জন্য কি নীতি গ্রহণ করেন এবং তাহার যৌক্তিকতা ও ফলাফল বিচার কর।

৩। আজাদ হিন্দ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কিভাবে আগাইয়া দেয় তাহা আলোচনা কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (স্বাধীনতা লাভ ঃ ভারত ব্যবচ্ছেদ)

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(ক) মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (খ) মাউণ্ট ব্যাটেন প্রস্তাব কি ছিল ? ইহার সহিত মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবের কি পার্থক্য আছে।

২। ১৯৪৬ খ্রীঃ মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দাও।

৩। ১৯৪৭ খ্রীঃ কিভাবে ভারত ব্যবচ্ছেদ হয় তাহা আলোচনা কর।

৪। ভারতের স্বাধীনতা লাভে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। ১৯২০ খ্রীঃ হইতে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত কি কি প্রধান ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে সাহায্য করে তাহা আলোচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (সংবিধান রচনা)

১। সংক্ষেপে লিখ ঃ—(ক) মৌলিক অধিকার, (১) নির্দেশক নীতি, (গ) প্রধানমন্ত্রী, (ঘ) রাষ্ট্রপতি।

২। ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার, নির্দেশক নীতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি)

১। স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় রাজ্যগুলি কিভাবে ভারতভুক্ত হয় এবং সর্দার প্যাটেল ইহার জন্য কি ভূমিকা নেন ?

২। স্বাধীনতা লাভের পর হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও জুনাগড় রাজ্য লইয়া কি সমস্যা দেখা দেয় এবং তাহা কিভাবে সমাধান করা হয়।

H. S. Questions—1978

HISTORY

(First Paper)

'ক' বিভাগ

'ক' বিভাগ হইতে চারিটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে।

$4 \times 14 = 56$

১। পলাশী হইতে বক্সার-এর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী সংক্ষেপে লিখ। 14

২। ১৭৬১ হইতে ১৮১৮ সালের মধ্যে মারাঠাদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত কর। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা শক্তি কি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় ? $10+4$

৩। কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সুফল ও কুফলগুলি দেখাও। $6+8$

৪। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, এবং ভারতীয় সমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর। $8+6$

৫। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ কি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলিয়া মনে কর ? কারণ ও যুক্তি সহকারে আলোচনা কর। $4+10$

৬। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভূমিকা নির্ণয় কর। 14

৭। 'স্বদেশী' আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর। 14

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 14

'খ' বিভাগ

'খ' বিভাগ হইতে তিনটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে।

$3 \times 8 = 24$

৯। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 8

১০। মহীশূরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি ও উদ্দেশ্য বিবৃত কর। 8

১১। ফোর্ট উইলিয়ম ও হেইলিবেরী কলেজ কি উদ্দেশ্যে ও কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ? $5+3$

১২। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার কি ভাবে রহিত করা হয় ? 8

১৩। 'নব্য বঙ্গ' প্রসঙ্গের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ। 8

১৪। 'ফরাজী' আন্দোলনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কি ছিল ? 8

১৫। দাদাভাই নওরোজী এবং রমেশচন্দ্র দত্তের কথা কি প্রসঙ্গে পড়েছ ? 4+4

১৬। 'অসহযোগ' আন্দোলনের কি কর্মসূচী ছিল ? এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন ? 6+2

'গ' বিভাগ

'গ' বিভাগ হইতে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে। $5 \times 2 = 10$

১৭। কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন ? তিনি কাহাকে প্রাণদণ্ড দেন ? 2

১৮। 'স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা কে ? ইহার কি লক্ষ্য ছিল ? 2

১৯। স্যার চার্লস উড কে ছিলেন ? তিনি কিসের জন্য বিখ্যাত ? 2

২০। 'স্বত্ববিলোপ নীতি' বলিতে কি বোঝায় ? 2

২১। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী কোন গ্রন্থে চিত্রিত হয় ? গ্রন্থকারের নাম কি ? 2

২২। বাঙলায় বিপ্লবীদের সংগঠিত দুইটি গুপ্ত সমিতির নাম বল। 2

২৩। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা কে করেন ? কোন সময়ে ? 2

২৪। 'পুণা চুক্তি' কখন ও কাহাদের মধ্যে নিষ্পন্ন হয় ? 2

২৫। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কে সভাপতি হন ? নির্বাচনে তিনি কাহাকে পরাস্ত করেন ? 2

২৬। আই. এন. এ. কে ও কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন ? 2